বিজয়ের কথা বলবো
জয় বাংলা
জয় বাংলা
জয় বাংলা
তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বিজয়ের কথা বলবো

বিজয়ের কথা বলবো

তথ্য অধিদফতর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বিজয়ের কথা বলবো

প্রকাশকাল
মার্চ ২০২৩
স্বত্ব © তথ্য অধিদফতর

প্রধান সম্পাদক
মো. শাহেনুর মিয়া, প্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদক
পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সিনিয়র তথ্য অফিসার

সম্পাদনা পরিষদ
এ এম ইমদাদুল ইসলাম, সিনিয়র তথ্য অফিসার
মুহম্মদ জসীম উদ্দিন
সেলিনা আক্তার
মো. শাহীন শিকদার

সম্পাদনা সহকারী
মো. জামিন মিয়া
এহতেশামুল হক
মো. মাহবুব সরকার
মো. রোকনুজ্জামান
মো. রেদোয়ান আল করিম

প্রচ্ছদ
মোমেন উদ্দীন খালেদ

ব্যবস্থাপনা সহযোগী
মো. শাহআলম সরকার

গ্রাফিক্স
মো. কামরুজ্জামান

মুদ্রণ
মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Bijoyer Kotha Bolbo
Published by Press Information Department (PID)
Ministry of Information and Broadcasting
Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Phone : 55100811, 55100242,
Email : piddhaka@gmail.com

Price : TK. 600.00

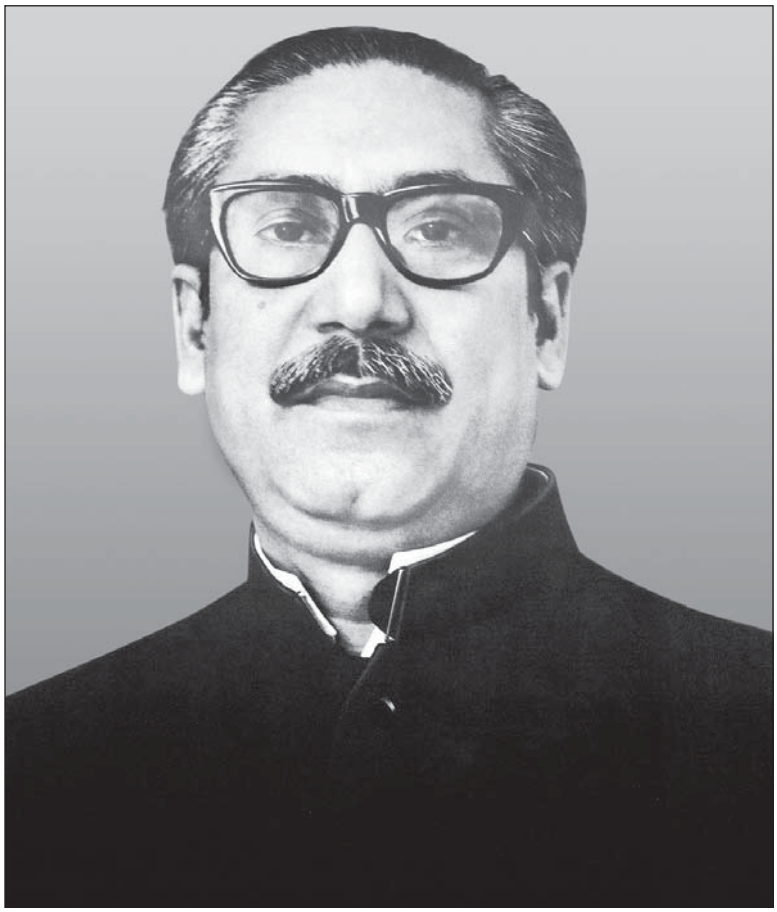

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভূমিকা

বিজয়ের ধ্বনি সদা সুমধুর। আর সেই বিজয় যদি হয় শতাব্দীর বঞ্চণা ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে, সেই বিজয় যদি হয় রক্তস্রোত থেকে উত্থিত লাল সূর্যের মতোন, তার মাহাত্ম্যের গাথা অফুরান। তার আস্বাদন চির নতুন।

সহস্র বছরের পথ পেরিয়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ ও দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যে বিজয় বাংলাদেশ অর্জন করেছিল, তা বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এই গৌরবগাথা প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে প্রোথিত থাকবে। সেখান থেকে উৎসারিত অনুপ্রেরণায় অদম্য বাঙালিরা গড়ে তুলে আগামীর সমৃদ্ধির সোপান।

এই অনুপ্রেরণাকে চির জাগরুক রাখতে আমাদের বিজয়ের গল্পগুলো বারবার উঠে আসে মানসপটে। যে গল্পের মূল নায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র, কোনোদিন সার্বভৌমত্ব পেতো কিনা সন্দেহ থেকেই যায়। যে গল্পের পার্শ্বচরিত্র বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং জাতীয় চার নেতা। আর অবশ্যই সেই সময়ের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা এবং সকল শহিদের গল্পগুলোর নানান রঙ, নানান মাত্রা এবং আনন্দ, বেদনা ও দুঃসাহসিকতার নতুন পর্দা উন্মোচনের গল্প আমাদের রক্তে দোলা দিয়ে যায়। এই অহংকারের পাঠ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে 'বিজয়ের কথা বলবো' সংকলনের প্রয়াস।

তথ্য অধিদফতর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টালে প্রকাশিত বৈচিত্র্যময় ফিচার ও নিবন্ধের সংকলন 'বিজয়ের কথা বলবো', ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কলামিস্ট, গবেষক, সাংবাদিকসহ বহুমাত্রিক পরিসরের লেখকদের অনুভূতি ও মূল্যায়নের নির্মোহ সন্নিবেশ ঘটেছে এই সংকলনে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার মহোদয়ের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় আমাদের এ প্রয়াস আলোর মুখ দেখেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্পাদনা পরিষদসহ সংকলনটি প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

সূচিপত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই বাংলাদেশ ॥ ১৩
আমির হোসেন আমু, এমপি

মুক্তিসংগ্রামের মহত্তর অর্জন মহান বিজয় দিবস ॥ ১৬
তোফায়েল আহমেদ

এবারের বিজয় দিবসে আমার ভাবনা ॥ ২২
আবুল মাল আবদুল মুহিত

সংগ্রাম ও সংস্কৃতির বর্ণিল প্রতিভাসের নাম বাংলাদেশ ॥ ২৬
ওবায়দুল কাদের

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু ॥ ২৮
আ ক ম মোজাম্মেল হক

যুদ্ধাপরাধের বিচার: ইতিহাসের দায় শোধ ও ন্যায়বিচার ॥ ৩৩
হাসানুল হক ইনু

রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন ॥ ৩৭
মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম (বীর-উত্তম), এমপি

বিজয়ের দর্শন ॥ ৪৭
র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার চার দশক পূর্তিতে প্রত্যাশা ॥ ৫১
এইচ টি ইমাম

ফিরে দেখা : ১৯৭১ ॥ ৫৮
আনিসুজ্জামান

বিজয় দিবসের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ॥ ৬১
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

নতুন প্রজন্ম ও দেশপ্রেম ॥ ৬৬
রশীদ হায়দার

বিজয় দিবস ॥ ৭০
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের স্বাধীনতা যেভাবে এলো ॥ ৭৩
শামসুজ্জামান খান

বিজয়ের ৪৩ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ও সম্ভাবনা ॥ ৭৭
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

১৬ ডিসেম্বর–নূতন সূর্যোদয় ॥ ৮৪
প্রফেসর আবদুল মান্নান

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা ও বাস্তবতা ॥ ৮৮
লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এম হারুন-অর-রশিদ (বীরপ্রতীক)

১৬ই ডিসেম্বর : বাঙালির বিজয়ের দিন, মুক্তির দিন ॥ ৯৩
অনুপম সেন

সারা জীবনের প্রয়াস ॥ ৯৮
রোহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের মহড়া ॥ ১০১
ড. রফিকুল ইসলাম

পঞ্চাশ বছরের পথে বাংলাদেশ ॥ ১০৮
মুনতাসীর মামুন

স্বাধীনতা মানে কী? ॥ ১১৩
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

ভালোবাসার বাংলাদেশ ॥ ১১৭
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

স্বাধীনতার নবযাত্রা ॥ ১২১
হারুন হাবীব

বাঙালি জাতিসত্তার বিজয় ॥ ১২৪
ড. হারুন-অর-রশিদ

কাছের-দূরের বন্ধুরা ॥ ১২৮
হাসান ফেরদৌস

বিজয় দিবসে কী কথা হয় ॥ ১৩১
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালির বীরের জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করার দিন ॥ ১৩৪
মোজাফফর হোসেন পল্টু

১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি ॥ ১৩৯
জাফর ওয়াজেদ

স্বাধীনতা দিবসকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবনা ॥ ১৫৪
অধ্যাপিকা পান্না কায়সার

বাংলাদেশের বিজয়ের সেই দিনগুলি ॥ ১৫৮
সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের পরম্পরা ॥ ১৬৩
ড. আতিউর রহমান

যে বাংলাদেশ আমরা চেয়েছিলাম ॥ ১৬৭
ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার তাৎপর্য এবং গণহত্যার স্বীকৃতি ॥ ১৭০
মফিদুল হক

বঙ্গবন্ধু বিজয়ের জন্যই প্রস্তুত করেছিলেন ॥ ১৭৬
অজয় দাশগুপ্ত

'অপার মহিমার বিজয় দিবস ষোলো ডিসেম্বর' ॥ ১৮০
শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর মানবসেবার সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথচলা ॥ ১৮২
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক), স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ ॥ ১৮৬
ইমদাদুল হক মিলন

স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র ॥ ১৯০
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

স্বাধীনতা এক গোলাপ ফোঁটানো দিন ॥ ১৯৪
রীতা রায় মিটু (যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী)

মুজিববর্ষে বিজয় দিবসের স্বপ্ন ॥ ১৯৬
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

২৬ শে মার্চ : বাঙালির স্বাধীনতা, বাঙালির বন্ধন মুক্তির দিন ॥ ১৯৯
অনুপম সেন

বিজয় দিবস ॥ ২০৩
আনিসুজ্জামান

১৯৭১ সালের মার্চ মাস ও একজন শাহেদ আলী কসাই ॥ ২০৫
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক), স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত

২৬ শে মার্চ শুধু স্বাধীনতা দিবস নয়... ॥ ২১০
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

সীমাহীন মূল্যে কেনা স্বাধীনতার বিজয় : জানতে হবে, জানাতেও হবে নিরন্তর ॥ ২১৩
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

২৬ মার্চ '৭১ : ২৩ বছরের সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি ॥ ২১৮
আ ক ম মোজাম্মেল হক

বিজয় দিবসের ভাবনা ॥ ২২২
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

৪৫ বছরে বাংলাদেশ ॥ ২২৫
মুনতাসীর মামুন

২৬ মার্চ ১৯৭১ : আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপ ॥ ২২৯
র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

সুবর্ণজয়ন্তীর বিজয় উৎসব ॥ ২৩২
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী : মুক্তিযুদ্ধে সংবাদ-সাময়িকীপত্র ॥ ২৩৬
জাফর ওয়াজেদ

যুদ্ধজয়ের গল্প ॥ ২৪৮
গাজী আলী আজগর (বীর মুক্তিযোদ্ধা)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই বাংলাদেশ

আমির হোসেন আমু

চার অক্ষরের একটি শব্দ 'স্বাধীনতা'। রাষ্ট্র তার জনগোষ্ঠীর সব সম্প্রদায় কিংবা সব অংশের জনগণের প্রতি ন্যায়ভিত্তিক সমান আচরণ ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম নেয়। শাসকগোষ্ঠী এই ক্ষোভ ও হতাশার কারণ অনুসন্ধান ও সমাধানে ব্যর্থ হলে মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক নানা আন্দোলনে নামে। সরকারের আচরণে, বিশেষ করে জাতি ও সম্প্রদায়গত বৈষম্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে এর সমাধান দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে সংশ্লিষ্ট জাতি তথা জনগোষ্ঠী অনিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়। আর এ পথে একবার অগ্রসর হলে প্রায় ক্ষেত্রে শেষ সমাধান হয় পৃথক রাষ্ট্র তথা স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

আজ ২৬ শে মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে। যিনি তাঁর অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষায় ১৩ বছরের অসহনীয় কারা নির্যাতন ভোগ করে দু-দুবার ফাঁসির আসামি হয়ে অপরিসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়চেতা আপোসহীন নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে নিয়ে এসেছেন বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা আন্দোলনে, যার মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালির স্বাধীনতা। ১৯৬১ সালেই তিনি ছাত্রলীগ নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিটি বক্তব্যে-আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা সামনে আনতে এবং পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ তুলে ধরতে। ওই সময় আমাদের বিএলএফের লিফলেট দেওয়া হয়েছিল (বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট)। তাই ৬ দফা অতি অল্প সময়ের ভেতরই মানুষ গ্রহণ করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে আইয়ুব খানসহ শাসকগোষ্ঠীরা অস্ত্রের ভাষায় মোকাবিলার কথা বলা, আগরতলা মামলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা বানচাল হয়েছিল জনগণের বিস্ফোরণে; বাধ্য হয়ে মুক্তি দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন আসামিকে। তারপরই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার। ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণ রাস্তায় আন্দোলনে বেরিয়ে পড়ে; পাকবাহিনী দমন-পীড়ন ও গোলাগুলি চালায়। এই প্রেক্ষাপটে ৭ই মার্চ, ১৯৭১ সালে তৎকালীন রেসকোর্স

ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাঙালির স্বাধীনতার কথা ঘোষণা দেন তাঁর কালজয়ী ভাষণে। বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি জনগণকে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করে যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান; 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব–এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।'

এই আহ্বান সমগ্র জাতির চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে পরবর্তী ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত সরকারের নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে দেখতে পান একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, পোর্ট, বিমানবন্দর, রেললাইন, ওয়াগন বগিসহ সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত। অন্যদিকে সাড়ে তিন কোটি লোক গৃহহারা, এক কোটি লোক শরণার্থী, চার লক্ষ বীরাঙ্গনা, খাদ্যের গুদামে খাদ্য নেই, ব্যাংকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা নেই, ৩০ লক্ষ শহিদ পরিবার নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশকে পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ এবং ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ ১২৬টি দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং ১০ মাসের মধ্যে জাতীয় সংবিধান প্রণয়ন করেন। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ করে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন, তখনই ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের কালরাতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে। পিছিয়ে দেওয়া হয় অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রাকে। ১৫ই আগস্ট দেশে না থাকার কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগ সভাপতি করে দেশে আনার পর; পিতার মতো অকুতোভয়, সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সম্পন্ন করেছেন বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজ।

১৯৯৬ সালে প্রথম এবং ২০০৯ সাল থেকে টানা তিনবার ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা ল্যান্ড বাউন্ডারি চুক্তি বাস্তবায়ন, সমুদ্র সীমানা জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রের পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার একক উদ্যোগে ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধন করেন। ১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে এই অঞ্চলে দীর্ঘ ২৫ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘাত নিরসনের জন্য শেখ হাসিনা UNESCO শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃত হয়। যার মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। ২০০০ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশের নির্মাতা এবং উন্নয়নের কাণ্ডারি, উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল বাংলাদেশ নির্মাণের রূপকার। শেখ হাসিনার

দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার মেট্রোরেল প্রকল্প, দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম রেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরসহ মেগাপ্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। তাঁর সফল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্যমোচন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, শান্তি, জঙ্গি দমন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে তিনি বহু মর্যাদাসম্পন্ন আর্ন্তজাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার নতুন মাত্রা দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আজ বিশ্বে একজন নন্দিত সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছেন। বর্তমানে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা পরিস্থিতি এবং পাশাপাশি উপর্যুপরি বন্যার মোকাবিলা করে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত, আত্মমর্যাদাশীল বাঙালি জাতি পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০২২)

লেখক : সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

মুক্তি সংগ্রামের মহত্তর অর্জন মহান বিজয় দিবস

তোফায়েল আহমেদ

বছর ঘুরে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে অনেক স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। ৩০ লক্ষাধিক প্রাণ আর দুই লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করে আমরা মহত্তর বিজয় অর্জন করি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন সামনে নিয়ে দীর্ঘ ২৪টি বছর কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করে, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিব। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ তাঁর স্বপ্নের আরাধ্য প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টায় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ আর আমাদের মহান বিজয় সূচিত হওয়ার সাথে সাথে আমি ছুটে গিয়েছিলাম কলকাতার থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তরে। সেখানে অবস্থান করছিলেন শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য মনসুর আলী, কামারুজ্জামান এবং অন্যরা। সকলেই আনন্দে আত্মহারা! নেতৃবৃন্দ আমাদের বুকে টেনে নিয়ে আদর করেছিলেন। প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা হানাদারমুক্ত করতে পেরেছি, মনের গভীরে যে কী উচ্ছ্বাস, কী আনন্দ; সে আনন্দ-অনুভূতি অনির্বচনীয়! স্বাধীন বাংলার যে ছবি জাতির পিতা হৃদয় দিয়ে অঙ্কন করে নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র করে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।' পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অদম্য বাঙালি জাতি নেতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ন্যায্য দাবির প্রশ্নে কেউ আমাদের 'দমাতে' পারে না।

জাতীয় জীবনের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আমার জীবনেও ডিসেম্বর মাস আনন্দ-বেদনার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত। '৭০-এর ডিসেম্বরে মাত্র ২৭ বছর বয়সে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হয়েছিলাম। '৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু মুজিবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের স্লোগান তুলেছিলাম। বঙ্গবন্ধু সেদিন সমবেত জনতাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান তুলুন–আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ।' ডিসেম্বরের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি এবং ১৭ তারিখ প্রাদেশিক পরিষদের ২৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ডিসেম্বরের প্রতিটি দিন আমাদের জাতীয় জীবনে সবিশেষ গুরুত্ববহ।

'৭১-এর ডিসেম্বরের ৩ তারিখ থেকে সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ অর্জন করে। আমরা তখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। মুক্তিবাহিনীর চতুর্মুখী গেরিলা আক্রমণে বিধ্বস্ত পাকবাহিনী এদিন উপায়ন্তর না দেখে একতরফাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাকিস্তান বিমানবাহিনী পশ্চিম ভারতের বিমানঘাঁটিগুলো, এমনকি দিল্লির কাছে আগ্রার বিমানক্ষেত্র এবং পূর্ব ফ্রন্টের আগরতলা বিমানঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভিভি গিরি ও ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাত ১০টা ৩০ মিনিটে সারা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেন। রাত ১২টা ২০ মিনিটে ইন্দিরা গান্ধী এক বেতার ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে সাফ জানিয়ে দেন, 'আজ এই যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করল।' পরদিন ৪ ডিসেম্বর, মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথভাবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনে চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, 'যদি আমরা পরস্পর আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রবেশ করি, তবে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অবস্থান অধিকতর সহজ হয়। অবিলম্বে ভারত সরকার আমাদের দেশ এবং আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করুক।' এর পরপরই ভারত পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং ৬ ডিসেম্বর, সোমবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় ভারত সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুজিবনগর সরকারের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে গৃহীত রাষ্ট্রের নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' উদ্ধৃত করে লোকসভার অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "বাংলাদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে।" ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতারপর সকল সদস্য দাঁড়িয়ে তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার ও জনসাধারণের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

মুজিবনগর সরকার ও মুজিব বাহিনীর জন্য ৭ ডিসেম্বর ছিল এক বিশেষ দিন। এদিন মুজিব বাহিনীর অন্যতম প্রধান হিসেবে আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চল যশোর হানাদারমুক্ত হয়। যশোরের সর্বত্র উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সেদিন মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ ও মুজিব বাহিনীর কমান্ডারগণসহ আমরা বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে শত্রুমুক্ত প্রথম মুক্তাঞ্চল যশোরে প্রবেশ করি। জনসাধারণ আমাদের বিজয়মাল্যে ভূষিত করে। সে আনন্দ-অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনেকে মুজিবনগর সরকারের সাথে মুজিব বাহিনীর ভুল-বোঝাবুঝির কথা বলেন। এটা সঠিক নয়। আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল কলকাতা বেইজড। আমি নিয়মিত মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ করতাম। মনে পড়ে জেনারেল ওবানের কথা। তিনি দেরাদুনে আমাদের ট্রেনিং দিতেন। জেনারেল সরকার ও শ্রী ডি পি ধর, যাঁরা আমাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে কো-

অর্ডিনেট করতেন। এখানে কারো ব্যক্তিগত খামখেয়ালির কোনো অবকাশ ছিল না। সকলেই ছিলেন সুসংগঠিত, পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল। সমগ্র বাংলাদেশকে চারটি বৃহৎ অঞ্চলে বিভক্ত করে রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সংগঠিত ছিল মুজিব বাহিনী। মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর (এফএফ) সাথে একত্রে যুদ্ধ করে পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করাই ছিল মূলত মুজিব বাহিনীর কাজ। মুজিব বাহিনীর অন্যতম প্রধান হিসেবে আমার দায়িত্বে ছিল পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী। শেখ ফজলুল হক মণি ভাইয়ের দায়িত্বে ছিল তৎকালীন চট্টগ্রাম ডিভিশন। রাজ্জাক ভাইয়ের দায়িত্বে ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জসহ এক বিরাট অঞ্চলের। উত্তরাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন সিরাজ ভাই। মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং হতো দেরাদুনে। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং শেষ করে আমার সেক্টরের যারা, তাদের প্লেনে করে ব্যারাকপুর ক্যাম্পে নিয়ে আসতাম। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রাক্কালে অশ্রুসজল চোখে বুকে টেনে, কপাল চুম্বন করে বিদায় জানাতাম। আমরা মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু মুজিবকে উদ্দেশ করে বলতাম, 'প্রিয় নেতা, তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, জানি না! যতক্ষণ আমরা প্রিয় মাতৃভূমি তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করতে না পারব, ততক্ষণ আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাব না।' ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর যেদিন বিজয়ী হলাম, সেদিন আমরা সত্যিই মায়ের কোলে ফিরে এলাম। ১৮ ডিসেম্বর আমি এবং শ্রদ্ধেয় নেতা আব্দুর রাজ্জাক–আমরা দুই ভাই হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আসি। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করি। চারদিকে সে কী আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং পুত্র শেখ রাসেলসহ যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু-পরিবারকে সেখানে। কিন্তু বিজয়ের আনন্দ ছাপিয়ে কেবলই মনে পড়ছিল প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা। যে স্বাধীন বাংলার স্লোগান তুলেছিলাম রাজপথে, যে বাংলার জন্য বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে কাজ করেছি, পরমাকাঙ্ক্ষিত সেই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমরা হানাদারমুক্ত, স্বাধীন। মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ অপূর্ব দক্ষতার সাথে, দল-মত-শ্রেণি-নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে, আস্থা ও বিশ্বাসে নিয়ে, সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ২২ ডিসেম্বর। বিমানবন্দরে নেতৃবৃন্দকে বিজয়মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই। চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' স্লোগানে সর্বত্র মুখরিত। চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশ আর আনন্দ মিছিল। মানুষ ছুটে আসছে আমাদের দেখতে। বিজয়ের সেই দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে গৌরবের যে দীপ্তি আমি দেখেছি, সেই রূপ চিরবিজয়ের গৌরবমণ্ডিত আলোকে উদ্ভাসিত। স্বজন হারানোর বেদনা সত্ত্বেও প্রত্যেক বাঙালির মুখে ছিল পরম পরিতৃপ্তির হাসি, যা আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে; কিন্তু বিজয়ের আনন্দ ছাপিয়ে কেবলই

মনে পড়ছিল প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা। যার সাথেই দেখা হয়, সকলের একই প্রশ্ন, 'বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কবে ফিরবেন?' বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সর্বস্তরের মুক্তিকামী বাঙালির ঘরে ঘরে রোজা রাখা, বিশেষ দোয়ার আয়োজন চলছিল। বঙ্গবন্ধুবিহীন বিজয় অপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। দেশ স্বাধীন না হলে ডিসেম্বরেই বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হতো; কিন্তু আমরা জানতাম বীর বাঙালির ওপর নেতার আস্থার কথা। তিনি তো গর্ব করে বলতেন, 'তারা আমাকে হত্যা করতে পারে; কিন্তু বাংলার মানুষকে তারা দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা আমাকে হত্যা করলে লক্ষ মুজিবের জন্ম হবে।' ১৬ ডিসেম্বর হানাদারমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করার পরেও আমরা নিজেদের স্বাধীন ভাবতে পারিনি। কারণ বঙ্গবন্ধু তখনো পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেদিন, যেদিন '৭২-এর ১০ জানুয়ারি বুকভরা আনন্দ আর স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের পূর্বপরিকল্পিত নীলনকশানুযায়ী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল পাকিস্তানিদের দোসর এ দেশীয় রাজাকার-আলবদর বাহিনীর ঘাতকরা। ডিসেম্বর মহান বিজয়ের গৌরবমণ্ডিত মাস হলেও ১৪ ডিসেম্বর আমাদের বেদনার দিন। মনে পড়ে নির্ভীক সাংবাদিক শহিদ সিরাজুদ্দীন হোসেনের কথা। যাঁর কাছে আমি ঋণী। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে যিনি আমাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। মনে পড়ে শহিদ বুদ্ধিজীবী সর্বজনাব মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসউদ্দীন আহমদ, আনোয়ার পাশা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. আবুল খায়েরসহ শহিদ বুদ্ধিজীবীদের কথা। জাতির মেধাবী সন্তানদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে ঘাতকরা আমাদের মেধাহীন জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিল।

মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দেশমাতৃকার স্বাধীনতার সূত্রে। জাতীয় ঐক্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন ছিল সেই দিনগুলো। ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক-যুবক সকলেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণে সফল জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি সুমহান বিজয়। আর এখানেই নিহিত আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবের ঐতিহাসিক সাফল্য। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে একটি নিরস্ত্র জাতিকে তিনি সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমরা সেদিন স্লোগান দিয়েছি– 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'; 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা'; 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'; 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'; 'জয় বাংলা' ইত্যাদি। সেদিন কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান–এসব প্রশ্ন ছিল অবান্তর। আমাদের মূল স্লোগান ছিল 'তুমি কে? আমি কে? বাঙালি, বাঙালি।' আমাদের পরিচয় ছিল 'আমরা সবাই বাঙালি'। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, পাকিস্তানের

কারাগার বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখতে পারেনি; মৃত্যুদণ্ড দিয়েও কার্যকর করতে পারেনি; অথচ '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পরাজিত শক্তির দোসর খুনি মোশতাক-রশীদ-ফারুক-ডালিম চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করল! যে স্বাধীনতাবিরোধীরা মাকে ছেলেহারা, পিতাকে পুত্রহারা, বোনকে স্বামীহারা করেছিল; জেনারেল জিয়া তাদেরকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সংবিধান থেকে উৎপাটিত করেছিল। পরাজিত শক্তির পুনরুত্থানে প্রতি মুহূর্তে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি তাতে কেবলই মনে হয়েছে–বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, আর পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘস্থায়ী!

এ সব কিছু সত্ত্বেও দীর্ঘদিনের সংগ্রাম শেষে বাংলার মানুষ পুনরায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে লাখো শহিদের রক্তে লেখা সংবিধানে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি ফিরে এসেছে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমাদের অঙ্গীকার–যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। আইনানুগভাবে বিচারিক প্রক্রিয়া চলছে। মানবতাবিরোধী অপরাধীদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। বাংলাদেশের সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং নবপ্রজন্ম চায়, যুদ্ধাপরাধীদের ঘৃণ্য ও পৈশাচিক কুকর্মের বিচার হোক। '৭১-এর মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তার থেকে কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

প্রতিপক্ষের শত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচক আজ ইতিবাচকভাবে অগ্রগতির দিকে ধাবমান। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি; যুদ্ধবিধ্বস্ত ঘরে ঘরে ছিল খাদ্যাভাব। কিন্তু আজ দেশে ১৬ কোটি মানুষ এবং খাদ্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ। '৭২–৭৩ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি ছিল ৩৪৮ মিলিয়ন ডলার; এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আগামীতে মহান বিজয় দিবসের ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা আমরা স্থির করেছি ৫০ বিলিয়ন ডলার। স্বাধীনতারপর বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল না বললেই চলে, অর্থাৎ দেশ প্রায় শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে–আজ আমাদের রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় যেখানে ছিল মাত্র ৫০-৬০ ডলার, আজ তা ১১৯০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। আর পিপিপি (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি) অনুসারে ১৯০০ ডলার। বিশ্বের প্রধান প্রধান জরিপকারী সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদীয়মান ১১টি দেশের অন্যতম। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট মতে, সামাজিক খাতের অগ্রগতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের থেকে এগিয়ে। অর্থাৎ সামগ্রিকতায় বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে বিকাশমান। যদিও আমরা এখনো স্বল্পোন্নত। তথাপি আমরা জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমাদের আশাবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প' অনুযায়ী আমরা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবো। ইতোমধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক

সংস্থা সিপিএ এবং আইপিইউর সর্বোচ্চ পদে আমাদের প্রতিনিধি জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিদেশের মাটিতে স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। মহান বিজয় দিবসের ৪৩তম বার্ষিকীতে আজ গর্ব করে বলতে পারি, যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আজ তা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। শীঘ্রই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক বিশ্ব বীর বাঙালিকে যেরূপ শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে দেখেছে, তদ্রুপ ধীরে ধীরে নিকট অতীতের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমেই মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠছে। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪)

লেখক : সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী, ডাকসুর সাবেক ভিপি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

এবারের বিজয় দিবসে আমার ভাবনা

আবুল মাল আবদুল মুহিত

প্রায় দেড় দশক আগে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি 'বিজয়ের মুহূর্তে' শিরোনামে। সেই প্রবন্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে আমার মনে যে অনুভূতি জাগে এবং আমি যেভাবে দিনটি কাটাই, সে সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলাম। এবারে বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমার মনে হচ্ছে তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি করব। একই সঙ্গে এবারের যেসব ভাবনা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য রাখব।

১৯৭১ সালে আমি ছিলাম আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এবং সেই দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। মোটামুটিভাবে ১৩ ডিসেম্বর থেকেই আমরা বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলাম; কিন্তু শঙ্কা ছিল যে ঢাকার কী হবে? মহানগরটি কি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে? সেখানে কি হত্যাযজ্ঞ সাধিত হবে? যাহোক, সব অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কার অবসান হলো যখন জানা গেল যে ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ২১ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। আমাদের এখানে নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় ১৫ তারিখ মধ্যরাতে আমরা জানতে পারলাম যে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছে। মনে হলো যে একটি লম্বা অন্ধকার রাতের হলো অবসান। একদিকে ছিল তৃপ্তি ও আনন্দ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল দুঃখ ও বেদনা। কতজন প্রাণ দিয়েছে, কত সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, সমাজটা কীভাবে তছনছ হয়ে গেছে।

১৯৭১-এর ৩০ জুন আমি পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বিদায় নিই। সে সময় প্রশ্ন ছিল যে, কোনো দিন কি মুক্ত ঢাকায় ফিরে যাব? অবশ্য সেই প্রশ্নকে সে সময় আমল দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ একটি ন্যায় মুক্তিযুদ্ধে যে আমাদের বিজয় হবে, সে সমন্ধে সন্দেহের অবকাশ কখনো ছিল না। এছাড়া পরবর্তী দিনগুলো এত ব্যস্ততার মধ্যে কাটে যে শুধু বিজয় ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করারও সময় মেলেনি। মার্কিন সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কখনো সমর্থন করেনি ঠিক, কিন্তু মার্কিন মুলুকে আমাদের সমর্থক ও সহায়তাকারীর কোনো অভাব কখনো অনুভব করিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের কাহিনি জুলাই মাস থেকেই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং নভেম্বর মাসে আমাদের বিজয় যে আসন্ন, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না।

আমার অবস্থান তখন ছিল যুদ্ধক্ষেত্র অথবা বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে। সেই দূরত্বের কারণেই বোধ হয় আমার মনে যে ধরনের ভাবনা তখন আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেটা হয়তো যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা বাংলাদেশে ছিলেন তাঁদের মতো ছিল না।

- আমরা ভাবছিলাম যে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কীভাবে উঠে দাঁড়াবে।
- আমরা ভাবছিলাম যে কীভাবে এক কোটি শরণার্থী দেশে ফিরে পুনর্বাসিত হবে।

- আমরা ভাবছিলাম নতুন দেশটি গড়ার জন্য কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং তার জন্য অর্থসংস্থান কীভাবে হবে।
- আমরা ভাবছিলাম, যে গণতন্ত্রের জন্য এই যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হলো, মানবাধিকারের জন্য এত ত্যাগ যে স্বীকার করতে হলো, সেটা কীভাবে এই নতুন দেশে প্রতিষ্ঠা পাবে। নিশ্চয়ই যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা লঙ্ঘনের বিচার হবে।

আমার মনে চারটি প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই প্রশ্নগুলো আমার কার্যক্রমের সঙ্গে ছিল গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

- প্রথম প্রশ্নটি ছিল, দেশে কীভাবে আমরা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করব। দেশে তো প্রায় ছয় কোটি লোক অবস্থান করেছে এবং তারা মানবেতর জীবন যাপন করেছে। সেখানে সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাদের ওপর জুলুম করেছে। এছাড়া কতিপয় গোষ্ঠী দেশের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। এসব শক্তিকে বিতাড়ন করে কী করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং আইনের প্রয়োগকে জনকল্যাণে ব্যবহার করা যাবে? আমি ভেবেছি যে আমরা একটি স্বল্পকায় সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করব; কিন্তু জাতিকে একটি সশস্ত্র জাতি হিসেবে গড়ে তুলব। আমি ভেবেছি যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং তাদের চরিত্র হবে জনকল্যাণমুখী। আমি ভেবেছি যে আমরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব।
- দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, আমাদের সংবিধান কীভাবে প্রণীত হবে। পাকিস্তানে এজন্য আমরা ৯টি বছর অতিবাহিত করি।
- আমার মনে তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, কীভাবে আমাদের প্রশাসন সাজানো হবে? আমি ভাবছিলাম যে নতুন প্রশাসনের হবে তিনটি বিশেষত্ব। প্রথমত, এখানে থাকবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিকভাবে গৃহীত নীতিমালা। দ্বিতীয়ত, এই প্রশাসনে থাকবে কর্মীরা, কেরানিকুল নয়। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রায়িত।
- আমার চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কী রকম হবে, কীভাবে আমরা আমাদের অঙ্গীকার 'অর্থনৈতিক মুক্তি' সাধন করব। পুনর্বাসন এবং উন্নয়ন সম্বন্ধে আমি ভেবেছি যে তা স্বাভাবিকভাবেই দ্রুতগতিতে সাধিত হবে।

এই চিন্তা-ভাবনা ১৯৭১ সালের বিজয় দিবস থেকে আমার শয়নে-স্বপনে বিরাজ করতে থাকে। প্রায় দেড় মাস পরে আমি যখন মুক্ত বাংলাদেশে এলাম তখন দেখলাম যে, যে চারটি ভাবনা প্রথম বিজয় দিবসে আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে সেটিই আসলে ছিল যথাযথ। আমি দেখলাম যে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হচ্ছে। আমি দেখলাম যে মানুষ নিজেই পুনর্বাসিত হচ্ছে। আমি দেখলাম যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠনের কাজে সবাই নিবেদিত। অবশ্য

একটি লুটেরা বা সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী তখনো যে তৎপর ছিল না, তা নয়। তবে তাদের কার্যক্রম তত ব্যাপক ছিল বলে আমার মনে হয়নি।

সেই একাত্তরের পর চল্লিশটি বছর কেটে গেছে। এই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। সেনাবাহিনীর একটি গোষ্ঠী নৃশংসভাবে জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেছে। অবৈধ সামরিক শাসন প্রায় ষোলো বছর ক্ষমতায় বহাল থেকেছে। একানব্বই সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার হয় এবং বিশ বছর ধরে তা বহাল। মাঝখানে ধর্ম ব্যবসা ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অনুদার গণতন্ত্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। এই চল্লিশ বছরের প্রথম বারো বছর আমি সরকারে কাজ করি, পাঁচ বছর বিদেশে নির্বাসনে কাটাই এবং পরবর্তী সময়ে বিদেশে রোজগার করি ও জাতির অবস্থা সাগ্রহে পর্যবেক্ষণ করি। গত তিন বছর জনপ্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর উদ্‌যাপনকালে এবার আমার মনে যেসব ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে তার সম্বন্ধে কিছু বলব।

- প্রথমেই আমি স্বস্তিবোধ করছি যে জঙ্গিবাদ এখন অবদমিত এবং ধর্ম ব্যবসাকে আমরা রাষ্ট্রকর্ম থেকে বিতাড়ন করেছি।
- যুদ্ধাপরাধী ও মানবতালঙ্ঘনকারীদের বিচারপ্রক্রিয়া আমরা এতদিনে এই পর্যায়ে এগিয়ে নিয়েছি যে মামলা আদালতে পৌঁছেছে।
- আমার মনে হয় যে আমরা গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর-স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনি প্রক্রিয়া মোটামুটি প্রতিষ্ঠা করে চলেছি।
- অবশেষে আমরা '৭২ সালের সুমহান সংবিধানকে পুনরুদ্ধার করেছি। সংবিধান অবশ্যই পরিবর্তনশীল; তবে পরিবর্তন হবে জনগণের ম্যান্ডেটে।
- আমার মনে হয় যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চূড়ান্ত হয়েছে এবং বেশির ভাগ দোষীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত নির্বিঘ্নে চলছে ও আইন নিজস্ব গতিতে চলার সুযোগ পেয়েছে। অভিযোগের অধিকার অনেকাংশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিচারবহির্ভূত পদক্ষেপ বহাল থাকলেও জবাবদিহি শক্তিশালী হচ্ছে। স্বেচ্ছাচারী নির্যাতন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- আমি স্বস্তিবোধ করছি যে এতদিনে আমরা একটি শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে পেরেছি। মৌলিক শিক্ষায় আমরা দেশের প্রায় সব শিশুকেই এখন আবৃত করেছি। এক ধারায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থায় আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে। অবশ্য মাধ্যমিক এবং বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষায় আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রচেষ্টা নিয়েছি।
- আমি খুব খুশি যে আমরা একটি ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। তথ্য-প্রযুক্তি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাস্তা সুগম ও দ্রুতায়িত করছে। একই সঙ্গে দুর্নীতি ও দুঃশাসন রোধে এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

- আমি গর্ববোধ করছি যে আমরা গরিব জনসংখ্যাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারছি এবং অসমতা দূরীকরণে কিছুটা সাফল্য দেখতে পাচ্ছি। অর্থনৈতিক মুক্তির পথে আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারছি।

অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমাদের আরো অনেক পথ যেতে হবে। এই মুক্তির অন্যতম উপাদান নারীশক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারে আমরা জোর পদক্ষেপ নিতে পারছি। ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য। যদিও আমাদের গতি এখনো আশানুরূপ নয়। আমাদের ক্ষুদ্রঋণ অনেক সাফল্য অর্জন করেছে; কিন্তু এখনো আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গরিবকে দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে উঠতে দিচ্ছে না। আমাদের অতি দরিদ্র জনগণও সীমিত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমাদের কেন্দ্রায়িত প্রশাসন এবং নীতিমালা প্রণয়ন একটি বড়ো প্রতিবন্ধক। আমি অপেক্ষা করছি রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থকরী প্রতিসংক্রমের জন্য। প্রশাসনের বিকেন্দ্রায়ন এই প্রেক্ষিতে অপরিহার্য। আমি জানি যে আমাদের বিনিয়োগ এখন যে পর্যায়ে তাতে অর্থনৈতিক মুক্তি তত সহজ নয়। বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও তত আশাপ্রদ নয়। দ্রব্যমূল্যের বর্তমান অবস্থা আমাদের লক্ষ্য অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তত শুভ নয়। আমাদের প্রচেষ্টা তাই হচ্ছে যে গরিবের কাছে এই মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় করে রাখা। একই সঙ্গে আমাদের দেখতে হচ্ছে যে এই উদ্দেশ্যে আমরা যে ভর্তুকি দিই বা সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করি তার অপব্যবহার কীভাবে সংকোচন করা যায়, ভর্তুকির বোঝা কীভাবে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়, সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা কীভাবে জাতীয় পেনশনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে।

এই দিনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অবস্থান। এই বিষয় নিয়ে আমি এখানে সবিশেষ মন্তব্য করতে চাই না। এই পরিবেশটি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। আমাদের সমাজে সহনশীলতার খুবই অভাব এবং আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছার ঐতিহ্য খুবই দুর্বল। আমরা যেন সব সময় অপরিবর্তনীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে খুব দ্রুত পৌঁছে যাই। আমরা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারণ ও সরকারি কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে চাই না। পরিবর্তে মাঠকে উত্তপ্ত রাখতে চেষ্টা করি। এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের রাস্তা আমাদের খুঁজে পেতে হবে। বিজয় দিবসে এইটিই আমার সবচেয়ে বড়ো কামনা। এই বিষয়েই আমার দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১১)

লেখক : সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সাবেক সদস্য

সংগ্রাম ও সংস্কৃতির বর্ণিল প্রতিভাসের নাম বাংলাদেশ

ওবায়দুল কাদের

আন্দোলনের স্বেদবিন্দু থেকে ত্রিশ লক্ষ বুকের শোণিত-প্রবাহে সবুজের কোলে উদিত রক্তিম সূর্যের নাম বাংলাদেশ। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম থেকে স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার সংগ্রামে উত্তরণের নাম বাংলাদেশ। একটি কণ্ঠের বজ্রনিনাদ সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রতিরোধের দাবানল ছড়িয়ে দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার নাম বাংলাদেশ। ভুসুকু-কাহ্নপা থেকে শুরু করে আলাওল-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি হয়ে মাইকেল-রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের চরণে চরণে ধন্য বাংলাদেশ। সংগ্রাম ও সংস্কৃতির এই বর্ণিল প্রতিভাসের নাম বাংলাদেশ।

প্রকৃতির রুদ্র-তাণ্ডব ও বহিরাগত আক্রমণকারীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বাংলাদেশের বাঙালি চিনে নিয়েছে তার স্বাধীন অবয়ব। বাঙালির ইতিহাস তাই হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। কিংবদন্তির বিজয়ী বাঙালি বিজয় সিংহ থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক গোপালের প্রদর্শিত পথে অনেক রক্তক্ষয়ী ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রক্রিয়া পেরিয়ে সার্বভৌম বাঙালির রূপকার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এক মুজিবের রক্ত থেকে বিবর্তিত হয়েছে লক্ষ মুজিবুর। সময়ের অনন্ত গ্রন্থি পেরিয়ে এই গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিময় বুকে কাল-নিরবধি বয়ে চলেছে গঙ্গা-পদ্মা-যমুনার ত্রিজলধারা। এই বিবর্তনের মধ্যে স্বাধীনতার অপার পিপাসা বুকে মা ও মাতৃভাষার কাছে দীক্ষা নিয়েছে বাঙালি। বাঙালি প্রথমে ভাষাযোদ্ধা, তারপর মুক্তিযোদ্ধা। মা আমার, দেশ আমার, এই বাংলাদেশ। মাতৃ ভাষা বাংলা তারই শাব্দিক অভিব্যক্তি। তাই তো বাঙালির সংস্কৃতিচর্চা মূলত তার ভাষাস্রোতে প্রবাহিত। এই বোধ এককালের পরাধীন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করেছে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধে। তারপর তা বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশ নামে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাষ্ট্রের অভিধায়।

আজ তাই এই বিশ্বমেলায় বাঙালির প্রাণৈশ্বর্যের উন্মীলন-মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। আমি শ্রদ্ধা জানাই–আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, ভাষাসংগ্রামসহ বাঙালির সকল আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী অমর শহিদ ও বিজয়ী বীরদের প্রতি। সেই সাথে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অগণিত মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোদ্ধাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অমর গাথা। আমরা বিশ্বাস করি–ইতিহাসের রক্তগঙ্গায় স্নাত হয়ে লোহিত অবয়বে যে বাঙালি আজ সমুত্থিত, ইতিহাসে সে চিহ্নিত থাকবে চির স্বাধীন জাতি ও ব্যক্তিসত্তার অমোঘ পরিচয়ে।

আমাদের শক্তি আমাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির অবিভাজ্য রূপ আমাদের লোকজ শিকড়ে। এই গাঙ্গেয় উপত্যকার জল-মাটি-হাওয়ার অনুবর্তী হয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের জীবনাচরণের অবারিত উন্মুক্ততা। তাই আমাদের সংস্কৃতি-বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢেলেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু সাংস্কৃতিক অগ্রদূত। বাংলার বিস্তৃত স্থলপথের পাশাপাশি বঙ্গীয় বদ্বীপের দক্ষিণ সীমায় অবারিত জলরাশি আন্তর্জাতিক পরিব্রাজককে জানিয়েছে উদার আমন্ত্রণ। তাই বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উৎস লোক-সংস্কৃতির অবিভাজ্যতায় প্রোথিত হলেও তার পরিপুষ্টি ঘটেছে বিশ্বসংস্কৃতির পরিব্যাপ্ত পরিমণ্ডলে। এই বোধ প্রবলভাবে পরিস্ফুট আমাদের শিল্পে, সাহিত্যে ও সৃষ্টিশীল জীবনবীক্ষণে। আমাদের কবিতা, কথাসাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ ও বিবিধ সৃষ্টিধর্মী রচনায় দেশ ও বিশ্ব এক যৌক্তিক সমীকরণে উন্মোচিত। তাই তো বাংলার কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সংগীতের স্রষ্টা। তাই তো মানবমুক্তির অগ্রদূত নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। এই বাংলা আমার-আপনার, সমগ্র বিশ্বমানবতার। বিশ্বকবির চরণকে নতুন শব্দে সাজিয়ে বলতে চাই–এই বাংলার মহামানবের সাগরতীরে আমরা বিশ্বমানব-বন্ধনের প্রতীকী বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, পুঁথিসাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা, বৈষ্ণবসাহিত্য হয়ে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলে এসে পরিশ্রুত হয়েছে যে মানবিকতা, আমরা তারই উত্তরসাধক।

আজকের বাংলাদেশের সাহিত্যর প্রকরণ ভিন্ন, কিন্তু অন্তরৈশ্বর্যে তা এই ঐতিহ্যিক মানবিকতার অনুবর্তী। মুক্ত মানবের মুক্ত বিকাশ চাই, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' বৈষ্ণবদর্শনের সেই লোকোত্তর মানুষ লালনের মানুষ-রতন হয়ে আজ ভিন্ন রূপকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার সোনার মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই আলোকসুন্দর মানুষগুলোকে গ্রন্থিত করে বিশ্বমৈত্রীর আলোকসেতু নির্মাণ করব।

আসুন, বিশ্বের মুক্তপ্রাণ আলোকযাত্রীরা মিলে আলোকসেতু রচনা করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-সংস্কারমুক্ত শান্তিময় পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে এই মানবসেতুর কোনো বিকল্প নেই। মানুষের জয় হোক, জয় হোক মুক্ত মানবতার। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৭)

লেখক : সংসদ সদস্য ও মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু

আ ক ম মোজাম্মেল হক

১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও পাকিস্তানি সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় বসতে দেয়নি। এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ফুঁসে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর আদেশেই চলতে থাকে। এমন প্রেক্ষাপটে '৭১-এর মার্চের ৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। অনেকে ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন; কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য ২৫ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন এবং আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান হবে বলে ঘোষণা দেন।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণই ছিল স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা এবং যুদ্ধের দিকনির্দেশনা। পাকিস্তান যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে অপপ্রচার চালাতে না পারে, সে কারণে ৭ মার্চের ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। আমার মতে, এ ভাষণ ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষণ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক ও দূরদর্শী বক্তব্যের শুরুতে পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণের ইতিহাস উল্লেখ করেন। '৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতায় থাকতে না পারা, ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন, নিজ ভূমিকা ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেন; পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিকদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন; সামরিক আইন প্রত্যাহারের আহ্বান জানান; অত্যাচার ও সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলার আদেশ দেন; দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সার্বিক হরতাল চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণাসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

তিনি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেন–

ক) প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে।

খ) প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে এবং যার যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে।

গ) 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।'

ঘ) 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব'।

ঙ) 'তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু তোমাদের বলবে না।।

চ) 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি... তোমাদের যার যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'

ছ) 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা এমনভাবে দেন যে বিশ্বের কেউ তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে পারবে না। আবার অন্যদিকে তিনি গেরিলা যুদ্ধেরও পূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকৃতপক্ষে এই ভাষণ ছিল গত ২৩ বছরের শোষণের বিস্ফোরণ। জনসংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও শাসনক্ষমতা থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রায় দুই যুগ ধরে অত্যাচার ও বৈষম্যের মাধ্যমে এ দেশের বাঙালিদের শোষণ করে। পাকিস্তানের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আয় হলেও তার সিংহভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, পূর্ব পাকিস্তান পেত খুবই সামান্য। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরম বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ দেশের জনগণ ২৩ বছর সংগ্রাম করে।

দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালেই বুঝেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেকোনো মূল্যেই হোক বাঙালিকে শোষণমুক্ত করতে হবে এবং বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হবে। সে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রথমে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আন্দোলনের সময় রাজপথ থেকে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে যান এবং ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার সময় জেলখানা থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলখানা থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন। ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ও তরুণ নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে; কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর মদদে নারায়ণগঞ্জে আদমজী জুট মিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা বাধিয়ে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাতিল করে এবং বঙ্গবন্ধুকে মন্ত্রীর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে যায়। ১৯৫৬-৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে গণপরিষদ সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে বারবার পাকিস্তানিদের হুঁশিয়ার করেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালির ওপর নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাঙালির ওপর শোষণ ও বৈষম্য বন্ধ না করলে বাঙালিরা আলাদাভাবে ভাবতে ও সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বলেও পাকিস্তান সংসদে উল্লেখ করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং আওয়ামী লীগের জয়লাভ করার সম্ভাবনা বুঝে পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীরা পাকিস্তানে

সাধারণ নির্বাচনের পূর্বক্ষণে সামরিক শাসন জারি করে বাঙালিদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করার ব্যবস্থা করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখে।

১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বের হয়ে নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগ পুনরায় পুনর্গঠন শুরু করেন। ছাত্রলীগের মাধ্যমে স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস গঠন করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন এবং এই লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বাঙালির বাঁচার দাবি ৬ দফা দিয়ে বাঙালিকে প্রকারান্তরে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে গ্রেফতারের প্রায় আড়াই বছর পর ১৯৬৯ সালে চিরতরে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে পাকিস্তানিরা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে মুক্ত করে ১০ লক্ষাধিক জনগণের সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। পাকিস্তানের তথাকথিত লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর পাক সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এলএফও) মেনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার শর্তে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে যাওয়ার সম্মতি জানান।

আমরা ছাত্রলীগের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এলএফও মেনে নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলে বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে বলেন, 'এই নির্বাচন ক্ষমতায় যাবার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনকে স্বাধীনতার পক্ষে রেফারেন্ডাম হিসেবে গণ্য করে কাজ করে যাও। জনসভায় সুস্পষ্টভাবে বলবে ৬ দফা না মেনে নিলে ১ দফার (অর্থাৎ স্বাধীনতা) আন্দোলন হবে। নির্বাচনকে জনমত গঠনের সর্বোত্তম সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। বাঙালির নেতা কে হবে, তা-ও নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে। বাঙালিরা আমার পক্ষে রায় দিলে কীভাবে এলএফও লাথি মেরে বুড়িগঙ্গা পার করে সিন্ধু নদীতে ফেলে দিতে হবে, তা আমার জানা আছে। স্বাধীনতাই আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও। আমি বেঈমান হয়ে মরতে চাই না– দেশকে স্বাধীন করেই মাথা উঁচু করে বাঙালির ইজ্জত রক্ষা করতে চাই।'

এলএফওর মূল কথা ছিল, নির্বাচনের প্রচারকালে আঞ্চলিকতা বা বৈষম্যের কথা বলা যাবে না এবং ১৮০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করতে হবে। ব্যর্থ হলে আপনাআপনি সংসদ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ পাক সেনাদের ধারণা ছিল কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। ১৮০ দিনে সংবিধানও রচনা করতে পারবে না। তাহলে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে সামরিক শাসনকেই স্থায়ী করতে পারবে।

পাকিস্তানিদের সমস্ত ধারণা ও গোপনীয় রিপোর্ট ভুল প্রমাণিত করে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে বাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন উপহার দিয়ে বাঙালি জাতির একক নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। জনগণের এই ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় রায়ই হলো মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনগণের অনুমোদন। আর স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে একক ম্যান্ডেট প্রদান। আজকাল অনেকেই স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কারো ঘোষণার কোনো বৈধ অধিকার ছিল না– এমনকি গ্রহণযোগ্যতাও ছিল না।

১৭ মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নেমেছিল ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে– বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। এ সময় জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করে কুর্মিটোলা (ঢাকা) ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্রের মজুদ কমে গেছে অজুহাতে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে রক্ষিত অস্ত্র আনার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্রের সংবাদ বঙ্গবন্ধুকে জানাই। এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয় জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জে উঠে বললেন, 'তুই একটা আহম্মক, কী শিখেছিস যে আমাকে বলে দিতে হবে।' একটু পায়চারি করে রাগতস্বরে বললেন, 'বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে দেওয়া যাবে না। Resist at the cost of anything. নেতার হুকুম পেয়ে গেলাম। ১৯ মার্চ শুক্রবার আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানি রেজিমেন্ট জয়দেবপুরস্থ (গাজীপুর) দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য পৌঁছে যায়। এ সময় মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্লান্ট ও সমরাস্ত্র কারখানায় শ্রমিক জনতা চারদিক থেকে লাঠিসোঁটা, দা, কাতরা, ছেন, দোনালা বন্দুকসহ জয়দেবপুর উপস্থিত হয়। জয়দেবপুর রেলগেটে মালগাড়ির বগি, রেলের অকেজো রেললাইন, স্লিপারসহ বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি, কাঠ, বাঁশ, ইট ইত্যাদি যে যেভাবে পেরেছে, তা দিয়ে এক বিশাল ব্যারিকেড দেওয়া হয়। জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত আরো পাঁচটি ব্যারিকেড দেওয়া হয়, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে ফেরত যেতে না পারে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন-কমান্ড মেজর কে এম সফিউল্লাহকে (পরবর্তীকালে প্রধান সেনাপতি) জনতার ওপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা আমাদের/জনতার ওপর গুলি না করে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ে সামনে আসতে থাকলে আমরা বর্তমান গাজীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওপর অবস্থান নিয়ে বন্দুক ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে সেনাবাহিনীর ওপর পালাক্রমে গুলিবর্ষণ করি।

আমরা যখন ব্যারিকেড দিচ্ছিলাম তখন টাঙ্গাইল থেকে রেশন নিয়ে একটি কনভয় জয়দেবপুর আসছিল। সে রেশনের গাড়িকে জনতা আটকে দেয়। সে কনভয়ে থাকা পাঁচজন সৈন্যের চায়নিজ রাইফেল ও এলএমজি তাদের নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এদিকে রেলগেটের ব্যারিকেড সরানোর জন্য দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব আদেশ দেন।

পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে জয়দেবপুরে কয়েকজন শহিদ হন, আহত হন শত শত বীর জনতা। বর্তমানে সেই স্থানে চৌরাস্তার মোড়ে 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' নামে ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে।

পরদিন বঙ্গবন্ধু আলোচনা চলাকালে পাকবাহিনীর আক্রমণে ১৯ মার্চের নিহতের কথা উল্লেখ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, জয়দেবপুরে জনতা পাকবাহিনীর ওপর আধুনিক অস্ত্র ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করেছে এবং এতে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

১৯ মার্চের পর সারা বাংলাদেশে স্লোগান ওঠে– 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করো'।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারা দেশে অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। মধ্যরাতেই, অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরের বাড়ি (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ভবন) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিআরের ওয়্যারলেসে স্বাধীনতার ডাক দেন। ইংরেজিতে ঘোষণা করা সেই স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ হলো, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'

স্বাধীনতার ঘোষণাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরের মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করে মুজিবনগর সরকার তথা প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও খুনি মোশতাককে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য এবং জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করা হয়। মুজিবনগর সরকার ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ শপথ নেয়। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বীরদর্পে যুদ্ধ করে পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেন। ৯ মাসব্যাপী এই যুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা ও অত্যাচার চালায়। এতে ৩০ লক্ষ বাঙালি শহিদ হন এবং দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারান। ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযোদ্ধা ও যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের এই দিনে সকল বীর শহিদের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। সেই সাথে ঘৃণা জানাই বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী এবং সকল স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানি দোসর ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৮)

লেখক : সংসদ সদস্য ও মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

যুদ্ধাপরাধের বিচারঃ
ইতিহাসের দায় শোধ ও ন্যায়বিচার

হাসানুল হক ইনু

বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো গৌরব ও অহংকার হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ। আর এই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেই ১৯৭১ সালে সমগ্র জাতির ওপর পরিচালিত গণহত্যা-গণনির্যাতন-গণধর্ষণ-যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো কলঙ্ক। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে দখলদার পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যুক্ত এ দেশীয় কিছু বেঈমান-বিশ্বাসঘাতক-রাষ্ট্রদ্রোহী ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিল, দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানি করেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিল, কোটি কোটি মানুষকে নিজের ঘরবাড়ি-এলাকাছাড়া করেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি-ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মন্দির জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল, লুটপাট করেছিল, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিল। এটা শুধু সমগ্র বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধই নয়, সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধেও জঘন্যতম অপরাধ। সমগ্র বাঙালি জাতি ও মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত এ জঘন্য অপরাধের বিচার করা শুধু ন্যায়বিচারের দাবিই নয়, ইতিহাসেরও দায়। জাতীয় জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাসের দায় শোধ করার জন্যই যুদ্ধাপরাধের বিচার অপরিহার্য।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাঁদের কথা ডাহা মিথ্যা। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কলাবরেটর্স (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৭২ জারি করে। এই আইনের অধীনে ৩৭,০০০ পাক হানাদার বাহিনীর দালালকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ যথা : খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধসহ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দূযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত ছিল, এমন প্রায় ১২,০০০ জন অপরাধীকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়। এ সকল অপরাধীর বিচার করার জন্য দেশে মোট ৭৩টি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালে বাকি অভিযুক্তদের বিচারকাজ চলছিল। আটককৃত ৩৭,০০০ জনের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধসহ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দূযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি, বঙ্গবন্ধু কেবল তাদেরই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩-এর অধীনে অপরাধ সংঘটনকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার পরিচালনার জন্য প্রসিকিউশন টিমও গঠন করা হয়েছিল।

এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং অবৈধ ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসনের কবলে বাংলাদেশ পতিত হয়। শুরু হয় উল্টো যাত্রা। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অপরাধীদের বিচারকাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর এক সামরিক ফরমান জারি করে বাংলাদেশ কলাবরেটর্স (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৭২ বাতিল এবং এই আইনের অধীনে দণ্ডিত ও আটক সকল অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধাপরাধের হোতাদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কলাবরেটর্স (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৭২ বাতিল এবং এই আইনের অধীনে দণ্ডিত ও আটককৃতদের মুক্তিদানের ফরমানকে বৈধতা প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এই বিচার কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসন, পরবর্তীতে জিয়ার গঠিত বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। জিয়া-এরশাদ-খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধের বিচার করার কোনো পদক্ষেপ তো নেননিই বরং যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক-সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ করে যেতে থাকেন। জিয়া-এরশাদ-খালেদা শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারই বন্ধ করেননি, তাঁরা কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ ১৯৭৫ জারি রেখে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথও বন্ধ করে রাখেন।

১৯৯৬ সালে জনগণের রায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু করার প্রতিবন্ধকতা দূর করেন। সাধারণ আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু ও শেষ হয়। কিন্তু ২০০১ সালে খালেদা-নিজামী সরকার ক্ষমতায় এসে উচ্চ আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দণ্ডিতদের দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। খালেদা জিয়া ২০০১ সালে তাঁর সরকারে নিজামী-মুজাহিদদের মতো আত্মস্বীকৃত চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে লক্ষ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে চরম অপমানিত করেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। যুদ্ধাপরাধের বিচার আন্দোলন কোনো নতুন আন্দোলনও নয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮০ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনগুলো গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৯২ সালে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণ-আদালতকেন্দ্রিক ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। ২০০৬ সালে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সপক্ষ গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ছাত্র-যুব-নারী সংগঠনসমূহ বরাবরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার ছিল, আছে।

যুদ্ধাপরাধীরা হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। এরা সবচেয়ে বড়ো বেঈমান, মোনাফেক, রেজিস্টার্ড বিশ্বাসঘাতক, রাষ্ট্রদ্রোহী। এরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভ্রূণকে হত্যা করতে চেয়েছিল, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের বিরোধিতা করেছিল, এরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র মেনে নেয়নি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা মেনে নেয়নি। এরা বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সংগ্রামের সকল অর্জনকেও কখনো মেনে নেয়নি। এরা স্বাধীনতারপর আত্মগোপন করলে বা পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাতে থাকে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে কাজ করে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সাথে, সামরিক শাসকদের সাথে যুদ্ধাপরাধী স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। সামরিক শাসকদের দ্বারা পুনর্বাসিত, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধের মাত্রা জোরদার করে। এরা বাঙালি ও বাংলাদেশ, স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-মুক্তিযুদ্ধ, উদারতাবাদ, প্রগতি, মানবতা, মনুষ্যত্বের বিরোধী অন্ধকার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তির মূল ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এরা প্রতিশোধের কৌশল হিসেবে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে, ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা-মহিমাকে ম্লান করা, মীমাংসিত বিষয়কে অমীমাংসিত করা, দ্বিজাতিতত্ত্বসহ বস্তাপচা পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণাকে কবর থেকে তুলে এনে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিষবাস্প ছড়িয়ে সমাজে ভাগাভাগি-হানাহানি-রক্তারক্তি করার পথ ধরে। এরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়। আজ যুদ্ধাপরাধীরা গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে বিশাল প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে আছে।

মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বাংলাদেশকে শুধু ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন করার জন্যই নয়, বাংলাদেশকে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পথে পরিচালিত করার জন্যও বটে। যুদ্ধাপরাধ যে ক্ষত তৈরি করেছিল, তা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দেহে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চলছে। এই ক্ষত-রক্তক্ষরণ নিয়ে রাষ্ট্র সুস্থ-স্বাভাবিক গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পথে এগোতে পারে না। তাই ইতিহাসের দায় মেটানো এবং ন্যায়বিচারের জন্যই যুদ্ধাপরাধের বিচার জরুরি।

২০০৮ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ঐতিহাসিক গণরায় নিয়ে সরকার গঠন করার পর যুদ্ধাপরাধের বিচারের উদ্যোগ নেয়। ২০১০ সালের ২৫ মার্চ ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী তদন্ত ও বিচারকাজ শুরু করে।

যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই যুদ্ধাপরাধীগোষ্ঠী ও তাদের রাজনৈতিক সহযোগীরা বিচারকাজের বিরোধিতা শুরু করে এবং এখন পর্যন্ত বিরোধিতা করে যাচ্ছে। বিচার বন্ধ ও বানচালের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা যুদ্ধাপরাধের বিচারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধারাবাহিকভাবে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে মিথ্যাচারের জবাবে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে হয় যে ৪১ বছর আগের অপরাধের ঘটনার বিচার হচ্ছে। ৪১ বছর আগে অভিযুক্তদের কার কী রাজনৈতিক পরিচয় ছিল বা এখন কে কী রাজনৈতিক পরিচয় ধারণ করে আছে, তা আইন ও বিচারের বিবেচ্য বিষয় নয়। তাই কোনোভাবেই এই বিচার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। যাদের বিচার হচ্ছে বা যারা দণ্ডিত হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা অপরাধী।

যে আইন ও আদালতে বিচার হচ্ছে, সে আইন ও আদালত সম্পূর্ণভাবে দেশীয় আইন ও আদালতে হলেও তা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। সম্পূর্ণ প্রকাশ্য আদালতে বিচার হচ্ছে। অভিযুক্তরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল অধিকার ভোগ করছে। দণ্ডিত অপরাধীদের উচ্চতর আদালতে আপিল করার অধিকার সুসংরক্ষিত আছে। আটককৃত অপরাধীর জামিনের বিধানও আছে। কয়েকজন অভিযুক্ত জামিনও পেয়েছে, প্যারোলেরও সুযোগ পেয়েছে। তাই বিচারের মান ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা স্রেফ মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপরও আজ যারা যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিরোধিতা করছেন তাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকেই চরম বিপদাপন্ন করে তুলছেন। তাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করে বাংলাদেশকে আফগানিস্তান-পাকিস্তানের মতো জঙ্গিবাদী-তালেবানিদের দখলে ঠেলে দেওয়ার ভয়ংকর রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতায় যুক্ত। বাংলা ভাই ও শায়খ আব্দুর রহমানদের মাজারে হামলা, মসজিদ-মাদ্রাসায় ঘাঁটি বানিয়ে সশস্ত্র তৎপরতা এবং সাম্প্রতিককালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করতে দেশব্যাপী নাশকতা-অন্তর্ঘাতের ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যুদ্ধপরাধীরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। জাতীয় ঐক্য ও সমঝোতার নামে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যুদ্ধাপরাধীদের হালাল করা হলে গণতন্ত্রের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না।

তাই ইতিহাসের দায় শোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে নিরাপদ করতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা এবং যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সহযোগীদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাঠ থেকে বিতাড়ন করা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক সকল মহল-ব্যক্তির ঐতিহাসিক দায়িত্ব। দেশবাসীকে সামনে এগোতে হবে, সামনে তাকাতেই হবে– সাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদী, যুদ্ধাপরাধী চক্রকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। যুদ্ধাপরাধী ও তাদের রাজনৈতিক সহযোগীরা ছাড়া বাংলাদেশে কি এমন একজন মানুষ আছেন, যিনি দেশকে রক্তাক্ত আফগানিস্তান-পাকিস্তান হিসেবে দেখতে চান? ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৩)

লেখক : সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।

রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন

মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম (বীর-উত্তম)

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ঢাকায় শুরু হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতিমতে আওয়ামী লীগ এমন এক সংবিধান রচনা করবে, যার ফলে দীর্ঘকাল পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা বাংলার মানুষ সম্ভাবনাময় এক নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারবে। অর্জন করবে স্বাধিকার, নিজেদের ভাগ্য গড়বে নতুন পরিকল্পনায়। প্রতিটি বাঙালির সকল অধিকার সমুন্নত রাখার সব বিধান থাকবে সেই সংবিধানে।

হঠাৎ করে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দিলেন। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাঙালি জাতি। উত্তাল জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে রাজপথে, শহর-নগর, বন্দরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিলেন– ২ মার্চ ঢাকায় এবং পরদিন সারা দেশে হরতাল হবে। ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স মাঠে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) বিশাল জনসভার আন্দোলনের সময়সূচি ঘোষণা করবেন।

লোকে লোকারণ্য রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে গভীর আবেগ, নির্ভুল যুক্তি এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ যে ভাষণ দিয়েছিলেন জাতির ইতিহাসে তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় উদীপ্ত হয়ে ওঠে বিশাল জনতা। সেই উন্মাদনার স্ফুলিঙ্গ নিমেষে ছড়িয়ে গেল জনপদ থেকে জনপদে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বাঙালির হৃদয়ে মুক্তি-চেতনার যে বহ্নিশিখা বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণে প্রজ্বালিত করে দিলেন, সেই চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালি জাতি দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার সোনালি সূর্য। পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে ওঠে এক নতুন উজ্জ্বল নক্ষত্র–নাম তার বাংলাদেশ।

মার্চের ওই সময়ে চট্টগ্রামে আমি সেনাবাহিনী থেকে ডেপুটেশনে চট্টগ্রাম সেক্টর ইপিআরের অ্যাডজুটেন্টের দায়িত্ব পালন করছি। মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে আমি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম। উত্তাল বাংলাদেশে এ যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল চরম উত্তেজনাময়, বিপজ্জনক। কিন্তু বিজয় সুনিশ্চিত এ বিশ্বাস আমার ছিল। সেই প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ নতুন ইতিহাস সৃষ্টির সম্ভাবনার মুখোমুখি হলাম আমি।

শহরের মাঝখানে রেলওয়ের পাহাড়ে একাকী এসে দাঁড়ালাম আমি। রাত তখন ৯টা। পাহাড়ের ওপরে এক দোতলা কাঠের বাংলো থেকে আমি একটু আগেই টেলিফোনে দুটি 'মেসেজ' পাঠিয়েছি হালিশহরস্থ ইপিআর হেডকোয়ার্টারে।

প্রথম 'মেসেজ'টি ছিল 'আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো' এবং সেই সাথে দ্বিতীয় 'মেসেজ'টি ছিল 'আমার জন্য কিছু কাঠ নিয়ে আসো।'

দুটো 'মেসেজে'ই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সন্দেহ করার মতো কিছুই ছিল না। কিন্তু 'মেসেজ' দুটো পাঠানোর পর যখন একাকী মেঘমুক্ত রাতের আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম, তখন এক অজানা আশঙ্কায় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

একটা বেবি ট্যাক্সি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে আমার কাছে এসে থামল। নেমে এলেন দুজন বাঙালি সামরিক অফিসার–একজন লে. কর্নেল এবং অন্যজন মেজর। আমরা সেই বাংলোর সামনে একটা বিরাট জামগাছের নিচে গিয়ে বসলাম। তাদের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, 'পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আমার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে ফেলেছি।'

'এই মুহূর্তে তোমার এ ধরনের কিছু করা উচিত নয়', অত্যন্ত নিচুস্বরে লে. কর্নেল আমাকে বললেন!

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পাবে না। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে তারা এমন কিছু করতে পারে না।'

'দেখো,' লে. কর্নেল আবার বললেন, 'এই মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক আলোচনা চলছে এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি কাল অথবা পরশুর মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি হতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তুমি এমন কিছু করতে পারো না, যা এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তাই আমরা এখন যুদ্ধ শুরু করতে পারব না।'

তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি টেলিফোনে হালিশহরে ইপিআর সৈন্যদের আমার দ্বিতীয় 'মেসেজ'টি বাতিল করার জন্য নির্দেশ দিলাম। কিন্তু প্রথম 'মেসেজ'টি অপরিবর্তিত রাখলাম।

নিয়তির কী বিচিত্র বিধান! তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সে ছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত। সেই দুজন অফিসারের একজন লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দি করল। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের যে বিশ্বাস করেছিলেন, ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই বিশ্বাসের জবাব দিল। অফিসারদ্বয়ের অন্যজন, মেজর জিয়াউর রহমান, রাত সাড়ে ১১টায় যাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম পোর্টে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার জন্য।

২৫ মার্চ, ১৯৭১ সাল, বৃহস্পতিবার। অন্যান্য দিনের মতো সকাল ৭টায় অফিসে গিয়ে ফিরে এলাম দুপুরের একটু পরে।

বিকেলে ৪টা ৩০ মিনিটে ডা. জাফর আমার বাসায় এলেন। আমার বাড়ির সামনে 'লনে' বসে সব ধরনের সম্ভাবনা নিয়েই আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু ঢাকায় কী ঘটছে বা আলোচনার কী অবস্থা–এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাচ্ছিলাম না। ঢাকা থেকে কোনো খবর পাওয়া গেছে কি না, এটা জানার জন্য ডা. জাফর চলে গেলেন আওয়ামী লীগ অফিসে। আমার এক বন্ধু ক্যাপ্টেন মোসলেমকে নিয়ে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ঘরে গেলাম।

আমরা মাত্র খাওয়া আরম্ভ করেছি, এমন সময় ডা. জাফর একজন দলীয় নেতাকে নিয়ে ফিরে এলেন। রাত তখন সাড়ে ৮টা। তিনি বললেন, 'আলোচনা মনে হয় ব্যর্থ হয়ে গেছে। জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ছেড়ে করাচির পথে চলে গেছেন। আরো খবর পাওয়া গেছে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।' অজানা আশঙ্কায় তাঁরা দুজনেই এত উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত ছিলেন যে তাঁদের মুখ থেকে কথা সরছিল না।

'আপনারা কি আমাকে সঠিক খবরটিই দিচ্ছেন?' আমি ডা. জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। এই সংবাদটাই ঢাকা থেকে পাওয়ার পর আমাদের পার্টির এক গোপন বৈঠক জনাব সিদ্দিকীর বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সিদ্দিকী ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি এই মুহূর্তেই আপনাকে জানানোর জন্য আমাদের বলছেন এবং সেই সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও আপনাকে অনুরোধ করেছেন।'

এখন (২৫ মার্চ) আমি আগের রাতের স্থগিত কার্যক্রমের ওপর পুনরায় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। ডা. জাফরকে বললাম, আমাদের জনগণকে রক্ষা করা এবং তাদের মুক্তির জন্য ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে আমি পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করছি। ষোলশহরে মেজর জিয়া এবং ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল চৌধুরীসহ অন্য বাঙালি অফিসারদের বলুন, তাঁরা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেন। তারপর রেলওয়ে পাহাড়ে আমার যুদ্ধের হেড্‌কোর্টারে আমার সাথে দেখা করুন।

রাত সোয়া ৯টার মধ্যেই হালিশহরে আমার অফিসে পৌঁছে গেলাম।

অস্ত্রাগারগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় আমরা মোটামুটি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলাম। তবু ঝুঁকি ছিল বিরাট। এখানকার পুরো কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই যদি কেউ পাকিস্তানিদের কাছে খবর পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করতে ছুটে আসবে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট অথবা 'নেভাল বেইজ' এলাকা থেকে।

আমরা প্রথমে পুরো এলাকা ঘেরাও করে ফেললাম, যাতে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য পালাতে না পারে। এরপর শুরু হলো যথাসম্ভব কম সময়ে তাদের সবাইকে আটক করার কাজ।

রাত প্রায় ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালি জেসিও সুবেদার জয়নাল খবর দিল যে সব কিছু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে ইপিআরের সব অবাঙালি 'জেসিও,' 'এনসিও' এবং সৈন্যদের আটক করে ফেলা হয়েছে ততক্ষণে। সীমান্ত ফাঁড়িগুলো থেকে খবর এসে গেল যে তারা আমার সাংকেতিক বার্তাগুলো পেয়ে গেছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করেছে। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে অবশ্য ২৪ মার্চ রাতেই সাংকেতিক বার্তা দুটো পাওয়ার পর সব পশ্চিমা সৈন্যদের নিষ্ক্রিয় ও আটক করে ফেলা হয়েছিল।

রাত ১১ট ৩০ মিনিটে রেলওয়ে হিলে পূর্বনির্ধারিত যুদ্ধের টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টারে অবস্থান নিয়ে ফেললাম। এরপর আমি সীমান্ত এলাকাসমূহ থেকে আমার সৈন্যদের আসার অপেক্ষায় রইলাম।

সেই রাত্রে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম শহরের অন্যান্য এলাকায় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা ইপিআরের প্রায় ৩০০ অবাঙালি 'জেসিও' এবং 'এনসিও'কে নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছিলাম। বিস্তারিত পূর্বপরিকল্পনা ও আমার অধীনস্থ ইপিআরের বাঙালি যোদ্ধাদের অত্যন্ত সাহসিকতা এবং ক্ষিপ্রতার সাথে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলেই এত দ্রুততার সাথে পশ্চিমা এসব সৈন্যকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়েছিল।

শহরে রেডিও স্টেশন এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করার জন্য কিছু সৈন্য পাঠানো হয়েছিল আগেই। রেলওয়ে হিলে আমার এই অবস্থানের সামনে একটু ডান পাশে নৌবাহিনীর ছোট্ট একটা যোগাযোগ স্টেশন এবং নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। সেখানে কিছু পাকিস্তানি সৈন্যদের (নৌবাহিনীর) তৎপরতা আমার অবস্থান থেকে সহজেই দৃষ্টিগোচর হলো। এমন সময় রেলওয়ে হিলের পার্শ্ববর্তী টাইগারপাস রোড ধরে নৌবাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল খুব 'স্লো স্পিডে'। আমার 'জেসিও' সুবেদার আইজুদ্দিন দৌড়ে এসে বলল, 'স্যার, গাড়িতে কতগুলি পশ্চিমা সৈন্য (নৌবাহিনীর) আছে। উড়িয়ে দিই গাড়িটা?'

'না, এখন না,' আমি বললাম। 'এরা বোধহয় রেকি করছে, যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত আছে কি না, সেটা দেখছে। মনে হয়, পাকিস্তানি সৈন্যদের বেশ বড়ো দল এই রাস্তা ধরেই ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাবে। তখন তাদের ওপর আক্রমণ চালাব। তাহলেই আমরা একসঙ্গে অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্যকে ধ্বংস করতে পারব।'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম গাড়ির পেছনে পেছনে আরেকটি গাড়ি ছুটে গেল–একটু দ্রুতবেগে। তারপর প্রায় ১০ মিনিট কাটল অস্থির অপেক্ষায়। গাড়ি দুটোই আগ্রাবাদ এলাকা থেকে ফিরে একই রাস্তায় ফিরে গেল ষোলশহর বা ক্যান্টনমেন্টের দিকে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের আর কোনো দলই এই পথ দিয়ে এলো না।

পরে জানতে পারি যে প্রথম গাড়িটি মেজর জিয়াকে নিয়ে বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। তাঁর কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে তা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসার জন্য তিনি চট্টগ্রাম পোর্টে যাচ্ছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের যখন ডা. জাফরের নিকট থেকে আমার 'মেসেজ'টি নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গল গিয়ে পৌঁছেন, মেজর জিয়া ততক্ষণে কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশ পেয়ে রওনা হয়েছেন চট্টগ্রাম পোর্ট অভিমুখে।

জনাব কাদের তখন 'মেসেজ'টি ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বাঙালি 'ডিউটি' অফিসারকে দিয়ে চলে আসেন। এই 'মেসেজ' পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ ঘটনা জানাতে এবং সোয়াত জাহাজে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে একটি গাড়ি নিয়ে ছুটে চলল মেজর জিয়ার সন্ধানে। রাত তখন সাড়ে ১১টার মতো (২৫ মার্চ)।

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে এমনি সময় ইবিআরসিতে বাঙালি সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালাতে এগিয়ে চলছে ২০ বালুচের সৈন্যরা। মেজর জিয়া চলেছেন অবাঙালি লে. কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশমতো সোয়াত জাহাজে 'ডিউটি'র জন্য। বাঙালি ক্যাপ্টেন খালেক ছুটে আসছে জিয়াকে থামাতে। আর আমরা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে শহর দখল করে ফেলেছি। রেলওয়ে হিলের অবস্থানে বসে অপেক্ষায় আছি পরবর্তী পর্যায়ের অ্যাকশনের জন্য।

প্রথম গাড়িটি জিয়াকে নিয়ে আগ্রাবাদ রোডের মুখে ব্যারিকেডে পড়ে থামতে বাধ্য হয়। জিয়া তাঁর সাথের পাকিস্তানি সৈন্যদের দিয়ে ব্যারিকেড পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছিলেন। এতে কিছুটা সময় লেগে যায়। আর এই সময়টুকু ব্যারিকেড সরাতে লেগে যাওয়ায় ক্যাপ্টেন খালেক আগ্রাবাদ এলাকার প্রবেশমুখে ব্যারিকেডের কাছে জিয়ার গাড়ির সন্ধান পায়। খালেক সেখানে মেজর জিয়াকে এক পাশে ডেকে ইপিআরকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ শুরু করার কথা জানায়। মেজর জিয়াকে খালেক এটাও বলে যে এই পরিস্থিতিতে পোর্ট এলাকায় গেলে মেজর জিয়ার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

তখন মেজর জিয়া রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের সাথে আলোচনা করে কী করা যায় সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ফিরে যান। প্রথম যে গাড়িটিকে দেখে সুবেদার আইজুদ্দিন উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সে গাড়িতে মেজর জিয়াই যাচ্ছিলেন সোয়াত জাহাজে। আমরা গাড়ি দুটোকেই 'রেকি ডিউটি'তে নিয়োজিত মনে করে বড়ো টার্গেটের আশায় ধৈর্য ধারণ না করে রকেট লঞ্চারের গোলা ছুড়লে মেজর জিয়ার প্রথম গাড়ি এবং কিছু পরে খালেককে নিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় গাড়ি দুটো টুকরো টুকরো হয়ে যেত, মারা যেত আরোহী সবাই। এমনি করেই দৈবক্রমে বেঁচে গেলেন মেজর জিয়া, খালেক ও গাড়ির আরোহীরা।

ইউনিট লাইনে (৮ বেঙ্গল) ফিরে মেজর জিয়া বাঙালি অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে লে. কর্নেল জানজুয়া ও অন্য অবাঙালি অফিসারদের বন্দি করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা অবাঙালি সবাইকে নিষ্ক্রিয় করেছেন মাত্র–এমন সময়ই ইবিআরসিতে বাঙালি সৈন্য ও অফিসারদের ওপর ২০ বালুচের আক্রমণের প্রাথমিক খবর এসে গেল মেজর জিয়ার কাছে।

চট্টগ্রামে ২৫ মার্চের রাত সাড়ে ৯টার দিকে হালিশহরে আমার অফিস থেকে ক্যাপ্টেন হারুনের কাছে একটি টেলিফোন কল বুক করেছিলাম। কাপ্তাই এলাকা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এনে অবিলম্বে চট্টগ্রামে এসে আমার সাথে যুদ্ধে যোগ দিতে বলার জন্যই এই ফোন।

চট্টগ্রাম, ২৫ মার্চ, রাত ২টা (২৬ মার্চ প্রথম প্রহর)। একজন অপরিচিত ব্যক্তি রেলওয়ে হিলে আমার ট্যাকটিকল হেডকোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ, সুঠামদেহী এই লোকটি আমাকে বললেন, কালুরঘাট এলাকায় একটি রেডিও ট্রান্সমিটার স্টেশন আছে। সেখানে গিয়ে যুদ্ধ শুরুর একটা ঘোষণা দিন।

'এখানে আমি একমাত্র অফিসার, আমার পক্ষে এখন এ স্থান ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনি একটা কাজ করতে পারেন। একটি টেপরেকর্ডার নিয়ে আসুন। আমার বক্তব্য টেপ করে তা রেডিও স্টেশনে নিয়ে প্রচার করতে পারবেন।'

এর পরও অপরিচিত আগন্তুক তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য আমার ওপর এত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যে আমি খুবই সন্দিহান হয়ে পড়লাম। আমি ভাবলাম 'পুরো বিষয়টি পাকিস্তানিদের একটা চক্রান্ত হতে পারে।' আমাকে রাজি করাতে না পেরে তিনি রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি আর কখনো ফিরে আসেননি।

২৬ মার্চ ভোর ৪টার দিকে টেলিফোনে 'মেসেজ' পেলাম যে প্রায় ১০০ গাড়ির একটা বড়ো 'কনভয়' কুমিল্লা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কর্মরত জনাব শাকুর এই 'মেসেজটি' চট্টগ্রাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি সাথে সাথে আমাকে পুরো খবরটি জানিয়ে দেন। এ 'মেসেজটি' কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত বাঙালি মেজর বাহার আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

খবর পেয়ে সাথে সাথেই আমি হালিশহর থেকে একজন জেসিওর নেতৃত্বে এক কোম্পানি সৈন্য পাকিস্তানিদের এই দলটিকে অ্যামবুশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। হালকা এবং ভারী মেশিনগান ছাড়াও আমাদের এই কোম্পানির সাথে ছিল মর্টার ও রকেট লঞ্চার। অভিযানে রওনা হওয়ার পূর্বে এই কোম্পানির জেসিও ইনচার্জ সুবেদার মুসা টেলিফোনে আমাকে বললেন, 'আমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন, স্যার।'

আমাদের এই সাহসী সৈনিকরা মাতৃভূমির জন্য ঠিক তাই করতে পেরেছিল। পাকিস্তানিদের যে কনভয়টি কুমিল্লা থেকে আসছিল সেখানে ছিল ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সেস রেজিমেন্ট, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের একটি দল, ৮৮ মর্টার ব্যাটারি এবং ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈন্য। এরা সবাই ২৬ মার্চ বিকাল ৩টার দিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কুমিল্লা থেকে ১০০ মাইল দূরে চট্টগ্রামের পথে এই কনভয়টিকে অনেক কালভার্ট এবং ব্রিজ অতিক্রম করতে হয়। কুমিল্লায় ৫৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই এই কনভয়টির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

২৬ মার্চ বিকালে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ও তাঁর সৈন্যদল চট্টগ্রাম থেকে ১২ মাইল দূরে কুমিরায় পৌঁছে যায়। আমাদের ইপিআর সৈন্যরা ইতোমধ্যেই সেখানে অ্যামবুশে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষায় ছিল।

পথের ছোটোখাটো সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চট্টগ্রাম শহরের মাত্র ১২ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারায় ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি হয়তো খুব নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে আর আধাঘণ্টার মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে সেখানে অবস্থানরত পশ্চিমা সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়ে শহর দখল করে ফেলবেন। কিন্তু হঠাৎ করে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে গেলেন। সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তাঁর সৈন্যদের অর্ধেকের বেশি নিয়ে আমাদের অ্যামবুশের মধ্যে ধরা পড়ে গেলেন ইকবাল শফি। কুমিরায় মহাসড়কটির এই অংশে স্থানীয় জনগণ আগে থেকেই 'ব্যারিকেড' স্থাপন করেছিল। পাকিস্তানিরা এখানে পৌঁছার পর 'ব্যারিকেড' সরানোর জন্য থামে। তখন বিকাল ৫টা। আমাদের সব সৈন্য একযোগে পাকিস্তানিদের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে। ডান, বাম ও সম্মুখ–তিন দিক থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে থাকে। দিশেহারা হয়ে পড়েন ইকবাল শফি ও তাঁর সৈন্যরা।

পরে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে কুমিরায় এই অ্যামবুশে পাকিস্তানিদের অনেক যানবাহন ধ্বংস হয় এবং ৭০ জনেরও অধিক হতাহত হয়। অন্য সূত্রের খবরে আরো জানা যায় যে পাকিস্তানের ২৪ এফএফ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার এবং ১০ জন সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং আরো অনেকে আহত হয়। পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচালেন ইকবাল শফি। তাঁর পেছনে আতঙ্কিত অন্য পাকিস্তানি সৈন্যরাও পালাতে শুরু করে–কেউ পাহাড়ের দিকে, কেউ সমুদ্রের দিকে।

এদিকে 'অ্যামবুশ' সফল হওয়ার পর আমাদের সৈন্যরা চট্টগ্রাম শহরের দিকে সরে এসে ছয় মাইল দূরে মহাসড়কের ওপরেই ভাটিয়ারী এলাকায় এসে অস্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করে। কুমিরার অ্যামবুশ এবং পরবর্তী রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষে আমাদেরও ১৪ জন হতাহত হয় এবং এদের অনেকের অবস্থা ছিল সংকটজনক। কুমিরায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সফল এই অ্যামবুশ ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক অভিযান এবং এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

২৬ তারিখ সকাল ৯টার দিকে অনেক উঁচু দিয়ে পাকিস্তানিদের হেলিকপ্টারগুলো উড়তে শুরু করলে কয়েকজন বাঙালি তাদের বাড়িঘর থেকে বন্দুক দিয়েই হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। বিরাটকায় সি-১৩০ পরিবহন বিমানে করে ঢাকা থেকে সৈন্য নিয়ে আসা হচ্ছিল। আমরা আমাদের অবস্থানসমূহ রক্ষার প্রচেষ্টায় লিপ্ত এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা যেন ক্যান্টনমেন্ট অথবা 'নেভাল বেইজ' থেকে বেরিয়ে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে না পারে সে বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য আমরা বেশ সচেষ্ট ছিলাম। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে পাকিস্তানিদের কোনো বেগ পেতে হলো না। কারণ আগের রাত্রেই তারা সেখানে ইবিআরসির ওপরে আক্রমণ চালিয়ে ১,০০০-এর অধিক বাঙালি সৈন্য হত্যা করে ফেলেছিল।

এদিকে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা কয়েকটি ট্যাংক নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

২৬ মার্চ আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম শহরের কয়েক মাইল বাইরে কালুরঘাটে চট্টগ্রাম রেডিওর 'ট্রান্সমিশন সেন্টার' থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব এম এ হান্নান ঘোষণা বাণীটি পাঠ করেন। এই ঘোষণা বাণীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে নিরীহ বাঙালিদের রক্ষা করার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন ছাড়াও বাঙালিদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে এই সেন্টারের নাম করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।' ট্রান্সমিটারটির প্রচারের রেঞ্জ কম থাকায় ২৬ মার্চ জনাব হান্নানের প্রথম ঘোষণা পাঠ এবং পরবর্তীতে ওই স্টেশন থেকে অন্যদের বক্তব্যও স্পষ্টভাবে অনেক স্থানে শোনা যায়নি।

কুমিরা এলাকায় আমাদের অ্যামবুশের ফলে মহাসড়ক ধরে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি তাঁর সৈন্যদের একটি দলকে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সাথে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় মিলিত হওয়ার জন্য পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে দেন। অন্য একটি দলকে পাঠিয়ে দেন সমুদ্র উপকূল দিয়ে অগ্রসর হতে—ওরা যেন পেছন দিক দিয়ে এসে আমাদের অবস্থানকে ঘিরে ফেলতে পারে। ইতোমধ্যে অবশ্য আমাদের সৈন্যরা কিছুটা পেছনে সরে এসে একটা নতুন 'ডিফেন্স' গড়ে তুলেছিল।

কুমিরার ইপিআর কোম্পানিটির গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল এবং হালিশহর হেডকোয়ার্টারে আমার কাছে মজুদ খুব বেশি ছিল না। কোম্পানিটিকে তখন আরো পেছনে সরে এসে শহরের উপকণ্ঠে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দিলাম। আমাদের ওই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন সৈন্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদের; কিন্তু গোলাবারুদ পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। আর শহরের বাইরে যা কিছু সৈন্য ছিল তারা শহরে আসতে গিয়ে আটকা পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। রাঙামাটি থেকে ইপিআরের যে সৈন্যরা শহরের দিকে আসছিল তারা আটকা পড়ে গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। রামগড় এলাকায় ছিল ইপিআরের দুটি কোম্পানি। কিন্তু তারাও মহাসড়ক ধরে চট্টগ্রামের দিকে আসতে পারছিল না।

আমার সামনে তখন দুটো মাত্র বিকল্প রইল। প্রথমটি ছিল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের অস্ত্র এবং গোলাবারুদের ডাম্পগুলো দখল করা। আর দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল, সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করা–যদিও আমি কোনো ধারণাই করতে পারছিলাম না যে ভারত সরকার আমার আবেদনে কীভাবে সাড়া দেবে। তবে আপাতত প্রথম পন্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্তই নিলাম আমি। রামগড়ের একটি কোম্পানিকে নির্দেশ দিলাম তারা যেন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের পেছনে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান নেয়। সেখানে ইতোমধ্যে রাঙামাটি থেকে আসা কিছু সৈন্য 'রিইনফোর্সমেন্টের' অপেক্ষায় ছিল। রামগড়ের অবশিষ্ট সৈন্যদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে শুভপুর ব্রিজ এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলার নির্দেশ দিলাম–কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বা অন্য কোনো এলাকা থেকে সড়কপথে পাকিস্তানিরা যেন কোন 'রিইনফোর্সমেন্ট' না পায়।

২৬ মার্চ রাত সাড়ে ৮টার দিকে রেলওয়ে হিলে আমার 'ট্যাকটিকল হেডকোয়ার্টারের সামনে নৌবাহিনীর যোগাযোগ কেন্দ্রে পাকিস্তানিদের অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ করলাম। বেসামরিক পোশাকে ওদের কিছু লোক সামনের পাহাড়ে একটা মসজিদে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের সাথে আরো কিছু বেসামরিক লোকজন একই মসজিদে গিয়ে যোগ দেয়। এ সময় আমাদের পাহাড়ের একটু নিচের অবস্থানে এলএমজি নিয়ে 'পজিশনে' থাকা আমার একজন সৈন্য 'ট্রেঞ্চ' থেকে বেরিয়ে আসতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। গুলি ছোড়া হয়েছিল মসজিদের দিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের অবস্থানের ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। একই সময় বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজগুলোও গোলাবর্ষণ শুরু করে।

'শেল'গুলো ফাটতে থাকে চারপাশে। চোখের পলকে শেলের টুকরো ছুটে যায় প্রচণ্ড গতিতে। কিছুক্ষণ পর 'টাইগারপাস'-এর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে পাকিস্তানিরা রেলওয়ে হিলে আমাদের অবস্থানে আক্রমণ চালালে আমরা তা প্রতিহত করি। আবার আক্রমণ চালায় পাকিস্তানিরা। দুটো আক্রমণই সরাসরি সামনের দিক থেকে হওয়ায় পাকিস্তানিদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। এরপর পাকিস্তানিরা তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফিরে যায় এবং আমাদের ওপর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে।

পাকিস্তানিরা একই সময়ে হালিশহরেও আমাদের অবস্থানসমূহের ওপর আক্রমণ চালায়। তবে আমাদের সৈন্যরা দৃঢ়তার সাথে সে আক্রমণ প্রতিহত করে। শহরের অন্য প্রায় সব জায়গায়ই পাকিস্তানিদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। শেলের বিস্ফোরণে পুরা শহর যেন কেঁপে উঠছিল। 'ট্রেসার' বুলেট ছুটে আসছিল ঝাঁকে ঝাঁকে, রাতের আকাশকে রহস্যময় আলোতে আলোকিত করে ফেলল 'ট্রেসার' বুলেটগুলো। মনে হচ্ছিল ২৬ মার্চের রাত যেন শেষ হবে না।

ঘণ্টা দুয়েক পর গোলাবর্ষণ কমে আসে কিছুটা। এ সময় আমার একজন আহত সৈন্যকে নিয়ে আসা হয় কমান্ড পোস্টে। ১৮-১৯ বছর বয়সী তরুণ। ওর পুরনো ময়লা কাপড় ভিজে গেছে রক্তে। একটা বুলেট তার বুক বিদ্ধ করেছে। অতি কষ্টে শ্বাস নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি মরে যাব?' তার চোখ দুটো ছিল ভাবলেশহীন। আর সেখানেই যেন ফুটে উঠেছিল জীবনের সব প্রশ্ন, বিপুল জিজ্ঞাসা। এরপর আর কিছুই বলতে পারেনি ওই যোদ্ধা। আরো অনেকের মতো আমাদের মাঝ থেকে সেই তরুণ হারিয়ে গেল চিরতরে।

চট্টগ্রামে ইপিআরের বাঙালি সৈন্য ও জনগণের সহায়তায় আমি পাকিস্তানিদের ওপর Pre-emptive (আক্রান্ত হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া) আক্রমণ চালিয়ে সফল হই। ২৪ মার্চ রাত এবং ২৫ মার্চ ১৯৭১ সীমান্তের সকল ফাঁড়ি ও চট্টগ্রাম শহর দখলে নিয়ে নিই, যা পাকিস্তানিরা কল্পনাও করতে পারেনি। সর্বোপরি ২৬ মার্চ কুমিরায় 'অ্যামবুশ' করে পাকিস্তানিদের পুরো একটি ব্রিগেডকে তছনছ করে মুক্তিযুদ্ধের গতিধারা আমরাই নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্য আমাদের অদম্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে। যুদ্ধ যত দীর্ঘ এবং রক্তাক্তই হোক না কেন–আমাদের স্বাধীনতা অর্জন অপ্রতিরোধ্য, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০২১)

লেখক : সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধে ১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার।

বিজয়ের দর্শন

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস বাঙালির ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ অধ্যায়। ১৯৭১-এর যে দিনটিতে বাংলার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায়ের সূচনা হয় আর যে দিনটিতে দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের বিজয় সূচিত হয়, তা ছিল আবহমান বাংলা ও বাঙালির চির আকাঙ্ক্ষার এক চাহিদা পূরণের কালপর্ব। বঙ্গেয় উপদ্বীপের বাঙালিরা কালের পরিক্রমায় রাজনৈতিক বিভেদ রেখায় বিভাজিত হলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে পলি মাটি আর জোয়ার-ভাটায় ঋদ্ধ এই পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা স্বজাতির আকাঙ্ক্ষা বিস্মৃত না হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলা ভাষাভাষীদের একমাত্র স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের জন্ম দিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ে এবং সফলকাম হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ। ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় বাঙালির জীবনের সম্ভাবনা আর অগ্রগতির স্বর্ণদুয়ার খুলে দেয়।

শেরে বাংলা ফজলুল হক যে বাঙালিদের ব্যাঙের মতো মনে করে এক পাল্লায় উঠিয়ে আনা অসম্ভব মনে করেন, বাঙালি মধ্যবিত্তের সাহস আর ত্যাগের প্রতীক শেখ মুজিব নামের এক আশ্চর্য পুরুষোত্তম তা সম্ভব করে তোলেন। তাঁর অদম্য সাহস, বুকভরা ভালোবাসা আর অজেয় দেশপ্রেমকে সম্বল করে তিনি বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বাধীনতা আর মুক্তির বারতা পৌঁছে দিয়ে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। মুজিব বাঙালির স্বাধীনতা আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলেন। মানুষকে, বাঙালি মানুষকে চণ্ডীদাসের অমর বাণীতে ঐক্যবদ্ধ করেন– 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' দুর্বল বাঙালিকে ঐক্যের শক্তিতে দৃঢ় ও আশাবাদী করে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেন। মুজিব শেখান যে–যারা রক্ত দিতে জানে তারা পরাভব মানে না।

বাঙালির হৃদয়ের রাজা মুজিবের প্রদর্শিত পথে বাঙালি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বিজয় ছিনিয়ে আনে। সে বিজয় বাঙালি জাতির সামনে অপার সম্ভাবনার এক স্বর্ণদুয়ার খুলে দেয়। হাজার বছর ধরে বিদেশি দুঃশাসন ও শোষণ–বিশেষ করে ইংরেজ আর পাকিস্তানিদের দুঃশাসন ও শোষণ বাংলাকে নিঃস্ব করে দেয়। একাত্তরের যুদ্ধের সময় দখলদার পাকিস্তানিদের পোড়ামাটি নীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একেবারেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করায়। বিজয়ী বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা শঙ্কা ছিল সবার মাঝেই। এরই মধ্যে আবার ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। রাষ্ট্রপিতা বঙ্গবন্ধু যখন দেশের শাসনভার হাতে নেন, তখন দেশ পুরোটাই বিধ্বস্ত। এরই মাঝে চির আশাবাদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাল ধরেন শক্তভাবেই। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের লড়াইয়ের পথে পথে যে তাজউদ্দীন,

মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল আর কামারুজ্জামানরা ছিল সাহসী সহযোদ্ধা, তেমনি ষড়যন্ত্রের কূটচালে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত চতুর মোশতাকরাও ছিল। সময়ের বিবর্তনে এই ষড়যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল। চির আশাবাদী মুজিবও মাঝে মাঝে যেন কেমন আনমনা হয়ে যান। তারপরও তাঁর দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি তাঁর অফুরান ভালোবাসা তাঁকে দৃঢ়ভাবে পথ চলতে সহায়তা করে। এমনি পরিস্থিতিতে মোশতাক-জিয়া আর তাদের বিদেশি প্রভুরা তাঁকে শারীরিকভাবে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে সফলকাম হয়।

আজ এত বছর পর এসে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে– সত্যি কি তারা সফল? অন্তত বর্তমান বাংলাদেশের দিকে তাকালে কিন্তু তা মনে হয় না। ইতিহাস তার নিজস্ব পথে ফিরছে, সেই সঙ্গে বাংলাদেশও। ১৯৭৫ সালের হৃদয়বিদারক পটপরিবর্তনের পর আমাদের জাতীয় জীবনে বারবার যে সমরতন্ত্র চেপে বসে, তা থেকে নানা চড়াই-উতরাই পার করে আমরা গণতন্ত্রে ফিরি। যদিও এ পথও খুব মসৃণ ছিল না।

বাংলাদেশ অনেক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সামনে এগোচ্ছে। যাত্রালগ্নে যারা বাংলাদেশকে বলেছিল তলাবিহীন ঝুড়ি, আজ তারাই বলে বেড়ায় বাংলাদেশ এশিয়ার টাইগার। যদিও কতগুলো ক্ষেত্রে আমরা কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারিনি। বিশেষ করে টেকসই গণতন্ত্র। তারপরও বলব–বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সাফল্যের সঙ্গেই বিশ্ব মানচিত্রে পদচারণ করছে। এই সময়ের দিক থেকে আমাদের অগ্রগতি শুধু সন্তোষজনকই নয়, বিস্ময়করও বটে। যদিও যাত্রালগ্নে এ নিয়ে কম কথা হয়নি। সব শঙ্কা আর সম্ভাবনাহীনতাকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে বহু ক্ষেত্রেই মডেল। এমডিজি সফলতার সর্বশেষ যে স্কোর প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি অতি দারিদ্র্য সূচকের বিপরীতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। মাতৃ মৃত্যুহার ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ কমেছে। বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি উপস্থিত থাকছে। শিক্ষার হারে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষাগুলোতেও তাদের পাসের হার বেশি। নারীশিক্ষার অগ্রগতির কারণে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। নারী উন্নয়নের আরেকটি সফল কাহিনি হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। যেখানে ব্যাপকহারে নারীরা কাজ করছেন। আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন।

এ ছাড়া ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্যের সীমা কমে ১০ শতাংশে নেমে এসেছে। দারিদ্র্যের সীমা ২৫ শতাংশে কমিয়ে আনা হচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের পর বাংলাদেশের মেয়েরা বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়েছে। উন্নতি লাভ করেছে। মেয়েরা এখন বেতন ছাড়া পড়াশোনা করতে পারছে। শিক্ষাবৃত্তি পাচ্ছে। শিক্ষা উন্নয়নের এটাও অন্যতম কারণ। বিশ্বজুড়ে মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপকতা থাকলেও বাংলাদেশে বার্ষিক ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি রয়েছে। যদি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকত, তবে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার আরো ১.৫ শতাংশ বেড়ে যেত।

এ কথা আজ হলফ করে বলা যায়, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের মর্মান্তিক পটপরিবর্তন না ঘটলে বাংলাদেশ আকাঙ্ক্ষার কাছাকাছি পৌঁছতে পারত। '৭১-এর পরাজিত হায়েনার কালো নখের থাবায় সেদিন কক্ষচ্যুত হয় জাতি। তারা ভাবে রক্তে কেনা বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনবে পাকিস্তানের ভূতদর্শন এবং সেই লক্ষ্যে তারা অনেকাংশে সফলও হয়। কিন্তু না, বাংলার মানুষের অজেয় রক্ত পিতার স্বপ্নের সঙ্গে কখনো বেঈমানি করতে পারে না। পিতা আমৃত্যু আস্থা রাখেন বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর। আর বাংলার মানুষও নিজেদের সঁপে দেয় পিতার ওপর। পিতা জীবন দিয়ে আস্থার প্রতিদান দিয়ে গেছেন। তাই আজ দেখি বাংলার প্রতিটি গণজাগরণ আর বিজয়ের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

আমাদের যাত্রাপথের প্রতিটি অলিগলির নাম মুজিব। এ নাম বাংলার সাধারণ মানুষের নিকট বড়ো প্রিয়। বারবার চেষ্টা করা হয় বাংলাদেশ থেকে এ নামটি মুছে দেওয়ার; কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারণ বাংলাদেশের আরেক নাম তো শেখ মুজিব। তাঁর চিন্তা-চেতনা বা আদর্শ থেকে কক্ষচ্যুত হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ আমাদের নেই। নিজেদের স্বার্থেই বারবার তাঁর কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। একটা সময় গেছে যখন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। ১৯৭১-এর কথা বিবেচনায় নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে থাকলে চলবে না। এতে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। ব্যাহত হবে উন্নয়ন। তারা কি পেরেছে? না পারেনি। বাংলাদেশের মানুষ পুনরায় জেগে উঠেছে। সকল ষড়যন্ত্র আর প্রতিক্রিয়াশীলতাকে রুখে দিতে তারা ২০০৮ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। বাংলাদেশের জনগণ এ সত্য অনুধাবন করেছে যে ৭১-এর পরাজিত শক্তিকে না থামাতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং সেই সঙ্গে জাতির ললাট থেকে মুছতে হবে সমস্ত কলঙ্ক। তারই ধারাবাহিকতায় দশম সংসদ নির্বাচনেও সকল ষড়যন্ত্রকে পেছনে ফেলে মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করেছে। আর এ কথা কে না জানে পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনআকাঙ্ক্ষার প্রতীক জননেত্রী শেখ হাসিনা।

বিজয়ের মাসে আমাদের শপথ স্পষ্ট। সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে জননেত্রীর নেতৃত্বে এগোতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার যে সুযোগ এসেছে, তা হেলায় হারাতে দেওয়া যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত করায় আমরা জাতি হিসেবে, রাষ্ট্র হিসেবে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই, তা কখনো পূরণ হওয়ার নয়। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মোকাবিলা করতে হবে। নতুন দিনের চেতনা, বিজয়ের চেতনা আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য। মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার দর্শনই হচ্ছে আমাদের বিজয়ের দর্শন।

আমাদেরকে গণমানুষের ভাষা বুঝতে হবে, বুঝতে হবে তরুণদের ভাষা। কারণ গণমানুষের লড়াই আর সংগ্রামের ফসল আজকের বাংলাদেশ। মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ

আর প্রতিক্রিয়াশীলদের রুখে দিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের নিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের কাছে, জনকের কাছে। তাদের চিন্তা আর ভাষা গড়ে উঠছে রাষ্ট্রপিতার আদর্শকে কেন্দ্র করে। রাষ্ট্রপিতা ১৯৭১ সালে ঘোষণা করেন– 'জয় বাংলা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রতীক।' আমাদের মনে হয়, আজ আবার জয় বাংলা ফিরে এসেছে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। সমরতন্ত্র আর ধর্মান্ধতাকে পেছনে ফেলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। আমাদের সামনে এখন একটি পথ খোলা। যে পথে দাঁড়িয়ে আছে গণমানুষ আর তরুণরা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে তারা যখন উচ্চারণ করে– বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী কোনো রাজনৈতিক শক্তি থাকবে না, তখন চোখের সামনে ভাসে ভবিষ্যতের আলোকিত বাংলাদেশ। ভোট আর জোটের হিসাব রাজনীতিতে থাকবেই। কিন্তু দেশ সবার ওপরে। এই যে রাজনৈতিক পক্ষ-বিপক্ষ, সবই তো দেশ আছে বলে। দেশ নেই তো কিছুই নেই।

আমরা আশা করব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনে যে আকাঙ্ক্ষা তাড়িত হয়ে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম রচনা করে, সেই লক্ষ্যে আমরা সহনশীলতার সাথে এগিয়ে যাব। অন্যথায় আমাদের সামনে রয়েছে শঙ্কিত এক ভবিষ্যৎ। আগামীর মানুষের কাছে আমাদের দায় আমরা এড়াতে পারব না। বিজয়ের এই চেতনা ও দর্শনকে সামনে নিয়ে আমাদের পথচলা অব্যাহত থাকবে। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসম্বর ২০১৫)

লেখক : সংসদ সদস্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার চার দশক পূর্তিতে প্রত্যাশা

এইচ টি ইমাম

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৬ মার্চ সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। বাঙালি জাতির পথপরিক্রমায় শুভযাত্রার দিন। সাবেক পাকিস্তানের পূর্ব ভূখণ্ডের শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত-অত্যাচারিত বাংলা ভাষাভাষী জনগণের স্বাধীনতা লাভের দিন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। শোষণ-বঞ্চনা এবং দাবিয়ে রাখার নানা অপকৌশল থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার দিন। বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পবিত্রতম ও চিরস্মরণীয় দিন। মর্যাদাপূর্ণ এই দিবসটি অর্জনে বাঙালি জাতিকে অসংখ্য মূল্যবান প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছে।

ইংরেজ শাসনের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল। তারই একটি পাকিস্তান। হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কৃষ্টি, সামাজিক আচার-আচারণ, আলাদা ভাষা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের একচোখা নীতির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আন্দোলন-সংগ্রামে মুখর হয়। এই আন্দোলন বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল–এই ২৪ বছর বাংলার স্বাধীনতার যে মহাকাব্য রচিত হয়েছিল তার মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বাঙালি জাতি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ঐক্যবদ্ধ হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ এক গৌরবময় অধ্যায়।

সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত বাঙালি নেতা আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সমগ্র পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করতে পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক সামরিক শাসক টালবাহানা শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তানের অপশক্তির হোতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র নিরস্ত্র-নিরীহ বাঙালি জনগণের ওপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর অতর্কিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচার গণহত্যা চালিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া আলোচনার নামে প্রতারণা করেন। সেনা অভিযান শুরু। কিছু সময়ের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর রাত দেড়টায় পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সর্বত্র প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে নিম্নলিখিত বার্তাটি প্রেরণ করেছিলেন।

এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা।
আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। [বাঙালির কণ্ঠ, আগামী প্রকাশনী]

স্বাধীনতার ঘোষণা একটি মুহূর্তের বা দিনের কোনো বিষয় নয়। যেকোনো জাতির জীবন-মরণ প্রশ্ন জড়িত থাকে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনেও বাঙালি জাতির জীবন-মরণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। শুরুতে অতি সংক্ষেপে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের কিছু প্রাসঙ্গিক চিত্র তুলে ধরেছি। সূচনায় যেসব কথা বলেছি, তার সঙ্গে আরো কিছু বিষয় বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মের জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলনের মধ্যে ছিল ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। এসব আন্দোলনে পূর্ব বাংলার জননেতৃবৃন্দের ছিল উল্লেখযোগ্য অবদান। দেশ বিভাগের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়কে ১৯৫৮ এবং ১৯৬৯ সালে সামরিক আইন জারি করেও যেমন আড়াল করা সম্ভব হয়নি, তেমনি পাকিস্তানি শাসকবর্গের পক্ষে বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনকে দমানো যায়নি। এর কারণ হিসেবে আমি যা শনাক্ত করি তা হলো, ১৯৪৮ সালে সৃষ্ট পাকিস্তানের দুটি অংশের পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, পুঁজিপতি, আমলা ও সামরিক ব্যক্তিদের উপনিবেশবাদী মনোভাব পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাবধারাকে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এই অনুভূতি থেকে পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদের জন্ম। জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষকগণের সঙ্গে আমিও এ বিষয়ে সহমত পোষণ করি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে আমি পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে তৎকালীন আমার অনেক সিএসপি সহকর্মীর চেয়ে একটু বেশিই জানতাম। কারণ ১৯৬৫ সালে আমাকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি করে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। আমি যাওয়ার কিছুদিন পরই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না থাকায় এবং তথ্যমন্ত্রী সিনিয়র মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে প্রেসিডেন্টের পরই তাঁর অবস্থান ছিল। ক্যাবিনেটের আলোচনা, সিদ্ধান্ত সবই তখন আমি জানতে পারতাম। আর ওই সরকারের সবচেয়েই প্রভাবশালী সেক্রেটারি ছিলেন আলতাফ গওহর। বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের চোখে কেমন ছিল, তারা কীভাবে বাঙালিদের অবজ্ঞা করত সেসব দেখেছি। কাজেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে যখন পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার জনগণকে আক্রমণ করে

বসে, তখন তো বাঙালি জাতির পক্ষে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো পথই থাকল না। ব্যক্তিগতভাবে আমি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে থাকার কথা ভাবতেই পারিনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের তৎকালীন সিএসপি অফিসারদের ইস্ট পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় জানিয়ে দেওয়া হলো, আমরা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করব না। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের আহ্বানের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এ সময় আমি অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সিএসপি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ কাজ করছিলেন। সে সময় মার্শাল ল' জারি থাকলেও চট্টগ্রামের মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চট্টগ্রামেই তার তৎপরতা সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে পাকিস্তান আর্মি ১৯৭১ সালের গোড়া থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে আর্মস বিল্ড আপ শুরু করেছিল।

বাঙালি জাতির জীবনে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরার পর এমন বহু কিছু বিষয় স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে রয়েছে, যা গত চল্লিশ বছরেও যথাযথভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি বলেই আমি মনে করি। এর প্রধানতম কারণ হিসেবে বলা যায়, স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার দিন থেকেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রথম ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমাদের এমন প্রতিকূলতার মুখে প্রতিনিয়ত পড়তে হয়েছিল। পাকিস্তানি শত্রুদের হটিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ী হয়েও দেশবিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমি মনে করি, এখনো তা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ঘাতকরা তাঁকে হত্যা করে। তারা বাংলাদেশের বৈধ প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে এবং পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশের নীলনকশা বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে দেওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিসহ স্বাধীনতার ঐতিহ্যই ম্লান করার চেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ জনমনে প্রোথিত করার অপচেষ্টা করে চলেছে।

প্রসঙ্গিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসনে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা হলো ২৫ মার্চ রাতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সেই রাতেই ক্যাপ্টেন রফিক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। চট্টগ্রামে ২৬ মার্চ সকালে মাইক দিয়ে প্রচার করা হয়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ওই দিন

দুপুরে জহুর আহমদ চৌধুরীসহ হান্নান সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। হান্নান সাহেবের আগেও ড. শফি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। এরপর আরো কোনো কোনো ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। কিন্তু মূল ঘোষণা হান্নান সাহেব দেন। লক্ষ্য করার বিষয়, মেজর জিয়াউর রহমান তখনো ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হননি। কারণ ওই দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী জিয়াউর রহমানকে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করার জন্য হুকুম দিয়েছিল। মেজর জিয়া ডকে পৌঁছানোর আগে শ্রমিকরা বাধা দিলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা গুলি চালিয়ে অনেককে হতাহত করে। তৎকালীন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে বারণ করে বলেছিলেন, ডকে গেলে তাঁকে অ্যামবুশ করা হতে পারে। জিয়াউর রহমান ডকে না গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের কোনো কোনো কর্মী বিশেষ করে বেলাল মোহাম্মদ কোনো আর্মি অফিসারকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করার বিষয়ে একমত হয়ে মেজর জিয়াকে ঘোষণা পাঠে সম্মত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মেজর জিয়ার ঘোষণা আমি রামগড় যাওয়ার পথে থাকা অবস্থায় ২৭ মার্চ বিকেলে শুনেছি। প্রথমে মেজর জিয়া নিজের নামে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করলেও পরক্ষণেই তা শুধরে তিনি পাঠ করেছিলেন। শোধরানোর কারণ হিসেবে লেজিটেম্যাসির বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

স্বাধীনতার ঘোষণার এই বিষয়টিকে আমি দুটি অংশে দেখি, এর একটি অনানুষ্ঠানিক এবং আরেকটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যে কেউ পাঠ করতে পারে, সে ঘোষণা আইনগত বৈধতা পায় না। কালুরঘাটের ঘোষণা প্রচার ছিল অনানুষ্ঠানিক। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে রাজনৈতিক ভাষায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল প্রেরণা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ ১০ এপ্রিল বৈধভাবে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন ও শপথগ্রহণের পর উক্ত সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চ (১৯৭১) ঘোষণা এবং প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন ছিল আনুষ্ঠানিক। এই ঘোষণার শিরোনাম ছিল The proclamation of Independence। বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় (১৯৭২) এটিই ছিল মূল ভিত্তি।

proclamation of Independence-এর নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ দুটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

'যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।'

'আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।'

অনুচ্ছেদ দুটিতে স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ক তথ্য আগামী প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে।

একটি কথা বলা আবশ্যক যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আইনগত গোড়াপত্তন হয় ১০ এপ্রিল (১৯৭১)। আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এ জন্য যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ যাতে বিভ্রান্তির জালে আটকা না পড়ে। সেটি হচ্ছে, তৎকালীন মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর জীবিতকালে কিংবা অবৈধভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়ে কখনো বলেননি যে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজেকে কখনো স্বাধীনতার ঘোষকও বলেননি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই নেই, তারাই এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

সহৃদয় পাঠকবৃন্দের অনেকের জানা থাকলেও নতুন প্রজন্মের জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন :

'আজ আমাদের পর্বততুল্য সমস্যা উপস্থিত। মহাসংকটের ক্রান্তিলগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বিদেশফেরত এক কোটি উদ্বাস্তু, স্বদেশের বুকে দুই কোটি গৃহহারা মানুষ, বিধ্বস্ত কর্মহীন চালনা–চট্টগ্রাম পোতশ্রয়, নিশ্চল কারখানা, নির্বাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অসংখ্য বেকার, অপরিমিত অরাজকতা, বিশৃঙ্খল বাণিজ্যিক সরবরাহ ব্যবস্থা, ভগ্ন সড়ক, সেতু ও বিচ্ছন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং অকর্ষিত ভূমি–এ সব কিছুই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। জনগণের গভীর ভালোবাসা, আস্থা, অদম্য সাহস ও অতুলনীয় ঐক্য–এগুলোকে সম্বল করেই আমার সরকার এই মহাসংকট কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।... শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই।'

আবার বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাবের অংশবিশেষও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য। এটি ছিল নিম্নরূপ :

'২৫ মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেই দিন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী কোনো আইনকানুন মানে নাই। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙালির ওপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫ মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে

পৌঁছে দেওয়া হোক; যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম।'...

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর যে লেজিটেম্যাসি ছিল আর কারো তা ছিল না। পৃথিবীর সব দেশ বঙ্গবন্ধুর লেজিটেম্যাসির ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়কে আমল দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে একজন সেনাপতি এলেন, ঘোষণা দিলেন, আর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল।

এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক আহ্বান এবং ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল। সমগ্র বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতার বিজয়মালা ছিনিয়ে আনে।

স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে এক অনন্য জনযুদ্ধ। সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণ এবং অসীম ত্যাগ স্বীকারই জনযুদ্ধের প্রধান উপাদান। আমাদের বাঙালি সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর জন্ম হয়েছিল জনগণের মধ্যে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক সম্পৃক্ততা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে। এমন উদাহরণ ভিয়েতনামে দেখা গিয়েছিল। ভিয়েতকং গেরিলারা যেমন দেশের সর্বত্র নির্ভয়ে বিরাজমান ছিল, তেমনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শহরে-গ্রামে, বন্দরে-ধানক্ষেতে, খালে-বিলে, আনাচে-কানাচে ওত পেতে থাকত; সুযোগ-সুবিধা বুঝে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাত। এতে বাংলার জনপদে পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করত। নারী-শিশু-বৃদ্ধরাও এই আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ দিয়েছে। পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলোতে এসব নারকীয় বর্ণনার প্রতিবাদে 'Bangladesh A Thousand Mai Lai' শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনযুদ্ধের ব্যাপকতা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক অতুলনীয় বিষয়। স্বতঃফূর্তভাবে গড়ে ওঠা জনগণের বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনীগুলো, স্থানীয় প্রশাসন–এমনকি নারীরাও জাতির ক্রান্তিলগ্নে মুক্তিযুদ্ধে একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অবদানের কথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মনে হয় উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। ইদানিং বঙ্গবন্ধুকন্যার হস্তক্ষেপে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কীর্তি-কাহিনি প্রকাশ হতে শুরু করেছে, তাদের মূল্যায়নের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে।

বাংলাদেশের ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সকলের অবদানই উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয়। তারপরও বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতেই হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী মুক্তিযোদ্ধারা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে সেবা করেছেন, তা ছিল অতুলনীয়। শুধু সেবাদান কাজই নয়, তাঁরা দেশের ভেতর থেকে শত্রুদের অবস্থান, কর্মকাণ্ডের তথ্যও সংগ্রহ

করে আনতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আহারের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছেন। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে মহীয়সী এসব নারী মুক্তিযোদ্ধাকে স্মরণ করি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে সোনার বাংলা গঠনের জন্য যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে তিনি জনগণের প্রতি দ্বিতীয় বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু না হতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী চক্র তা নস্যাৎ করতে বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং সুদীর্ঘকাল এই চক্রটি দেশের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। দেশপ্রেমিক বাঙালি জনগণ ষড়যন্ত্রকারীদের নীলনকশা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে উদ্যোগ নিয়েছেন। দিনবদলের কর্মসূচিসহ সোনার বাংলা গড়ার আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর রূপকল্প-২০২১' কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তা সার্থকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর 'মুক্তির সংগ্রাম'-এর আহ্বান অর্জিত হবে। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১১)

লেখক : সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা।

ফিরে দেখা : ১৯৭১

আনিসুজ্জামান

বছরটাই শুরু হয়েছিল আশা আর উদ্দীপনা দিয়ে। যদিও তার আগের নভেম্বরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়, হানি হয় বিপুল সম্পদের, তবু ডিসেম্বরে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করেছে গণপরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সকলের আশা, ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে রচিত হবে নতুন সংবিধান। শুধু পূর্বাঞ্চলে নয়, কেন্দ্রেই শাসনক্ষমতা লাভ করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। এতদিন যে চক্র একচ্ছত্র শাসন চালিয়ে আসছিল, তার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে দেশ।

মার্চ মাস আসতেই বোঝা গেল, সে-গুড়েবালি। আবারও তঞ্চকতা, আবারও বঞ্চনার জাল ফেলা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঙালি শুরু করল অসহযোগ আন্দোলন। এমন অহিংস, এমন সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিল। ৭ই মার্চে ঢাকার জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' গর্জে উঠল মানুষ : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে সর্বত্র উড্ডীন হলো নতুন জাতীয় পতাকা : সবুজের পটভূমিকায় লাল সূর্য, তারই মাঝে সোনালি রঙে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্র। তখন শাসকচক্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা চলছিল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের। গাড়িতে এই নতুন পতাকা লাগিয়েই বঙ্গবন্ধু গেলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে।

আলোচনাটা যে ভাঁওতা ছিল, তা বোঝা গেল পরে। ওই সুযোগে পাকিস্তান তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করল এই অঞ্চলে। আর সেই আসুরিক শক্তি দিয়ে তারা আঘাত হানল ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, শিক্ষক-কর্মচারীদের আবাস, সেনানিবাসে অবস্থানরত বাঙালি কর্মকর্তা ও জোয়ান, ইপিআর ও পুলিশের সদর দপ্তর, সংবাদপত্রের অফিস, কলকারখানা, বস্তি, রাজনৈতিক দলের অফিস, অরাজনৈতিক মানুষের বাড়িঘর, শহিদ মিনার–কিছুই বাদ গেল না। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ ছুটতে থাকল নিরাপত্তার সন্ধানে–দেশের মধ্যে, প্রতিবেশী দেশে কিংবা দূরে, আরো দূরে। ভারতেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় এক কোটি মানুষ।

অসংগঠিত প্রতিরোধ যে গড়ে ওঠেনি, তা নয়। সেনানী ও সীমান্তরক্ষী, পুলিশ ও আনসার, ছাত্র ও যুবা, শিক্ষক ও সরকারি কর্মকর্তা, যে যেখানে পেরেছেন, প্রতিরোধ করেছেন সংগঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র সম্বল করে। এমন অসম দ্বৈরথ বেশিদিন চলতে পারে না। রাজনৈতিক নেতারা প্রথমেই ছত্রভঙ্গ হয়ে

গিয়েছিলেন, কিন্তু দ্রুতই তাঁরা সংগঠিত হন ভারতের মাটিতে। তাই ১০ এপ্রিলেই সম্ভবপর হয়েছিল বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। ১৭ এপ্রিলে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়। পরে যার নাম হয় মুজিবনগর। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সে সরকার শপথ নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেন : লাশের পাহাড়ের নিচে পাকিস্তান এখন মৃত ও সমাধিস্থ।

বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীকে প্রথমে কয়েকটি সেক্টরে, পরে কয়েকটি ব্রিগেডে বিভক্ত করে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করে। যেমন– অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ। কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী প্রধান সেনাপতির দায়িত্বলাভ করেন। দলে দলে যুবকরা আসে যুদ্ধে যোগ দিতে। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয় ভারত সরকারের সাহায্যে। গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন হয়, নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পাকিস্তানি জাহাজ আক্রমণ করতে, শেষকালে ছোটো বিমান দিয়ে বিমানবাহিনীর উদ্বোধন ঘটে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারাভিযান চালিয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ নামে গড়ে ওঠে কয়েকটি বাহিনী, তারাও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে থাকে। বিভিন্ন দেশে বাঙালি কূটনীতিকদের একটা বড়ো অংশ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে এবং সেসব দেশে প্রবাসী বাঙালিদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা এবং শরণার্থী বাঙালিদের দুর্দশার কথা প্রচার করলে বহু দেশের বিবেকবান মানুষ আমাদের সংগ্রামের প্রতি নৈতিক সমর্থন দান করে। মার্কিন সরকার যদিও ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, সেখানকার বহু জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাঁরা যেমন পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্যের প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি বাঙালিদের জন্য মানবিক সাহায্যদানের আবেদন জানিয়েছেন। জর্জ হ্যারিসন, রবিশঙ্কর, জন লেনন, জোয়ান বায়েজ প্রমুখ বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মিলে নিউ ইয়র্কে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর আয়োজন করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছিলেন। ভারতে শরণার্থী বাংলাদেশের শিক্ষক, সংগীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও খেলোয়াড়রাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারাভিযানে ব্যাপক অংশগ্রহণ করেন। অবরুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল ভারতের সরকার এবং সর্বশ্রেণির মানুষের কাছ থেকে। ভারত সরকার উদ্যোগী হয়ে বাংলাদেশের প্রতি অপরাপর দেশের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। তাতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া

গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ডের কাছ থেকে। বাংলাদেশের প্রতি কোনো কোনো দেশের বৈরিতা ছিল প্রকাশ্য, কোনো কোনো দেশের ছিল প্রচ্ছন্ন। তবে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যেই ক্ষুদ্র একটি অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে আপস করার উদ্যোগ নিয়েছিল। চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এই গোষ্ঠীই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা হত্যার ষড়যন্ত্র সফল করে তোলে। বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীকে পাকিস্তান সরকার নিজের পক্ষে টানতে সমর্থ হয়। এরাই শান্তি বাহিনী এবং রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি আধাসামরিক বাহিনী গঠন করে দেশের মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে। পাকিস্তান বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বক্ষণে এরাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক শক্তিতে যতই বলীয়ান হোক না কেন, তাদের পরাজয় রোধ করার কোনো উপায় ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও গণহত্যার যে পথ তারা অবলম্বন করেছিল, তাতে দেশের মানুষের অপরিমিত ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল। পদে পদে বিড়ম্বনাই ছিল পাকিস্তানিদের নিয়তি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তারা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের রূপ দিয়ে পরিস্থিতির আন্তর্জাতিকীকরণ চেয়েছিল। তাই ৩ ডিসেম্বর তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিমান আক্রমণ চালায়। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রায় অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় ভারত। নতুন করে গঠিত হয় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সামরিক কমান্ড। এদের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশে একের পর এক অঞ্চল মুক্ত হতে থাকল। পাকিস্তানিরা পালানোর পথ পেল না। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশে ঘটল নতুন সূর্যোদয়। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা এবং মানুষের দুর্ভেদ্য ঐক্য ব্যর্থ হয়নি। তবে দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজটা বাকিই রয়ে গেল। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৩)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং স্বাধীনতা পদক ও ২১শে পদক প্রাপ্ত।

বিজয় দিবসের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শ্রেষ্ঠ ও গৌরবের দিন, জাতির অহংকার ও আনন্দময় 'বিজয় দিবস'। ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণ, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের অশ্রু, সম্ভ্রম ও রক্তের বিনিময়ে এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই বাঙালি অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। বাঙালির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও মর্যাদা রক্ষার এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে অন্তর্নিহিত প্রেরণা ছিল সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা, সোনার বাংলা গড়ে তোলা। জাতির পিতা এ স্বপ্নই আমৃত্যু লালন করেছেন। তিনিই আমাদের মহানায়ক। কিন্তু এই রাষ্ট্রের ৪৮ বছরের অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বারবার হয়েছে বাধাগ্রস্ত, এমনকি প্রতিহত করার অপচেষ্টাও হয়েছে। স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মধ্যেই ঘাতকের নির্মম বুলেটে সপরিবারে জাতির পিতার শাহাদাতবরণ, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে করেছে বিলম্বিত। এখন সেই দুঃসময় কেটে গেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নানা মাত্রিকতায় প্রাগ্রসর হয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে গণমানুষের প্রত্যাশা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসঞ্জাত গণতান্ত্রিক, শোষণহীন, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, উন্নত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মহান সংবিধানে জনগণের সেসব স্বপ্নের রূপরেখা সুরক্ষিত হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র এক বছরের মধ্যেই জাতির পিতার সক্রিয় তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় প্রণীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। এ সংবিধানের মূলনীতি 'গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরক্ষেপতা ও জাতীয়তাবাদ'। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা ও লক্ষ্য কী হতে পারে, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও 'দৃঢ় হাতে হাল ধরা নৌকার নাবিক' বঙ্গবন্ধু তা উপলব্ধি করেছিলেন সম্যকভাবে। সে অনুযায়ী জনগণের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষার সকল সংস্থানও করেছেন সংবিধানে। প্রস্তাবনা অংশে অঙ্গীকার করা হয়েছে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক সমাজতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।' এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপ্রসূত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ভিত্তি ও প্রত্যাশা ছিল সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ।

বিজয়ের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই স্বাধীন মাতৃভূমি ষড়যন্ত্রকারীর আঘাতে হয়েছে রক্তাক্ত ও বিপর্যস্ত। সামরিক জান্তার মদদপুষ্ট 'কতিপয় বিপথগামী

উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি' রচনা করে ইতিহাসের কালো অধ্যায়–শোকাবহ ১৫ আগস্ট। এই অপশক্তিই একাত্তরের গণহত্যায় সমর্থনকারীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। স্বৈরশাসন এবং স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী শক্তির ক্ষমতায় আরোহণের কুফল হিসেবে জাতি দেখেছে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবদমন ও জঙ্গিবাদ।

বঙ্গবন্ধু জীবনে তিনটি বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিজয় দিবসসমূহে কী ভাবতেন বঙ্গবন্ধু?

দিনটি ছিল ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর শনিবার। সেদিন অপরাহ্নে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে বাঙালি জাতি এক নতুন বার্তা পেয়েছিলেন।

বাহাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর, বিজয় অর্জনের প্রথম বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাঙালি পেয়েছিল নতুন পথের সন্ধান, নতুন জীবন গড়ার প্রত্যয় ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরের প্রত্যাশা।

তিনি সেদিনের ভাষণে ঘোষণা করেন যে 'আজ (১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২) থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়েছে এবং পাকিস্তান আমলের সব কালাকানুন বাতিল করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'সমগ্র বাঙালি জাতি এতদিন যে অধিকার অর্জনের জন্য নিরলস সংগ্রাম করেছে, সেই অধিকারের দলিল সংবিধান মানুষ পেয়েছে।' জনতার মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেদিন ঘোষণা করেন যে 'পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন আজ থেকে বাতিল হয়ে গেল।'

পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু সেদিন এক পর্যায়ে বলেন, 'পাকিস্তান বলে কোনো পদার্থ নেই। কারণ আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম। আমরাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে বেরিয়ে এসেছি। এখন কাকে স্বীকৃতি দান করব? পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, সিন্ধুস্তান না পাঠানিস্তানকে।'

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের মহান বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, '১৬ই ডিসেম্বরের সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-গৌরব এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত। এই দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রায় এক লাখ পরাজিত শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে; কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরো শক্তিশালী শত্রু। এই শত্রু হলো অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও দুর্নীতি। এই যুদ্ধে জয় সহজ নয়। অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং একটি সুখী, সুন্দর, অভাবমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই হবে আমাদের সংগ্রাম সফল। আপনাদের শেখ মুজিবুরের স্বপ্ন ও সাধনার সমাপ্তি।'

জীবদ্দশায় শেষ বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ রবিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না। চরিত্রের পরিবর্তন না হলে অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ।'

'স্বজনপ্রীতি, দুর্নীত ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনি আপনার কর্তব্য দেশের ও দেশের জনগণের প্রতি কতটা পালন করছেন, সেটাই বড়ো কথা।' –বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

সেদিনের সেই ভাষণে তিনি আরো বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ আজ তিনটি মহাবিপদ তথা তিন শত্রুর মোকাবেলা করছে। (১) মুদ্রাস্ফীতি, যা আজ সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে, (২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং (৩) চোরাকারবারি, মুনাফাবাজ, মজুদদার ও ঘুষখোর। এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে।'

দুর্নীতিবাজ, মুনাফাবাজ, মজুদদার ও কালোবাজারিদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই সব নরপশুর উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।' এই ভাষণে তিনি আরো বলেছিলেন, 'বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান বাংলাদেশে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা সকলেই এ দেশের নাগরিক। তাঁরা সমঅধিকার ভোগ করবেন।'

ষড়যন্ত্রকারীদের একাত্তরের চেতনা বিনাশের লক্ষ্য সফল হয়নি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার স্বপ্ন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সম্পন্ন হয়েছে যুদ্ধাপরাধী ও জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে 'রূপকল্প-২০২১' প্রণয়ন করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার সংকল্প স্থির করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে দ্রুত অগ্রসরমান। ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সমুদ্র ব্যবস্থাপনা, মহাকাশ গবেষণা, সুশাসন ও গণতন্ত্র এবং সর্বোপরি শিল্প, গবেষণাসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিস্ময়কর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সঙ্গে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা,

নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৯০৯ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সামাজিক খাতের অগ্রগতিতে বাংলাদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষ্যেও এ তথ্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়, 'সামাজিক-অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। এমনকি সামাজিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারত থেকেও এগিয়ে।' নারীর ক্ষমতায়নের সূচক বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই সরকারের দুই মেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন শুরু হলে আরো দুই হাজার ৪০০ মেগাওয়াট যোগ হবে।

তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এসেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আজ বাস্তবে দৃশ্যমান। দেশে মোবাইল ব্যবহারকারী বর্তমানে ১৫২.৬ মিলিয়ন, যেখানে ২০০৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৯.১ মিলিয়ন। বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৮৮.৭ মিলিয়ন। মহাশূন্যে 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অর্জিত হয়েছে দৃশ্যমান অগ্রগতি। এছাড়া পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, নগরে মেট্রো রেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ চলমান প্রকল্পসমূহ সুসম্পন্ন হলে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে নিঃসন্দেহে। যে প্রত্যয় নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আজ মানুষ সে প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করে শেখ হাসিনার মধ্যে। বঙ্গবন্ধু যেমন আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে, আজ শেখ হাসিনা তেমনি ১৬ কোটি বাঙালির আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

জাতির পিতার আরাধ্য কর্মপ্রয়াস ছিল দুটি– স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করা। তিনিই প্রথম স্বপ্নপূরণের অগ্রনায়ক। দ্বিতীয়টি বাস্তবায়নের জন্য হাল ধরেছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দূরদর্শী ও কৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বহির্বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন, পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষায় বিশ্ব সমাজের করণীয় নির্ধারণ ও বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অঙ্গীকার আজ বিশ্বে প্রশংসিত। মানুষের প্রতি দরদ, ভালোবাসা তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। বিশ্ববাসী আজ বাংলাদেশের মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 'চ্যাম্পিয়ন অভ আর্থ' ও 'মাদার অভ হিউম্যানিটি' মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে কেবল রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক

স্থিতিশীলতা। চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, সমুন্নত হবে বিজয়ের চেতনা।

বিজয় দিবসের প্রত্যয় হতে হবে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে যে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড দিয়ে গেছেন তা রক্ষা করা। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি এখনো দেশবিরোধী ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা যেন কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোয় আসতে না পারে সেদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাই দেশবিরোধী যেকোনো ষড়যন্ত্র বা শক্তিকে কঠোর হস্তে মোকাবিলা করতে হবে। বঙ্গবন্ধুই বলেছেন স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। এ থেকে আমরা আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারি। এই রক্ষা মানে হচ্ছে দেশের নাগরিকদের দক্ষ, সুশিক্ষিত জনসম্পদে রূপান্তর করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ করে তোলা। এই লক্ষ্যে দুর্নীতিমুক্ত, উদার, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে সকল নাগরিককে প্রত্যয়দীপ্ত করাই হবে বিজয় দিবসের মর্মকথা।

লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সব বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে এই এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা থেকে বাংলা আর কখনো পিছিয়ে যাবে না। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সকল পেশার মানুষকে এখন সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সেটিই হোক এবারের বিজয় দিবসের প্রত্যয়, প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৯)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য।

নতুন প্রজন্ম ও দেশপ্রেম

রশীদ হায়দার

একটা সময় ছিল, যখন হতাশায় ভুগেছি। ১৯৭১ সালে গোটা যুদ্ধকালটা আমি দেখেছি বেশ পরিণত বয়স দিয়ে। যুদ্ধে যাইনি ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের খবর রাখতে হতো, শুনতে হতো, বিশ্বস্তজনের সঙ্গে আলোচনা-সমালোচনা-বিশ্লেষণও করেছি, তাতে আশা-নিরাশার দোলাচলও ছিল।

নিরাশার কথাটাই আগে বলে নিই। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে যখন জানতাম স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা পর্যুদস্ত হচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অমন অসম যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করতে পারছে না, তখন তীব্রভাবে আশাহত হয়ে আবার নতুন আশায় বুক বাঁধতাম, কারণ যুদ্ধের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য মাটি রক্ত চায়। বিনা রক্তপাতে প্রকৃত স্বাধীনতা কেউ পায় না। স্বাধীনতার জন্য বাঙালিরা যে পরিমাণ জীবন ও রক্ত দিয়েছে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সেই পরিমাণ রক্ত দেয়নি। ইতিহাস জানিয়ে দেয়, গোখলের কথা 'বাংলা আজ যা চিন্তা করে, অবশিষ্ট ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল'। অর্থাৎ বাঙালির অগ্রসর চিন্তা সব সময়ই পথ দেখিয়েছে এবং এর সত্যতা পাওয়া যায় পাকিস্তান আমলেও।

কোনো সন্দেহ নেই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভুরা ক্ষমতা ও শক্তি বলে আমাদের ওপর শাসন চালিয়েছে নির্মমভাবে, আমাদের প্রতি প্রজার মতো ব্যবহার করে। বাঙালির মতো দেশপ্রেমিক তারা কখনোই নয়। দেশপ্রেম তাদের বুলি মাত্র– তারা বাঙালির প্রতি দেশপ্রেমের উপদেশ দিত; কিন্তু স্বার্থ উদ্ধারে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাত। এই অবস্থা শুরু হয়েছিল দেশ ভাগের অব্যবহিত পরেই; ভাষার প্রশ্নটি যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তখন সেই প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকদের চোখে শত্রু হয়ে ওঠে এই বাঙালিরাই, বাঙালি নতুন প্রজন্মের অধিবাসীরাই। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দান ও ২৪ মার্চ কার্জন হলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুখের ওপর 'নো নো' উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ কেউ তো আগে শিখিয়ে দেয়নি, কিন্তু সেটা হয়েছে তীব্র বোধ ও উপলব্ধি থেকে। জিন্নাহর প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ নতুন শিকলে আবদ্ধ হয়ে পড়া, তাদের গোলাম হয়ে থাকা।

বর্তমান ২০১৪ সালে লেখাটি লিখলেও বলতে চাই, পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে নতুন প্রজন্মের সন্তানরাই সমস্ত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, বুকের রক্ত দিতে দ্বিধা করেননি। অনস্বীকার্য, বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে, বিশেষ করে ভাষার প্রশ্নে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আন্দোলনের শুভ সূচনা করলেও সেই আন্দোলনকে বেগবান ও মহিমান্বিত করেছে নতুন প্রজন্ম, অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা। উদাহরণটি দিলেই বোঝা যাবে ভাষার প্রশ্নে নতুন প্রজন্মের বুকে

কোনো ছাইচাপা আগুন ছিল। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'স্মৃতি ১৯৭১'-এর তৃতীয় খণ্ডে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি আরমা দত্ত লিখেছেন, 'বলেছিলেন দাদু (ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত) : প্রথম গণপরিষদ অধিবেশন শেষে করাচি থেকে ফিরলাম। অনুন্নত তেজগাঁও বিমানবন্দরে সিকিউরিটি বলতে কিছুই নেই। প্লেন থেকে নেমে দেখলাম, প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন যুবক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের গায়ে চাদর। আমার ধারণা হলো, গণপরিষদে বাংলার সপক্ষে কথা বলার দরুণ এরা বিক্ষোভ জানাতে এসেছে, এদের চাদরের আড়ালে অস্ত্রও থাকতে পারে। সংশয় নিয়ে এগিয়ে গেলাম। যখন ওদের একেবারে নাগালের মধ্যে চলে গেছি তখন হঠাৎ প্রত্যেকে চাদরের তলা থেকে রাশি রাশি ফুল বের করে আমার ওপর বর্ষণ করতে লাগল। ওরা সবাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।' (পৃ. ২৩)। এটাকে আমি আবেগ না বলে ভাষার নায়কের প্রতি তীব্র ভালোবাসা ও সমর্থনের কথাই বলব। পাকিস্তানের বয়স তখন মাত্র ছয় মাস। ছয় মাসেই দেশের প্রতি মোহভঙ্গের দৃষ্টান্ত বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।

নতুন প্রজন্মই বোধ করি সবচেয়ে বেশি দেশপ্রেমিক হয়। কাকে বলব নতুন প্রজন্ম? স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখার যে উদ্দীপনা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে, সেখানে অনিয়ম-বৈষম্য পরিলক্ষিত হলে তারাই প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে সর্বাগ্রে, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। পাকিস্তান আমলের ইতিহাসের পরতে পরতে এর প্রমাণ রয়েছে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের যে সূচনা, বায়ান্নতে যার বিস্ফোরণ, তার ফল মুসলিম লীগ সরকার হাড়ে হাড়ে টের পায় নতুন প্রজন্মের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন পরাজিত হন খালেক নেওয়াজ খান নামের এক তরুণের কাছে, বহু মুসলিম লীগ নেতা পরাজয় মানেন তরুণ নেতাদের কাছে। সেসব তরুণের রাজনীতিতে হয়তো তেমন অভিজ্ঞতা নেই; কূটকচালে তেমন পারদর্শী নন, তবু জিতেছেন, জিতেছেন তারুণ্য দিয়ে, তারুণ্যের অপরিমেয় শক্তির সম্ভাবনা দেখিয়ে।

কথায় যে বলে, তরুণরাই জাতির মেরুদণ্ড, ভবিষ্যতের কাণ্ডারি, এ কথায় বিন্দুমাত্র মিথ্যে নেই। উদাহরণ দেওয়া যায় : ১৯৬২ সালের জানুয়ারির শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথমে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ঢাকায় এসেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আইয়ুব ও তাঁর অবৈধ সামরিক সরকার সম্পর্কে মনোভাব জানতে ও বুঝতে। মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব দিকের অংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস ফ্যাকাল্টি; তারই দোতলার একটি ঘরে তিনি বক্তৃতা করবেন, কিন্তু তাঁকে বক্তৃতা করতে দেওয়া তো দূরের কথা, তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও বাক্যবাণে জর্জরিত করে, অশ্লীল গালি প্রয়োগ করে বক্তৃতার স্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়; শোনা যায় শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতও হয়েছিলেন তিনি। সিনিয়র শিক্ষকরা তাঁকে আগলে রেখে বের করে না নিয়ে গেলে তাঁর কপালে আরো দুর্ভোগ ছিল নিশ্চয়ই।

ইতিহাসের বিচারে তখনকার ছাত্ররা তো নতুন প্রজন্মই। গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রনেতারা তখন থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ববঙ্গকে যে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিলেন, বাংলাদেশের জন্মের পর বহু প্রাক্তন ছাত্রনেতার লেখায় তার প্রমাণ মিলেছে। '৪৮ ও '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নতুন প্রজন্ম; ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে নতুন প্রজন্ম, সামরিক শাসন তো বটেই, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে মোনেম-সবুরের চক্রান্ত বুঝতে ভুল হয়নি বলে প্রগতিশীল কয়েকটি সংবাদপত্র একই তারিখে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামের নামে চাঞ্চল্যকর যে সংবাদ পরিবেশন করে তা পাকিস্তান সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আমি সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে জানি, অকুতোভয় ছাত্ররা পালাক্রমে শীতের রাতে কীভাবে অমুসলিম ছাত্র ভাইদের পাহারা দিয়ে রেখেছিলেন, পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু মা-বাবা, ভাই-বোনদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, সাহস জুগিয়েছিলেন। সে এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। পাকিস্তান সরকার মিলিটারি নামিয়েছিল দাঙ্গাকারীদের নিরাপদে দাঙ্গা চালিয়ে যেতে; অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের সন্তানরা সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিপদাপন্ন ভাই-বোনদের বুক পিঠ দিয়ে রক্ষা করতে। তাঁরা সফল হয়েছিলেন। দাঙ্গাকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়, তাদের মুখোশ খুলে যায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে, প্রয়োজনে জীবনদানের সংখ্যা সব সময়ে বেশি নতুন প্রজন্ম তথা তরুণ সমাজের। ভাবা যায় না, কোন আবেগে প্রচণ্ড উদ্বেলিত হলে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি মাহবুবুল আলম চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় গুলিতে ছাত্র-জনতা শহিদ হয়েছেন শুনেই ঘাতকদের অন্য শাস্তি নয়, সরাসরি ফাঁসির দাবি নিয়ে দীর্ঘ কবিতা লিখতে পারেন; এমন মর্মান্তিক ঘটনার কথা জেনে সারা পূর্ব বাংলার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড ক্ষোভে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'ঘাতক নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই' বলে দাবি জানান? উদাহরণ আরো আছে। বিষয়টি আমার স্বচক্ষে দেখা। ১৯৭১ সালের ১ মার্চে পাকিস্তান বনাম কমনওয়েলথ একাদশের ক্রিকেট খেলা চলছিল ঢাকা স্টেডিয়ামে; তখন দুপুর ১টা ৫ মিনিটে রেডিওতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নতুন সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে শুনে মুহূর্তেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে 'মানি না মানব না' বলে মাঠে নেমে এলো; সেই অভূত দৃশ্য দেখার জন্য কি কারো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল? এবং সে ঘটনা ঘটাল কারা? তরুণ, তরুণ প্রজন্মই। সংসদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার তাৎক্ষণিক অর্থ যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার পুনরায় ছিনিয়ে নেওয়ার সুগভীর চক্রান্ত তা নতুন প্রজন্ম বুঝতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেনি, সেটা আজ শুধু ঐতিহাসিক সত্য নয়, প্রমাণও।

নতুন প্রজন্ম ওভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল বলেই 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'। মনে হতে পারে শুধু শহরের শিক্ষিত তরুণ সমাজ সে ক্ষোভে অংশ নিয়েছিল, তা নয়;

আমরা অচিরেই দেখলাম ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত তো বটেই, পরবর্তীকালে দেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে প্রধানত নতুন প্রজন্মই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধের ইতিহাসে কল্পনাকেও হার মানায়। অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারত উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একাধিকবার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে; যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সৈন্যরা যথেষ্ট পারদর্শীই শুধু নয়, তৎকালীন আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত। তার বিপরীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হাতে ছিল লাঠি, বাঁশ ও বুকে সুগভীর দেশপ্রেম। এই সাধারণ মানুষের অধিকাংশই নতুন প্রজন্ম; যাদের বয়স ১২-১৩ থেকে ২৫-৩০ বছর।

এই দেশটা যে আমার, এই দেশের মাটি, নদী-নালা, খাল-বিল, গাছগাছালি, পশুপাখি সব, সবই যে আমার, আকাশটাও যে আমারই, সেই অধিকারের স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন যে নেতা, সেই নেতা সবচেয়ে বেশি আশাবাদী ছিলেন তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে। তিনি বঙ্গবন্ধু। তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে আস্থাশীল হয়ে চাইতেন 'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা,' নজরুলে বিশ্বাসী ছিলেন বলে নবপ্রজন্মের মাঝে দেখতে চাইতেন 'ওই নূতনের কেতন ওড়ে কাল বৈশাখির ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, নজরুলের ডাকে উদ্দীপিত হয়ে নতুন প্রজন্ম 'গণজাগরণ মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করে অন্যতম যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে যে দাবি প্রতিষ্ঠা করল, সেই দৃষ্টান্তই বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মকে ঠিকই সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

বাধা-বিপত্তি না থাকলে বিজয়ে আনন্দ কোথায়? নতুন প্রজন্মের শক্তিই তো ওখানে; তাদের দেশপ্রেমের প্রমাণ তো সেখানেই নিহিত। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বার ২০১৪)

লেখক : বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

বিজয় দিবস

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

একাত্তর সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সংকল্প ও প্রত্যয় বারবার উচ্চারিত হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণে। মুক্তিবাহিনী প্রথম থেকেই গেরিলা যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে। কারণ সরাসরি দখলদার পাকবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার মতো সংগতি ছিল না মুক্তিবাহিনীর। সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করছিলেন কর্নেল ওসমানী। তিনি নিজেও পুরোপুরি সচেতন ছিলেন তাঁর নির্দেশে পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর সীমাবদ্ধতা বিষয়ে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস মুক্তিবাহিনীর ক্রমে শক্তিশালী হওয়ার ৯ মাস। শেষ দিকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় হানাদার বাহিনীর জন্য। একদিকে পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত সেনাবাহিনী, অন্যদিকে বাংলাদেশের কিছু সামরিক, কিছু আধাসামরিক ও অধিকাংশ বেসামরিক যোদ্ধা নিয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী, যাদের প্রশিক্ষণ হয়েছে ভারতে বিশেষ ব্যবস্থায় এবং যাদের মূল শক্তি ছিল মনোবল। এদের নবলব্ধ প্রশিক্ষণ, এদের অতুলনীয় সাহস ও মনোবল ছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের অটুট প্রত্যয়ের একমাত্র অবলম্বন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল ৩ ডিসেম্বর পরবর্তী ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে ভারত ৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে। ৯ নম্বর ধারা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এর আওতায় চূড়ান্ত সমঝোতা মোতাবেক কার্যপ্রণালী তৈরি হয় ২২ থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে। ২২ অক্টোবর সোভিয়েত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিন দিল্লি আসেন। ফিরুবিনের গুরুত্বপূর্ণ সফর যাতে শত্রুপক্ষের নজরে না আসে তার সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ছিল। পাকিস্তান কিছুই জানতে পারেনি। পাকিস্তান যদি আক্রমণ করে তাহলে তিন দিনের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীকে ঢাকা বিজয় সম্পন্ন করতে হবে।

মূলত ২২, ২৩ ও ২৪ অক্টোবর সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একই সময়ে ১৯ দিন বিদেশ সফর ছিল বাংলাদেশের আসন্ন স্বাধীনতার পক্ষে বৈদেশিক সহায়তা ও সমর্থন লাভের চূড়ান্ত প্রয়াস। এই সফরে তাৎক্ষণিক ফল মেলেনি। তবে উল্লেখযোগ্য নৈতিক সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে এবং তখন থেকেই চলমান সংঘর্ষ ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও স্ব স্ব সীমান্তের ভেতরে সৈন্য প্রত্যাহারের যে প্রস্তাব করে

তার বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। একইভাবে পরদিন, ৫ ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে আটটি দেশের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হয় তার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। সামগ্রিক যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারত-বাংলাদেশ মিত্র বাহিনীর অনুকূলে চলে যায়। একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কমান্ডে ন্যস্ত হয়। আরোরা জেনারেল মানেক শ'র মাধ্যমে উভয় সরকার প্রধানকে রিপোর্ট করবেন। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে একটির পর একটি নগর শত্রুমুক্ত হয়। হানাদার বাহিনী প্রধান জেনারেল নিয়াজি বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবাহিনীর আগমনের প্রত্যাশায় এবং ভারতের আসাম সীমান্ত থেকে চীনা সেনার হস্তক্ষেপ হবে, এই আশায় আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকেন। মার্কিন বা চীনা কোনো পক্ষের কোনো সাহায্যই এসে পৌঁছয় না। ১৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনী গভর্নর হাউসের ওপর গুলি চালায়।

গুলি চালানোর সময় গভর্নর ড. মালিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবেন কি না। তাঁকে বলা হয়েছিল, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিতে। তিনি তাই করলেন। ওদিকে কলকাতায় অবস্থানরত জেনারেল জ্যাকবকে দিল্লি থেকে জেনারেল মানেক শ' নির্দেশ দিলেন, অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা ৩০-এর মধ্যে আত্মসমর্পণ করো, নতুবা আমরা ঢাকা দখল করব– মানেক শ'র এই চরমপত্র না মেনে উপায় ছিল না জেনারেল নিয়াজির।

ওই দিন, ১৬ ডিসেম্বর, বিকেল ৫টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভারত-বাংলাদেশের মিত্রবাহিনীর কাছে পাক হানাদার বাহিনীর সেনানায়ক জেনারেল নিয়াজি তাঁর কাঁধের এপালেট খুলে ও হাতের রিভলভার জেনারেল আরোরার হাতে তুলে দিয়ে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উইং কমান্ডার এ আর খোন্দকার। উপস্থিত থাকতে পারেননি বা হননি কর্নেল ওসমানী। প্রকাশ্য ময়দানে, খোলা আকাশের নিচে এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল উৎফুল জনতা।

এই আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই সূচিত হলো মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানের ৯০ হাজারের অধিক সৈন্য এরপর মিত্রবাহিনীর হাতে যুদ্ধবন্দি। এদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া এখন পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। ইতোমধ্যে সামরিক আদালতে দেশদ্রোহিতার দায়ে শেখ মুজিবের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ভুট্টো জানতেন, এ আদেশ কার্যকর করা হলে তাঁর সেনাবাহিনীকে মুক্ত করা যাবে না। আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও এতদিন যা করেননি, এখন বাস্তব পরিস্থিতির চাপে তাই করতে বাধ্য হলেন। শেখ মুজিব, ও সেই সাথে আরো এক বন্দি, ড. কামাল হোসেনকে সস্ত্রীক মুক্ত করে দিয়ে, বাংলাদেশের পথে এক লন্ডনগামী প্লেনে তুলে দিলেন ভুট্টো।

বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বপালনকারী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও অন্য শীর্ষ নেতারা কেউ ঢাকায় ছিলেন না। বিজয় দিবসের ৬ দিন পর, ২২ ডিসেম্বর তাঁরা সবাই ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ইতিপূর্বে সচিবালয়সহ সকল দপ্তর খোলা হয়েছিল। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর গভর্নর হাউসের নামকরণ হলো বঙ্গভবন। রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত : যুদ্ধ ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধজয় সম্ভব হয়নি, তবে অতিদ্রুত ঢাকায় পৌঁছানোর জন্য মিত্রবাহিনীতে বিশেষ কৌশলে পাকবাহিনীর সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে দ্রুততম সময়ে ঢাকায় পৌঁছাতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধ তথা বিজয় দিবসের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি কী ছিল? যুদ্ধকালীন ও বিজয়-পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণেই এ বিষয়ে যা পাওয়া যায়। একটা কথা বারবার তিনি বলেছেন, যা ঘটেছে এরপর কোনো ব্যবস্থাতেই পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা শর্তহীন স্বাধীনতা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে নড়চড় হয়নি কদাপি। সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের আরাধ্য, সমাজতন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী, সর্বোপরি আমাদের আস্থা ধর্মনিরপেক্ষতায়। এসব মৌলিক প্রশ্নে আপসের সুযোগ নেই এবং এসব প্রশ্নে এমনই এক ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল যুদ্ধজয়ের পূর্বেই যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বছর না ঘুরতেই, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায়, ও ড. কামাল হোসেনের অক্লান্ত পরিশ্রমে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধান রচিত হলো, ও সংসদে গৃহীত হলো। ৯ মাসে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধজয়ের মতোই এও এক অসাধারণ কৃতিত্ব।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর পর দীর্ঘ ১৫ বছর দেশে কোনো গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। দুই জেনারেল, সামরিক ও আধাসামরিক শাসক দেশকে সংবিধানসম্মত পথে পরিচালনা করেননি, বরং সংবিধানের গুরুতর অঙ্গহানি করেছেন। '৯০ থেকে এই কালো অধ্যায়ের অবসান হয়েছে, তবে '৭২-এর সংবিধানে পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসা যায়নি। যত দিন সেটা সম্ভব না হচ্ছে, তত দিন বিজয় দিবস ওই প্রশ্নটি ফিরিয়ে আনবে, তত দিন বিজয় দিবস তার পূর্ণ গৌরবে ফিরে আসবে না বাংলাদেশে। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১২)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের স্বাধীনতা যেভাবে এলো

শামসুজ্জামান খান

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে ঐতিহাসিক-অবিস্মরণীয় ১৯৭১ সালে। ইতিহাসে লেখা আছে বাঙালির স্বাধীনতা কামনার, স্বপ্নকুঁড়ির মতো বা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার ও ইচ্ছার মতো বীজাকারের, অঙ্কুর উদগমের অবয়বের মতো কিছু দিকচিহ্নের কথা। লেখা আছে সেই স্বাধীনতা-স্বপ্নের আগুনে প্রবেশ করে ওই স্পর্ধার জন্য পুড়ে মরার কথা। লেখা আছে অগণন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর আত্মত্যাগের কথা। স্বাধীনতা বড়ো কঠিন সাধনায় অর্জনের এক মণিরত্ন। দু-এক দিনের বা দু-এক প্রজন্মে এই মহারত্ন অর্জনের বহু বছর আর বহু পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের জন্য বহু মানুষকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে ধাপে ধাপে এক পর্যায়ে বিজয় এবং পরের পর্যায়ে পিছু হটা–এমনি করেই শেষ পর্যন্ত আসে সেই কাঙ্ক্ষিত, বহু সাধনার ধন মহামূল্য স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ইতিহাসের সেই চেনা পথেই এসেছে। হঠাৎ করে এক দিনে কোনো মেজর সাহেবের ডাকে আসেনি। তা আসা সম্ভব না বলেই আসেনি–যেভাবে আসার নিয়ম সেভাবেই এসেছে। সেই ইতিহাসই আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস–অন্য ইতিহাস কেউ বলতে চাইলে তা ভুয়া, বিকৃত, স্বকপোলকল্পিত। বাংলাদেশের ভণ্ড, নতজানু ও স্বার্থসিদ্ধিপ্রবণ ঐতিহাসিক, তথাকথিত অনুগ্রহপ্রত্যাশী বুদ্ধিজীবী ও আমলা আর ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই স্বকপোলকল্পিত বা মনগড়া ইতিহাস তৈরির নানা কুমতলবকে নানা পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা এবং পূর্বের লেখা ইতিহাস সংশোধনের সিঁধেল চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস কবে থেকে শুরু, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। চর্যাপদের কবি ভুসুক যেদিন দুঃখ-বেদনা ও বঞ্চনার আত্মপ্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে বললেন, 'আজি ভুসুক বাঙালি ভইলি' (আজ ভুসুক বাঙালি হলো)– বৌদ্ধ বাঙালি সিদ্ধাচার্যের সেই উচ্চারণ বাংলার জাগরণ আর বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণে, অর্থাৎ দূরদৃষ্টিতে স্বাধীনতার পথরেখা (এখানকার পরিভাষায় রোডম্যাপ) তৈরিতে কোনোই অবদান রাখেনি এমন তো নয়! বাঙালি যখন তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নির্মাণে *চর্যাপদ*কে সামনে রাখে তখন কবি ভুসুকের ওই বাণী বাঙালিত্বের জন্মচিৎকারের মতো অনন্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। মহামতি বুদ্ধের অনুসারী বাঙালি কবিই তখন বাঙালিত্বের তথা বাঙালি জাতির বিজয়ের নকিব হয়ে উঠেছেন।

এর কয়েক শ বছর পরে ইংরেজ শাসনামলে শেরপুর-জামালপুরে পাই বাঙালি মুসলমান কৃষক টিপু পাগলা, উত্তরবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ফকির এবং সন্ন্যাসী

বিদ্রোহীদের, পশ্চিম বাংলার নারকেলবেড়িয়ার তিতুমীরকে (মীর নিসার আলী)। আর ১৯২০-৩০-এর দশকে স্বদেশি আন্দোলনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে দেখি ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে জীবনদান করে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে এবং পরে স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াইয়ে কৃষক বিদ্রোহের অনন্য বীরগাথাও আমরা বাংলার ইতিহাসে খুঁজে পাই।

কিন্তু এর বাইরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিপ্লবী রাজনীতি এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবদানও আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণে অসামান্য। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিণ চন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র বসু, এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মানিক মিয়া প্রমুখের অবদান বিরাট। আর নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসু, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখের নাম স্মরণীয়। আর তাঁদের সংগ্রামী জীবন ও রাজনীতির সারাৎসার ও লোকজ-সংস্কৃতির সাধকের অবদানও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, মীর মশাররফ হোসেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জীবননান্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লালন ফকির, হাছন রাজা, অবন-জয়নুল-কামরুল-সত্যজিৎ রায়সহ অসংখ্য কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-আলোকচিত্রীর বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আর এই সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর নির্মিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র। সে জন্য এ রাষ্ট্রের স্রষ্টা শেখ মুজিব বলতে পারেন : 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা।'

আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয়েছে মূলত বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর। তাই আমরা শুধু রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের এই রাষ্ট্রসৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না, একই সঙ্গে ভুসুক থেকে সপ্তদশ শতকের আবুল হাকিম এবং উনিশ-বিশ শতকের মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল, দুদুশাহ, জালাল খাঁ, মাইজভাণ্ডারি তরিকার সৈয়দ আহমদউল্লা এবং সুকান্ত থেকে শামসুর রাহমানকে বাঙালির রাষ্ট্রসৃষ্টির অন্যতম রূপকার বলে মনে করতে পারি। তাঁদের সকলের চিন্তার সমন্বয় সাধন করেই শেখ মুজিব বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক, মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য নির্ধারণ করেন।

সামান্য কোনো পেশাজীবীর পক্ষে ইতিহাসের এত বড়ো ক্যানভাসকে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে ধারণ করে রাষ্ট্র গঠন করা একেবারেই অসম্ভব। এখানেই শেখ মুজিবের অনন্যতা–তিনি ভিন্নধর্মী বা স্বকীয় রাষ্ট্র স্থপতি বাঙালির শতসহস্র বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং দুঃখ-বঞ্চনাকে ধারণ করেই সৃষ্টি করেন এই অনন্য জাতিরাষ্ট্র-বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং ২৬ মার্চ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করেন।

১৯৭১-এর মার্চের প্রথম দিনেই সংসদ অধিবেশন বন্ধ ঘোষণার পাকি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে গোটা বাংলাদেশে। পূর্ব বাংলার মানুষের মন থেকে মুছে যায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তব-অস্তিত্ব এবং বাংলার মানুষকে এই মানসিক স্তরে আনেন মূলত বাংলার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি একদিনের কোনো ঘোষণা বা ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনেই বিপুল মানুষকে এই গুরুতর সিদ্ধান্তের স্তরে আনতে পারেননি। বাংলার মানুষকে এই স্তরে আনতে তাঁর সময় লেগেছে প্রায় সিকি শতাব্দী।

১৯৪৭-১৯৪৮-এ তিনি শামসুল হকের নেতৃত্বে, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে, আতাউর রহমান খানের সহায়তায় মুসলিম লীগবিরোধী এবং আধুনিক জনগণের স্বার্থভিত্তিক আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। তা ধীরে ধীরে– শত নির্যাতন-অত্যাচার-জোর-জুলুম সহ্য করে বাংলার মানুষের মনে সুদৃঢ় প্রভাব ফেলতে থাকে।

এই ধারার প্রথম বিজয় সূচিত হয় ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভূমিধস পরাজয়ে। এ পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, এ কে ফজলুল হকের অবদান মুখ্য হলেও জনপ্রিয় তরুণ নেতা শেখ মুজিবের অবদান কিছুমাত্র কম নয়। শেখ মুজিবুর পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ও বাঙালির স্বপক্ষে জাতিতাত্ত্বিক অবস্থানপ্রসূত যে ভূমিকা পালন করেন, তা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালির রাষ্ট্রনির্মাণের উপাদান প্রস্তুত করে। তিনি পাক গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ক. Zulum mat karo bhai (জুলুম করো না ভাই), যদি করো তাহলে নিয়মতান্ত্রিক পথ ছেড়ে আমরা অসাংবিধানিক পন্থায় চলে যেতে বাধ্য হবো; খ. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own ('বাংলা' শব্দটির এক নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে)। তাই 'বাংলা' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' রাখতে চাইলে আমাদের পূর্ব বাংলায় গিয়ে জনগণের মত নিতে হবে, তারা রাজি হলে তবেই এটা সম্ভব; গ. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং যুক্ত নির্বাচনের কী হলো? (Speeches of Sheikh Mujibur Rahman in Pakistan Parliament, P. 12) এ দুটি বিষয়ই বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম মূল উপাদান; ঘ. করাচিকে এক ইউনিটভুক্ত করে পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করলে (করাচি বাংলার পাটের টাকায় গড়ে উঠেছে বলে) পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করতে হবে; ঙ. বাংলার মানুষ না খেয়ে আছে এবং তারা মারা যাচ্ছে (কিছু আগে খুলনায় দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে) পাকিস্তান দাবিকে বিপুলভাবে সমর্থন করার এই ফল? পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করেনি। তারা আমাদের দুঃখ বুঝবে না; চ. আমরা 'পাকিস্তানি' না 'বাঙালি' নামে পরিচিত হতে চাই; ছ. I will here and now speak in Bangla and nobody can prevent me from doing that (আমি এখানে এই মুহূর্তে বাংলায় বক্তৃতা করব। আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবেন না)।

১৯৬২ সালে বাংলার স্বাধীনতা প্রস্তুতির জন্য তিনি গঠন করেন ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে এক নিউক্লিয়াস। এর সদস্য করা হয় সিরাজুল আলম খান, ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদকে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনে স্বাধীনতার নানা সুস্পষ্ট কর্মসূচি তৈরি করেন যেমন– ক. 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা যমুনা'; 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'; 'পিন্ডি না ঢাকা?–ঢাকা, ঢাকা' স্লোগান এবং বাঙালির স্বাধীনতার বীজমন্ত্র 'জয় বাংলা'। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মোক্ষম অস্ত্র হয়ে ওঠে। এই মারণাস্ত্রপ্রতিম ৬ দফা বঙ্গবন্ধু পেশ করেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তির মূল কেন্দ্র লাহোরে।

সাহসী, লড়াকু মুজিব তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। শেখ মুজিব ৬ দফা নামে ১ দফায় আসছেন, এটা বুঝতে পেরেই আইয়ুব খান এর বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করার হুমকি দেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি দখলদাররা অস্ত্রের ভাষাই প্রয়োগ করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে। এই ভয়াবহ অস্ত্রের ভাষা সত্ত্বেও ১৯৭১-এর বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা শুধু নয়, দেশকে মার্চেই যেন স্বাধীন করে ফেলেন। ১৯৭১-এর জুলাই মাসের South Asian Review-এ লেখা প্রসঙ্গে বলেন, 'When the police and servants joined the judges in pleding support for Mujib a defacto transfer of power had taken place inside Bangladesh and it had happend within a week of Yahiya's decision. During next three weeks Mujibs house became in effect the Secretariat of Bangladesh' (বিচারকদের অনুসরণ করে পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসনের কর্মচারীরা যখন মুজিবের প্রতি সমর্থন জানায় তখনই বাংলাদেশের ভেতরে ক্ষমতার কার্যত হস্তান্তর হয়ে যায় এবং ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তের এক সপ্তাহের মধ্যেই তা ঘটে। পরের তিন সপ্তাহে মুজিবের বাড়ি কার্যত বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েটে পরিণত হয়)।

এভাবে উত্তাল মার্চের পথ বেয়ে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়। বিশ্বের বুকে আবির্ভাব ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

বিজয়ের ৪৩ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ও সম্ভাবনা

ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন

সমসাময়িক বিশ্বের অর্থনৈতিক মহামন্দা ২০০৬-০৯ কাটিয়ে যে স্বল্পসংখ্যক দেশের অর্থনীতি উৎসাহব্যঞ্জক অর্জন করেছে বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগের উর্ধ্বে সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে দেশটি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে যে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্য অর্জিত হয় সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সফলতা তাৎপর্যপূর্ণ। ৭ই মার্চের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' স্বাধীনতা ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বাঙালির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতির অঙ্গীকার করেছিলেন। জাতির পিতা সরকার প্রধান হিসেবে তা বাস্তবায়ন এবং কল্যাণরাষ্ট্র সৃষ্টি তথা দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর পরিকল্পিত অর্থনীতির স্পষ্টতম দলিলও রচনা করেছিলেন। অবকাঠামো পুনর্বাসন, নির্মাণ ও সংস্কার, দারিদ্র্য নিরসন, কৃষি খাতে উৎপাদন ভর্তুকি ও উৎপণ্যে মূল্য সমর্থন, জনসংখ্যার পরিকল্পিত বৃদ্ধি, শিক্ষা খাতের বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন এবং আর্থিক নীতি ব্যবহার করে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে। গ্রহণ করা হয়েছিল 'সবার সাথে সখ্য, কারো সাথে বৈরিতা নয়' পররাষ্ট্রনীতি। বাংলাদেশের আজকের অর্থনৈতিক সাফল্য ও এর সামাজিক রূপান্তর ১৯৭২-৭৫ সালের ভিত্তির সোপান বয়েই এসেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দুটি সারণিতে তুলে ধরা হলো :

সারণি ১ : আর্থিক অগ্রগতির চিত্র

	বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধি %		মাথাপিছু আয় (পিপিপি ভিত্তিতে – ডলার)		রপ্তানি – সামষ্টিক আয়ের %		প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ – সামষ্টিক আয়ের %
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	১৯৯০	২০১১	২০০৭	২০১২	২০১২
বিশ্ব	৩.৩	৩.৮	-	-	-	-	-
উন্নত দেশসমূহ	১.৮	২.৩	-	-	-	-	-
অগ্রগামী দেশসমূহ	৫.১	৫.৪	-	-	-	-	-
বাংলাদেশ	৬.২	৬.৫	৭৪১	১৬৭৮	২০	২৩	১.১

	বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধি %		মাথাপিছু আয় (পিপিপি ভিত্তিতে – ডলার)		রপ্তানি – সামষ্টিক আয়ের %		প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ – সামষ্টিক আয়ের %
গণচীন	৭.৫	৭.৪			৪২	২৭	৩.৬
ভারত	৫.৫	৬.৩	১১৯৩	৩২০৩	২১	২৪	১.৩
ইন্দোনেশিয়া	৫.৪	৫.৮	-	-	২৯	২৪	২.২
মালয়েশিয়া	৫.০	৫.৩	-	-	১১০	৮৭	৩.২
নেপাল	৪.৫	-	৭১৬	১১০৬	১৩	১০	০.৫
পাকিস্তান	৪.১	৪.৩	১৬২৪	২৪২৪	১৪	১২	০.৪
শ্রীলঙ্কা	৭.৬	৭.৫	২০১৭	৪৯২৯	২৯	২৩	১.৬
থাইল্যান্ড	২.২	৪.৫	-	-	৭৩	৭৫	২.৯
ভিয়েতনাম	৫.৭	৫.৭	-	-	৭৭	৮০	৫.৪

সারণি ২ : সামাজিক অগ্রগতির চিত্র

	গড় আয়ু (বছর)		শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবন্ত শিশুর জন্মে)		মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষ জীবন্ত শিশুর জন্মে)		নারীর সামগ্রিক গড় প্রজনন ক্ষমতা		উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন (শতকরা কতজন)	
	১৯৯০	২০১১	১৯৯০	২০১১	১৯৯০	২০১০	১৯৯০	২০১১	১৯৯০	২০১১
বাংলাদেশ	৫৯	৬৯	৯৭	৩৭	৬০০	১৯৪	৪.৫	২.২	৩৯	৫৬
ভারত	৫৮	৬৫	৮১	৪৭	৬০০	২০০	৩.৯	২.৬	১৮	৩৪
নেপাল	৫৪	৬৯	৯৪	৩৯	৭৭০	১৭০	৫.২	২.৭	১০	৩১
পাকিস্তান	৬১	৬৫	৯৫	৫৯	৪৯০	২৬০	৬.০	৩.৪	২৭	৪৮
শ্রীলঙ্কা	৭০	৭৫	২৪	১১	৮৫	৩৫	২.৫	২.৩	৭০	৯২

সূত্র : ইউএনএসকাপ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশন ও বিএমএমএস ২০১০।

সারণি দুটি থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় যে বিশ্ব অর্থনীতি, উন্নত দেশসমূহ এবং অগ্রগামী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। গণচীন ও শ্রীলঙ্কা ছাড়া সকল উল্লেখযোগ্য এশিয়ান দেশের বিপরীতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে রয়েছে। ক্রয়ক্ষমতার বিচারে (পিপিপি পরিমাপে) বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০১১ সালে ছিল ১৬৭৮ ডলার। খুব সম্ভব ২০১৯ সালে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করবে।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও অন্য অনেকের মতে, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন অত্যন্ত ইতিবাচক, এর মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।' ১৯৭২ সালের ৪৩ বছরের তুলনায় এখন দেশের মানুষের গড় আয়ু ৬৯ বছর, যা শ্রীলঙ্কার (৭৫) পরেই এ অঞ্চলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৩.৪% থেকে এখন ১.৩%। শিশুমৃত্যুর হার এখন হাজারে ৩৪ (১৯৭২ সালে ছিল ১৭৯)। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখ জীবন্ত শিশুর জন্মে ১৯৪ (*বিএমএমএস ২০১০*)। বাংলাদেশে মোট প্রজনন হার এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন ২.২। বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে শতকরা ৬৪ জন। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ম্ভর। বস্ত্রে কোনো টানাটানি নেই। বাসস্থানে সমস্যা রয়েছে, তবে সংকট নেই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারিত হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচটি মৌলিক চাহিদা বিষয়ে বাংলাদেশে সজ্ঞান মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে এখন দারিদ্র্য নেমে এসেছে শতকরা ২৬ ভাগে এবং প্রবণতা নিম্নমুখী। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে এখন শতকরা ৪০ ভাগ হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা বলয় এখন সামাজিক সংরক্ষণ ব্যবস্থায় অগ্রসর হবে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ঘনত্ব দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্প্রতি বিশ্বে ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। গোল্ডম্যান স্যাকসের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি আশু সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ১১টিতে রয়েছে; জে পি মর্গ্যান এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, প্রথম সারির পাঁচটির মধ্যেই (ফ্রন্টলাইন ফাইভে) রয়েছে দেশটি। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় পোলস্টার পিউ গবেষণা সংস্থার জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশের শতকরা ৭১ ভাগ লোক তাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় সন্তুষ্ট রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো উন্নত জীবন পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে শতকরা ৮১ ভাগ মানুষ। এদিকে নিউ ইয়র্কের বৈশ্বিক লেনদেন ভিত্তিক একটি গবেষণা সংস্থার মতে, এশিয়া প্যাসিফিক, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার ২৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ভোক্তা সূচকে আস্থা বেড়ে শতকরা ৬৬.৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। আংটাড (UNCTAD) ২০১৩ প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গন্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের ক্রমবর্ধমান প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ২০০৯ সালে ৭০.১, ২০১০ সালে ৯১.৪, ২০১১ সালে ১১৪, ২০১২ সালে ১২১ ও ২০১৩ সালে ১৬০ কোটি মার্কিন ডলার। আকর্ষণীয় নীতি কৌশলে এর ব্যাপক প্রবৃদ্ধি সম্ভব। এদিকে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার বাজারজাতকারী বড়ো বড়ো সংস্থা বাংলাদেশের দিকে আরো বেশি ঝুঁকছে। রানা প্লাজার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কলকারখানার মান উন্নয়ন ও পরিবেশ বিশ্বমানে নেওয়া হচ্ছে।

নিরাশাবাদী সমালোচকগণের সংশয়কে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বেড়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩০৩০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৩০০ কোটি ডলার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহের

পুনরুত্থান ঘটেছে বার্ষিক ১৪০০ কোটি ডলারে, যা পৃথিবীর সপ্তম সর্বোচ্চ। আইএমএফের মতে, বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা চমৎকার।

জঙ্গিবাদ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের সর্বাত্মক লড়াই ও এর সাফল্য বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্পষ্ট করেছে যে তারা মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের বিপক্ষে নয়, তবে তারা নীতিগতভাবে ফাঁসির দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে।

সম্প্রতি (অক্টোবর ২০১৪) জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) চেয়ারম্যান এবং সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলো এ দেশ, জনসাধারণ ও নির্বাচিত সরকারের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশ একটি অনন্ত সম্ভাবনার দেশ, যেখানে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ মানুষ ও মাটি। ১৬ কোটির মধ্যে পাঁচ কোটি মানুষের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তারা বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত হলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের যে সুবর্ণ সুযোগ বাংলাদেশকে হাতছানি দিচ্ছে তার পূর্ণ ফসল ঘরে উঠানো যাবে। এ জন্য বেসরকারি ও সরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগে শত শত বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিভিন্ন ট্রেড বা দক্ষতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার মাটি শস্যের স্বর্ণখনি। কিষাণ-কিষাণির অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ম্ভর। ১৯৭২ সালের এক কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের বিপরীতে ২০১৪ সালের অর্জন ৩.৪ কোটি টন। সবজি উৎপাদন এ সময়ে পাঁচ গুণ হয়েছে এবং প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী। আলুর বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন ৮০ লক্ষ টন, যা ১৯৭২ সালে ছিল মাত্র সাত লক্ষ টন। রাশিয়া ও ভারতে আলু রপ্তানির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। আয়তনে অনেক ছোটো হলেও বাংলাদেশের মৎস্যজীবীগণ চীন, ভারত, মিয়ানমারের সাথে পাল্লা দিয়ে চতুর্থ বৃহৎ মিঠাপানির মাছ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছে। কৃষি, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগি পালন, হালকা প্রকৌশল, আসবাবপত্র তৈরি, উদ্যানতত্ত্ব ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উপযুক্ত নীতি-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমঘন কর্মসংস্থানসহ উচ্চমূল্য সংযোজনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

দেশের খনিজসম্পদকেও খাটো করে দেখার উপায় নেই। বিটুমিনাস ও পিট কয়লা এবং গ্যাসের মজুদ রয়েছে দেশে। রয়েছে কিছু তেল। হয়তো-বা সোনাদানাও। বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষার মাধ্যমে গ্যাসের সঠিক মজুদ নির্ধারণ করতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রান্নাবান্নায় গ্যাসের অদক্ষ ব্যবহার পরিহার করতে হবে। কন্টেইনারে গ্যাস দেওয়াসহ শিল্পায়নে গ্যাসের ব্যবহারই সর্বোত্তম। শতকরা ৮০ ভাগ

উৎপাদনশীলতায় ওপেট পিট কয়লা উঠিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন জরুরি। এ দেশে রয়েছে পর্যটনের জন্য দীর্ঘতম ও চিত্তাকর্ষক সমুদ্রসৈকত। আরো আছে টাঙ্গুয়ার হাওরের জীব ও প্রাণিবৈচিত্র্যের সমারোহ। সুন্দরবনের কথা তো সবারই জানা।

বাংলাদেশের জন্য এখন '৭২-এর আদলে একটি সারবত্তাপ্রবণ শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি করে দীর্ঘমেয়াদি (২০ বছর) ও মধ্যমেয়াদি পর পর চারটি যোজনা তৈরি করা প্রয়োজন। এতে আগামী ২০ বছরে দারিদ্র্যমুক্ত উচ্চ মানবসম্পদ (High Human Development Index) সূচকে উঠে আসা সম্ভব হবে। প্রধানত কর্মসংস্থানমুখী সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক সুরক্ষা বলয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকবে। পরিকল্পনা কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোসহ অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প প্রণয়ন করবে : (ক) গণখাতে (public sector) মূলত বস্তুগত (physical) ও সামাজিক (social) অবকাঠামো যথা বন্দরসমূহের বিপুল প্রসার ও আধুনিকায়ন এবং প্রধান নগর-শহর-বন্দরের সঙ্গে অন্তত চার লেনের সড়ক ও ব্রডগেজ রেললাইন সংযোগ, (খ) ক্ষমতায়িত বাপেক্সের মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সঞ্চালন, (গ) সুনীল অর্থনীতির বিকাশ, উন্নয়ন ও ফলপ্রসূ আহরণ, (ঘ) সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠা ভূমিকে মূল ভূখণ্ডে সংযুক্ত করা, (ঙ) আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি করা এবং (চ) তুলনামূলক সুবিধা ও প্রতিযোগ ক্ষমতা অনুসারে দেশের সম্পদকে সমহারে শিল্পায়ন তথা কর্মসংস্থানে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনে নীতি-কৌশল প্রণয়ন। এ প্রতিষ্ঠানেই নিশ্চিত হবে গুণগত মানে গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যান এবং কার্যকর মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা। খুবই প্রয়োজন প্রতিবন্ধিত্ব ও অটিজমে সাময়িকভাবে অসুবিধাগ্রস্তদের জন্য মানবিক ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। প্রবীণগণের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন জরুরি। সর্বোপরি, রাজনৈতিক আদর্শগত মতান্তর সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো কল্যাণরাষ্ট্রের অগ্রযাত্রার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মোটা দাগের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে জাতীয় ঐকমত্যে এসে গেলে নীতি ক্ষেত্রে স্বস্তির ধারাবাহিকতা আসতে পারে।

গণখাতে অবকাঠামোর বিপুল সম্প্রসারণ, আইনের শাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং উপযুক্ত নীতি-কৌশল গ্রহণ করে দেশের শ্রমজীবী, কিষাণ-কিষাণি, মৎস্যজীবী এবং অন্যদের উজ্জীবিত করতে হবে। পরীক্ষিত দক্ষ ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাগণকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে উৎপাদন উৎকর্ষের শিখরে নিয়ে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার বিপুল অগ্রগতি সাধনে উৎসাহিত করতে হবে। বিনিয়োগকে করতে হবে সহজ ও ঝামেলামুক্ত। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটকে (বিএসটিআই) একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা প্রয়োজন, যাতে এর প্রত্যায়িত পণ্য ও মানবসেবার মান বিনা প্রশ্নে সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য হয়। রাজস্ব প্রশাসনের তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা স্বয়ংক্রিয়করণ

ও আধুনিকায়ন এবং রপ্তানি সম্প্রসারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন জরুরি। ঠেকাতে হবে সম্পদ পাচার। শতকরা ০৫ ভাগ সবচেয়ে বিত্তবান লোক, অর্থাৎ ২০ লক্ষ পরিবার আজ জাতীয় আয়-সম্পদের শতকরা ৩০ ভাগ বা কমবেশি পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার মালিক, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের দ্বিগুণ। তাদের সবাই যাতে নির্বিঘ্নে করবান্ধব পরিবেশে নিশ্চিতভাবে কর পরিশোধ করেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। নগর এলাকার বাড়ি-গাড়ি ও দৃশ্যমান সম্পদকে কার্যকরভাবে করের আওতায় আনা সম্ভব। আগামী ১০ বছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতকে বর্তমানের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২৫%-এ উন্নীত করতে হবে। কার্যকর আইনানুগ ন্যায়নিষ্ঠ শাসন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা হলে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত নিম্নমুখী হবে; বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত হয়ে এতে বছরে দুই অঙ্কের (>১০%) সামষ্টিক আয়-প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।

সব অবকাঠামোর মাতৃসম স্তম্ভস্বরূপ একটি সৎ, স্বচ্ছ, উন্নত ও আস্থা সৃষ্টিকারী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। ফিটনেসবিহীন গাড়ি এবং গাড়িচালকদের দোষে সড়ক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। অধিক পুরাতন গাড়ির ওপর বর্ধিত হারে করারোপ করা সমীচীন। এতে রাজস্ব আদায় বাড়বে এবং নতুন বাস রাস্তায় আসবে। ভূমিখেকো, জলাধার দখলকারী ও ব্যাংক ঋণখেলাপি সামাজিক সন্ত্রাসীদের বিষয়ে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হতে বাধ্য। জমি ও ফ্ল্যাট নিবন্ধনে সময়োপযোগী দৃষ্টি দিলে আইন ভাঙার প্রবণতা কমবে ও রাজস্ব বাড়বে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনতে বড়ো বড়ো প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতায়ন জরুরি। মালয়েশিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং ইন্দোনেশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সরকার প্রধানের অফিসে তাঁর আস্থাভাজন, স্বাধীনচেতা, দক্ষ, সৎ, স্বচ্ছ ও চৌকশ নেতৃত্বে পরিচালিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সংস্থা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের আদলে কাউন্সিল অভ ইকোনমিক অ্যাডভাইজারস সৃষ্টি করে মেগাপ্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন গতিশীল ও প্রত্যাশিতভাবে সফল করে তোলা যায়। প্রধান কয়েকটি মেগাপ্রকল্পের দায়িত্ব এরূপ সংস্থাকে দেওয়া যায়। যেমন– সড়ক ও ব্রডগেজ রেল প্রকল্প (দেশে এবং অঞ্চলে); কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা; গ্যাস; কোরিয়ান ইপিজেডের সমঝোতামূলক নিষ্পত্তি, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (যৌথ উদ্যোগ ও বাই ব্যাক গ্যারান্টি) ১০ বিলিয়নে উঠানো; রপ্তানিবান্ধব উন্নয়ন নীতির অধীনে রপ্তানি-জিডিপি অনুপাত শতকরা ৩৫ ভাগে উন্নীত করে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যারে ৪০ বিলিয়নসহ মোট ৬৫ বিলিয়নের রপ্তানির নিশ্চয়তা বিধান করা। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনসহ চামড়াশিল্পকে সাভার শিল্পনগরীতে স্থানান্তর, দেশীয় তেল শোধনাগারের ক্ষমতা ৬০ লক্ষ টনে উন্নীত করা, গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প, দক্ষিণ বাংলার লবণাক্ততা দূরীকরণ, কুড়িগ্রাম-চিলমারী-রৌমারী থেকে সীমান্ত ঘেঁষে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত

বিপুল পরিসরে সোনার বাংলা বহুমুখী ড্যাম নির্মাণ, সিলেট বা ময়মনসিংহের উচ্চ ভূমিতে বৃহত্তর বিমানবন্দর নির্মাণ, বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক করিডর, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যকর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্য প্রসারে আর্থসামাজিক অগ্রগতির ধারা অনেকটাই ফিরে এসেছে। বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। তবে অর্থনীতির সম্প্রসারণ সহায়ক মুদ্রানীতি এবং রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আহরণে সক্ষম বিনিময় নীতি অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি আজ সারা বিশ্বে নন্দিত। পৃথিবীর পাঁচটি বৃহত্তম অর্থনীতির তিনটি চীন, জাপান ও ভারত আজ বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করতে চায়। সব মিলিয়ে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের যে চমৎকার কৌশলী সফল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচার একে আর ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। প্রয়োজন ইস্পাত কঠিন সংকল্পে দৃঢ় ও উদ্ভাবনী নেতৃত্ব। এখন আশাবাদী হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সফলতার পথরেখায় অম্লান হয়ে আছে পরিকল্পিত জনসংখ্যা, কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিপ্লব ও এর বহুবিধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বুয়েট ও আইবিএ প্রতিষ্ঠা, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প (জিঞ্জিরা থেকে শুরু), পাবনা-দিনাজপুর মহাসড়ক, ঢাকায় বেড়িবাঁধ, মূল্য সংযোজন কর পদ্ধতি, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, সেনাবাহিনী পরিচালিত মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি ও সমরাস্ত্র নির্মাণ কারখানা, সৌরবিদ্যুতে ইডকল, গ্যাসক্ষেত্রে বাপেক্স, নৌবাহিনীর হাতে খুলনা শিপইয়ার্ড, দুঃসহ লোডশেডিংয়ের অবসান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নারী ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, নারীর প্রজনন হার (TFR) হ্রাস, দারিদ্র্য নিরসন ও মঙ্গা থেকে মুক্তি, তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, ঔষধ ও চামড়া শিল্প, সিরামিকস ও প্লাস্টিক শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, প্রাইমারি শিক্ষায় অগ্রগতি, বিনা মূল্যে বছরের প্রথম শিক্ষা দিবসে ছাত্রছাত্রীর হাতে প্রায় ৪০ কোটি করে নতুন বই তুলে দেওয়া, রপ্তানি বৃদ্ধি (৩৩ বিলিয়ন) ও রেমিট্যান্স প্রবাহ পুনরুত্থান, এমআরপি, সমুদ্রবিজয় এবং অমিত সম্ভাবনার ডিজিটাল বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা। একটি গতিময় সরকারি শাসন কাঠামো এবং গণখাতের শক্ত অবকাঠামো সৃষ্টি করে উদ্যমী, পরিশ্রমী ও সাহসী উদ্যোক্তাগণকে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সোনার বাংলা গড়ার মহতী কাজে বিনিয়োগ করতে হবে। কিষাণ-কিষাণি, মৎস্যজীবী, পশুপালনকারী, শ্রমজীবী ও গতিময় উদ্যোক্তাগণ অব্যাহতভাবে সম্পৃক্ত থাকবেন প্রযুক্তিনির্ভর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বার ২০১৯)

লেখক : বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

১৬ ডিসেম্বর–নূতন সূর্যোদয়

প্রফেসর আবদুল মান্নান

৪৯তম বিজয় দিবসের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, ৩০ লক্ষ শহিদ, দুই লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি রইল সালাম ও শ্রদ্ধা। একই সাথে স্মরণ করছি মিত্রবাহিনীর সেসব শহিদকে, যাঁরা ১৯৭১ সালে বাংলা ও বাঙালির মুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এবারের বিজয় দিবসের একটি ভিন্ন তাৎপর্য আছে। আগামী ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর কাউন্টডাউন শুরু হবে। পরের বছর, ২০২১ সালে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে। একটি ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যে দেশটি একাত্তরে জন্ম নিয়েছিল সেই দেশটি এখন সাবালকত্ব অতিক্রম করছে। জন্মলগ্নে বিশ্বের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, আন্তর্জাতিক সংস্থার বড়ো কর্তাব্যক্তিরা যে বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি সেই বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের কাছে এক বিস্ময় আর উন্নয়নের রোল মডেল। যাত্রার শুরুতেই বর্তমান বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন একজন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বিদেশি সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই বাংলাদেশকে তিনি কীভাবে টেনে তুলবেন? বঙ্গবন্ধু বেশ দৃঢ়তার সাথে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার উর্বর জমি আছে, আমার পরিশ্রমী মানুষ আছে, তারাই আমার সম্পদ। তারাই আবার বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন।' বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ়চেতা জবাব বাংলাদেশের শত্রুদের পছন্দ হয়নি। তারাই তাঁকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে হত্যা করেছিল।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে টেনে তোলার ব্রত নিয়ে তখন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থরা অক্লান্ত পরিশ্রমে লিপ্ত। পাশাপাশি ঘরে-বাইরে আর একদল ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে তাদের প্রিয় পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের ধারণা যে ভুল ছিল, তা প্রমাণ করতে। এককথায় ঘরে-বাইরে শত্রু। শত্রুদের হাত অনেক শক্তিশালী ও প্রসারিত। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করেছিলেন সকল বাঙালিকে। সব দেখেশুনে মার্কিন চলচ্চিত্রকার ও সাংবাদিক কেবিন রেফার্টি ১৯৭৫ সালের ৬ জুন লন্ডনের ফিন্যানশিয়াল টাইমস পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ, একটি স্বপ্নের উন্নয়ন যাত্রার মৃত্যু (Bangladesh is the end of a great development dream)'। এর আড়াই মাস পর বঙ্গবন্ধুকে ঘাতকরা সপরিবারে হত্যা করে। নরওয়ের অর্থনীতিবিদ জাস্ট ফাল্যান্ড ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে আর পারকিনসন স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রার শুরুতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে কাজ করেছিলেন। ১৯৭৬ সালে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ Bangladesh-the test case of development-এ লিখেছেন, 'প্রকৃতি, মানুষ নয়, যা বাংলাদেশের

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে...বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান সম্ভব হলে এটি মোটামুটি আস্থার সাথে বলা যায় যে উন্নয়নের কঠিন সমস্যাসমূহও সমাধান সম্ভব। এই অর্থেই বাংলাদেশকে একটি পরীক্ষামূলক উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে (Nature, not man, is in charge of the situation in Bangladesh…if the problem of Bangladesh can be solved, there can be reasonable confidence that less difficult problems of development can also be solved. It is in this sense that Bangladesh is to be regarded as a test case). চার দশক পর বলা যেতে পারে বাংলাদেশ সেই পরীক্ষায় সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে।

শত শত বছর ধরে বাঙালি নানাভাবে নির্যাতিত ও শোষিত হয়েছে। বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার কখনো বাঙালির হাতে ছিল না। সেই মুঘল আমল হতে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙালির ভাগ্যের চাবিকাঠি ছিল অন্যের হাতে। কখনো মুঘল, কখনো নবাব বা জমিদার আবার কখনো-বা ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঙালিরা অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রেখেছিল। শুরুতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। চল্লিশের দশক হতে সেই আন্দোলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য পৃথক আবাসভূমির ধারণা যুক্ত হয়। অখণ্ড ভারতবর্ষের মানুষ মনে করেছিল আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে বিদেশিদের শাসনমুক্ত হতে হবে। বাঙালিরাও এই আন্দোলনে সামনের কাতারে থেকে সংগ্রাম করেছিল। বাঙালি মুসলমানরা ভারতবর্ষের পূর্বাংশে তাদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছে। এক পর্যায়ে তারা পাকিস্তান ধারণাকেও মেনে নিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা মিলবে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ। তাঁদের সাথে কর্মী হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন কলকাতায় অধ্যয়নরত তরুণ শেখ মুজিবসহ অনেকে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়। তারা একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা নিয়ে পূর্ববঙ্গে বসবাস করবে, সেটি তাদের স্বপ্ন ছিল। তবে বাঙালির সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু হতেই বাঙালি বাস্তবে হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রজা আর পূর্ববঙ্গ হয়ে উঠল পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। শুধু ইংরেজ শাসকদের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনের প্রতিষ্ঠা হলো। আবার শুরু হলো বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মুক্তির আন্দোলন, আবার সংগ্রাম। এবারের সেই সংগ্রাম অনেকটা আওয়ামী লীগের একক নেতৃত্বে। অখণ্ড পাকিস্তানের ২৩ বছরের সেই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ হতে বের হয়ে

যান। বাঙালির মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্বটা এসে পড়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর। বঙ্গবন্ধু অখণ্ড পাকিস্তানের ২৩ বছরের ১৩ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন দুবার। অবশেষে সত্তরের নির্বাচন, আওয়ামী লীগের ধস নামানো বিজয়, পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র, তারপর বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ যার পরিণতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

বঙ্গবন্ধু আজীবন একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পূর্বেই স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুধু ক্ষমতার বাইরেই থাকেনি, কখনো কখনো অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। কিন্তু দলটির একঝাঁক নিবেদিত কর্মীর প্রচেষ্টায় আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮১ সালের মে মাসে ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সাথে দলটির হাল ধরেন। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর অনেকে ধারণা করেছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন অনভিজ্ঞ শেখ হাসিনা তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব হয়তো সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না। রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনার অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে; কিন্তু ধমনিতে তো বঙ্গবন্ধুর রক্ত। পিতার রাজনৈতিক জীবনের একজন সাক্ষী, নিজে পরিচ্ছন্ন ছাত্ররাজনীতি করেছেন, পিতার মতো সাহস আর জেদ আছে, নির্ভয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, চলার পথে বাধা অতিক্রম করার মন্ত্র জানেন, তাঁকে রোখে কে? তাঁর হাত ধরেই ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের নব-উত্থান। জন্মের পর যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দেখার মানুষ পাওয়া দুরূহ ছিল সেই বাংলাদেশের মানুষ ৪৯তম বিজয় দিবসে বলতে পারে 'আমিই বাংলাদেশ'। যে দেশ স্বাধীন করার জন্য ৩০ লক্ষ মানুষ অকাতরে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে সেই দেশ তো কখনো পরাজিত হতে পারে না। ১৯৭১-৭২ সালে অনেকের কাছে একটি নিষ্প্রভ বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে একটি সম্মানিত রাষ্ট্র আর সেই রাষ্ট্রের বর্তমান ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। যে জাতি অন্যের দেওয়া রিলিফ খেয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সে জাতি অন্যকে সংকেটের সময় এখন রিলিফ দিতে পারে। শুরুতে বাংলাদেশের বাজেট ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। যাত্রার শুরুতে পুরো বাজেটই ছিল সাহায্যনির্ভর। বর্তমানে মোট রাজস্ব বাজেটের ৯০ ভাগ নিজেদের অর্থে বাস্তবায়িত হয়। বাকি ৮ ভাগ আসে বৈদেশিক ঋণ আর ২ ভাগ সাহায্য হতে। একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে শুধু বিশ্ব অবাকই হয় না, অনেকে বলে বাংলাদেশ বর্তমানে একটি রহস্যময় অর্থনীতির (Mysterious Economy) দেশ। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এই

অঞ্চলে সর্বোচ্চ, ৮.১৩। ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। স্বাধীনতার আগে যে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিরা অবজ্ঞার চোখে দেখত, সেই পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ হতে চায়। তারা চিৎকার করে বলে, 'আমাদের বাংলাদেশ বানিয়ে দাও'। বিশ্বের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর কাছে উন্নয়নের রহস্য জানতে চান। বঙ্গবন্ধু হয়তো আকাশ ছুঁতে চেয়েছিলেন, ঘাতকরা তা হতে দেয়নি। তাঁর কন্যার হাত ধরে এ দেশের মানুষ কিছুটা হলেও আকাশের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছেন। এই বিজয় দিবসে সকলকে বিজয়ের শুভেচ্ছা। একাত্তরের মহানায়কদের অভিবাদন। ❐

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এম হারুন-অর-রশিদ (বীরপ্রতীক)

যেকোনো দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন একটি গৌরবময় ঘটনা। পৃথিবীতে খুব কমসংখ্যক জাতি আছে, যারা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ এদিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী দেশ, যে দেশটি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এ ধরনের একটি মহান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে গৌরবান্বিত এবং এই পরম সৌভাগ্য অর্জনের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা।

১৯৭০ সালের শেষের দিকে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করি এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়নে বদলি হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে যোগ দিই। ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় ব্রিগেড সদর দফতরে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করার সুবাদে বিশেষ করে কুমিল্লা ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে তৎকালীন বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ হয়। সে সময় পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, কিন্তু সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সংখ্যাপরিষ্ঠতা পাবে না। তেমন ভালো ফলাফল করতে পারবে না; কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, যা ছিল পশ্চিমা সেনা কর্মকর্তাদের নিকট একেবারেই অপ্রত্যাশিত। নির্বাচনের পর তাঁদের চেহারা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা সবই বদলে যায়। তাঁরা প্রকাশ্যে বলেন যে, কোনো অবস্থাতেই আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না। তাঁদের বক্তব্য এত সুস্পষ্ট ছিল যে বয়সে তরুণ এবং সেনাবাহিনীর কনিষ্ঠতম কর্মকর্তা হয়েও তাঁদের মনোভাব বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আমাদের।

আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য চলতে থাকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারটি ইউনিট তথা প্রথম ইস্ট বেঙ্গল যশোর সেনানিবাসে, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল জেয়দেবপুরে, তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রংপুরে ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থানরত ছিল। এ ছাড়া অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের কিছু অংশ পাকিস্তান যাওয়ার অপেক্ষায় চট্টগ্রামের হালিশহরে অবস্থিত ছিল। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার ছিল চট্টগ্রাম সেনানিবাসে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিট ও স্থাপনাগুলোকে তাদের এ সমস্ত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথে একটি বাধা হিসেবে গণ্য করে। এরই অংশ হিসেবে প্রতিটি ব্যাটালিয়নকে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে সেনানিবাসের বাইরে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। চতুর্থ ব্যাটালিয়নকেও ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে কুমিল্লার দক্ষিণে জাঙ্গালিয়া থেকে শুরু করে সিলেটের শালুটিকর বিমানবন্দর পর্যন্ত

এলাকায় নিয়োজিত করা হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানা গেছে যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে কিছু সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী জোরপূর্বক এ দেশের সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করছে। চতুর্থ ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব ছিল কসবা থেকে সিলেট পর্যন্ত এলাকায় এদের চিহ্নিত করে ধ্বংস করা। এ জন্য আমার কোম্পানি 'ডি'সহ আরেকটি কোম্পানি 'সি'-কে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়। 'সি' কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন মেজর সাফায়াত জামিল (পরবর্তীতে কর্নেল এবং বীরবিক্রম) এবং 'ডি' কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন একজন পাকিস্তানি কর্মকর্তা মেজর সাদেক নেওয়াজ। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকি সৈন্যদলকে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে নিয়োজিত করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দুটি : প্রথমত, সমগ্র ইউনিটের চেয়ে যেকোনো ছোটো দলকে নিরস্ত্র করা পাকিস্তানিদের জন্য সহজসাধ্য হবে; দ্বিতীয়ত, বাঙালি অফিসাররা একত্রে থাকতে না পারলে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ কম হবে এবং একক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সেনানিবাসের বাইরে অবস্থানের ফলে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশি হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকার সুবাদে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের সুবাদে তাদের মনোভাব বুঝতে সুবিধা হয়। যুদ্ধ শুরু করতে হলে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, তাও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয় আমাদের।

১ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হলে পরিস্থিতি অনিশ্চয়তার দিকে ধাবমান হয়। আমাদের পরনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম থাকায় জনগণ আমাদের সন্দেহের চোখে দেখছিল। তাই তারা কুমিল্লা থেকে আমাদের খাদ্য ও অন্যান্য রসদ আসার পথে সৃষ্টি করেছিল নানা প্রতিবন্ধকতা। সন্দিগ্ধ জনগণ বারবার জানতে চাইছিল আমাদের, অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভূমিকা কী? ঘটনার নাটকীয় মোড় পরিবর্তন হয় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর। তখন অসহযোগ আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, কোনো অবস্থাতেই কোনো সৈন্যদলকে সেনানিবাসের বাইরে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছিল না; কিন্তু বাঙালি সৈনিক হওয়ার সুবাদে জনগণের সাথে একটা যোগাযোগ তৈরি করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে বাঙালি সৈন্য হিসেবে আমরা সব সময় বাঙালিদের সাথেই আছি এবং সঠিক মুহূর্তে আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু করব। তাদের এ কথা বলে সতর্ক করেছি যে, কোনো ধরনের অপরিপক্ব বা অকালীন পদক্ষেপ চলমান আন্দোলনের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

কালজয়ী ৭ই মার্চের অমোঘ ঘোষণার পর আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের কর্তব্য-কাজ কী। শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ছড়ানো ছিটানো এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় অবস্থানরত থাকায় আমাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল

না। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যারা ছিলাম– আমি, মেজর শাফায়াত জামিল, ক্যাপ্টেন এনাম (শহিদ হয়েছেন ২৯ মার্চ, ১৯৭১) ও লেফটেন্যান্ট কবীরের মধ্যে আলোচনা-পরামর্শ চলতে থাকে। ২৩ মার্চে আমাদের আরেকটি কোম্পানি 'এ' কোম্পানি মেজর খালেদ মোশাররফের (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল এবং বীর-উত্তম) নেতৃত্বে সিলেটের সমশেরনগরে পাঠানো হয়। ২৫ মার্চে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্যাটালিয়ন সদরসহ আরেকটি কোম্পানির অংশ বিশেষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের সাথে মিলিত হয়। ২৫ মার্চ রাত্রে যখন নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সৈন্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বাঙালির পয়সায় কেনা আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে বাঙালি নিধনে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন আমরা বুঝতে পারি আর কালক্ষেপণের সময় নেই, আমাদের অস্ত্র ধরতেই হবে। ২৬ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাইরে অবস্থানরত সৈন্যদের সাথে আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপনে সফলও হই। ২৬ তারিখ সারাদিন আমরা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে কারফিউ জারি করি। সে সময় আওয়ামী লীগ নেতা এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে আমরা যোগাযোগ করি। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের কর্তব্যকর্মে সহায়তা করেন। তাঁদের মধ্যে জাহাঙ্গীর ওসমান (পরবর্তীতে সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন এবং বীরপ্রতীক), হুমায়ুন এবং তৎকালীন এমপিএ (বর্তমান সংসদ সদস্য) জনাব লুৎফুল হাই সাচ্চু উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা খবরাখবর পেতাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে পাকিস্তানিদের পক্ষে আর চাকরি করা যাবে না এবং আমাদের মুক্তিকামী জনগণের পক্ষে দাঁড়াতেই হবে। সে হিসেবে ২৭ তারিখ সকাল সাড়ে ৮ ঘটিকায় মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তৎকালীন 'ওয়াপদা' রেস্ট হাউসের সামনে ইউনিটের অধিনায়ক লে. কর্নেল খিজির হায়াত খান, ডেল্টা কোম্পানির অধিনায়ক সাদেক নেওয়াজ এবং লে. আমজাদ সাঈদকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করি। এই বিদ্রোহের ক্ষেত্রে অন্য যেসব কর্মকর্তার অবদানের কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন আব্দুল গাফফার হাওলাদার (পরবর্তীতে কর্নেল এবং বীর-উত্তম), যিনি সময়মতো এবং সাহসী পদক্ষেপ না নিলে কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদের জীবন বাঁচানো যেত না। এ ছাড়া ছিলেন সুবেদার আনোয়ার, নায়েব সুবেদার সিদ্দিক, হাবিলদার বেলায়েত, হাবিলদার মুনির, হাবিলদার রেজাউল, নায়েক মুনির, নায়েক কাশেমসহ আরো অনেকে। বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে বিকাল ৪টার দিকে মেজর খালেদ মোশাররফ সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসেন এবং আমাদের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বলতে গেলে সেদিন থেকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরু।

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের চারদিকে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে সমর সম্ভার ও রসদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে 'ডি' কোম্পানি দিয়ে শহরের দক্ষিণে তিতাস নদীর রেল ও সড়কপথে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, ক্যাপ্টেন গাফফারের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় 'বি' কোম্পানি দিয়ে ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেললাইন ও গোকর্ণ ঘাট এলাকার প্রতিরোধ গড়ে তোলা। বাকিরা তেলিয়াপাড়া ও অন্যান্য দায়িত্বে চলে যায়। আমাদের বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সাথে সাথে এসে যোগ দেয়। সে ছিল এক বিরল ও অভূতপূর্ব আবেগঘন মুহূর্ত। শত শত লোক যার যা কিছু ছিল সব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা সবাই যুদ্ধে যেতে আগ্রহী। বেশ কষ্টসাধ্য ছিল তাদের সেই উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। তাদের বোঝানো হলো, 'আমরা আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি, পরে আপনাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হবে।' প্রকৃতপক্ষে সেখানকার সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের জন্য খাবারদাবার, ওষুধপত্র সরবরাহসহ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যে অবদান রেখেছে, সে জন্য তাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। পরবর্তীতে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণে আখাউড়ার গঙ্গাসাগর, আখাউড়া জংশন, খড়মপুর, সিঙ্গারবিল এবং শেষের দিকে কসবা, লাতুমুড়াসহ বেশ কিছু অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। সে সময় সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি নিবিড় সম্পর্ক। তারা নিরস্ত্র হলেও যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ছিল ব্যাকুল। অনেক তরুণ যোদ্ধা স্বেচ্ছায় দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বহন করত অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ। অনেকে কাজ করত পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থান সম্পর্কে খবরাখবর দিত। ওই সব তরুণ যোদ্ধার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সামনে এগিয়ে নিতে অনেক সাহায্য করেছে।

সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। মুষ্টিমেয় কিছু কুলাঙ্গার ছাড়া সকলের অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত। যার ফলে মাত্র ৯ মাসের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে তথাকথিত একটি সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে আমরা সমর্থ হয়েছি এবং আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ ঘটা কোনো ব্যাপার নয়। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর নির্বাচন সবটিরই চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তার পরের ঘটনাপ্রবাহ এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন প্রমাণ করে যে শুধুমাত্র ধর্মই রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না এবং তার ওপর রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার নীতিনির্ভর একটি মর্যাদাশীল জাতি প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ। যার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। দুঃখজনক হলেও সত্য যে পরবর্তীতে উক্ত আদর্শসমূহ হতে বারবার আমরা সরে এসেছি এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে এর মূলরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা হয়েছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, যার ফলে এ দেশে শুরু হয়েছে হানাহানি, শুরু হয়েছে মৌলবাদের উত্থান। ১৯৭৫-

এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যা, পরবর্তীতে জেলখানায় জাতীয় চার নেতার হত্যা, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী সেক্টর কমান্ডারদের হত্যাসহ চলতে থাকে অব্যাহতভাবে নেতা-নেত্রী হত্যা। পরবর্তীতেও হত্যার শিকার হতে হয়েছে সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, বিচারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ আরো অনেক জাতীয় বিজ্ঞ ও মেধাবী ব্যক্তিত্বকে। আক্রান্ত হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতি; পহেলা বৈশাখের মেলায় ও উদীচীর অনুষ্ঠানে হয়েছে গ্রেনেড হামলা, ২১ আগস্টের জনসভায় গ্রেনেড হামলা, বড়ো বড়ো অস্ত্রের চালান, কয়েক ট্রাক ভর্তি গোলাবারুদ আটক, ৬৩ জেলায় একই সময়ে বোমা বিস্ফোরণ এবং সর্বশেষ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পিলখানায় সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন– এসব ঘটনা সবই একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের ধারাবাহিকতা, অর্থাৎ এই দেশ ও জাতিকে মেধাশূন্য ও নেতৃত্বশূন্য করার চক্রান্ত। বিচারহীনতা, হত্যাকারীদের রাজনৈতিক ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসন করাই হচ্ছে এসব ঘটনার জন্য দায়ী। অপরাধীরা যত দিন সমাজে অবাধে বিচরণ করতে থাকবে, যত দিন বা এদের বিচার হবে, তত দিন চলতেই থাকবে এসব অপরাধ, সন্ত্রাসী ঘটনা ও হত্যাযজ্ঞ, বিশ্বদরবারে ভূলুণ্ঠিত হতে থাকবে আমাদের জাতীয় সম্মান।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী গৌরবময় জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই হবে। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধসহ সকল হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই, যেখানে যুদ্ধাপরাধ হয়েছে, অথচ বিচার হয়নি। সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম নির্বাচনের আগে গত দুই বছর সারা দেশের আনাচকানাচ ঘুরে বেরিয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের সাথে তারা মতবিনিময় করেছে। জনগণকে আহ্বান করেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার জন্য। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণ বিচারের সপক্ষে মহাজোটকে ভোট দিয়েছে। মহাজোটের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। মহাজোট সরকার গঠন করার পর মহান জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জাতি এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন চায়।

মহান স্বাধীনতার এই দিনে সরকারের কাছে আমাদের জোরালো দাবি, এ দেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্যটি অচিরেই সংঘটিত হোক। জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের দাবি হলো মৌলবাদ, সন্ত্রাস, হত্যাযজ্ঞসহ সকল অপশক্তির মূলোৎপাটন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমারও সরকারের নিকট এই প্রত্যাশা। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৯)

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সেনা প্রধান।

১৬ই ডিসেম্বর : বাঙালির বিজয়ের দিন, মুক্তির দিন

অনুপম সেন

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির ইতিহাসে ১৬ই ডিসেম্বর ও ২৬ শে মার্চ দুটি অনন্য দিন; মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিন, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের দিন। বাঙালির ইতিহাস সুপ্রাচীন। তার জাতিসত্তা কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে নিগ্রোইড, মঙ্গোলয়েড, ককেশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে। এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন স্বাধীন রাজা, সুলতান ও নবাব রাজত্ব করেছেন। পাল রাজারা অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক এবং সেন রাজারা দ্বাদশ শতকে এই ভূখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের পরবর্তী বিভিন্ন সুলতান রাজত্ব করেছেন আরো প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে আমরা পাই সিরাজউদ্দৌলাকে, যিনি পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভের কাছে। এই স্বাধীন রাজা বা সুলতানদের আমলে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ছিলেন তাঁরা বা তাঁদের অমাত্য, আমলারা। ইংরেজ আমলে ধনতন্ত্রের বহমানতার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের একটি আইনানুগ ভিত্তি থাকলেও জনগণের প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ছিল না। তারা ছিল শোষণের শিকার। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঔপনিবেশিক শোষণ আরো তীব্র হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেই গড়ে তোলা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতের বিশাল সমৃদ্ধি। এর শিল্প, সেবা, এমনকি কৃষি-অর্থনীতিকেও নির্মম শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও পাটজাত বস্তুই হয়েছিল পাকিস্তানের পুঁজি সঞ্চয়নের ক্ষেত্র। পাকিস্তান শাসনের অধিকাংশ সময় সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র পাকিস্তানকে শাসন করেছে, মুখ্যত এই আমলাতন্ত্র ছিল পাঞ্জাবি নিয়ন্ত্রিত। স্মর্তব্য, পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশই ছিল বাঙালি। স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের প্রশাসনে মুখ্য ভূমিকা থাকার কথা ছিল বাঙালির; কিন্তু তা হয়নি। দীর্ঘ ২৩ বছর বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের এই নির্মম শোষণের বিরুদ্ধেই বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দিয়েছিলেন। ৬ দফা ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সনদ, যেখানে ফুটে উঠেছিল দুটি রাষ্ট্রের অবয়ব। সে জন্যই আইয়ুব খান বলেছিলেন, শেখ মুজিব যদি ৬ দফা প্রত্যাহার না করেন, তাহলে তাঁকে যুক্তির ভাষা নয়, অস্ত্রের ভাষা দিয়ে বোঝানো হবে। এই অস্ত্রের ভাষা, নিপীড়নের ভাষা বঙ্গবন্ধুর ওপর বারবার নেমে এসেছিল; পাকিস্তান শাসনের দীর্ঘ ২৩ বছরে ১২ বছরের বেশি সময় তিনি কাটিয়েছেন কারান্তরালে। কিন্তু কোনো নির্যাতনই তাঁকে টলাতে পারেনি। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপি ছিল ১২৩৭.৪ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯.১ কোটি। ১৯৬৯-৭০ সালে তা বেড়ে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ২২৭১.৩ কোটি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৩১৫৬.৩ কোটি টাকা।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির মুক্তির বার্তা বহন করে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে স্বাধীনতার যে শ্রেষ্ঠ ভাষণটি ১০ লক্ষ জনতার সামনে দিয়েছিলেন তার শেষ বাক্য ছিল, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই ভাষণটি ছিল মহাকাব্যিক। বস্তুত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরেই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি তার হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করে; নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যে রাষ্ট্রে ঘোষিত হয়, 'রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস জনগণ', অন্য কেউ নয়।

এই স্বাধীনতার জন্য যে বিশাল মূল্য বাংলাদেশকে দিতে হয়েছিল, তার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল; ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণ ও তিন লক্ষ জননী-জায়া-কন্যার সম্ভ্রম।

১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করল, স্বাধীনতা পেল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বিজয়ী বাঙালির মধ্যে ফিরে এসে এমন একটি দেশ পেলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। পরাজয় নিশ্চিত হলে পাকিস্তানিরা অনুসরণ করেছিল 'Scorched Earth' বা 'পোড়ামাটি নীতি'। পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম প্রচার করেছিল বাংলাদেশ যেভাবে বিধ্বস্ত, তার ফলে এক কোটি লোক অনাহারে মারা যাবে। কিন্তু একজন লোকও খাদ্যের অভাবে মারা যায়নি। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করা হলো। দেশের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার কালভার্ট ও বেশ কয়েকটি বড়ো ব্রিজ দ্রুত মেরামত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয়। দেশের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর সম্পূর্ণভাবে অচল ছিল বোমার আঘাতে ডোবা জাহাজের কারণে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে বন্দরকে দ্রুত সচল করা হয়। বঙ্গবন্ধু শাসন ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর; কিন্তু এরই মধ্যে দেশের মানুষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়ার জন্য কত কাজ যে তিনি শুরু করেছিলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এর মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথমটি হলো, দেশকে শক্ত রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১০ মাসের মধ্যে একটি অসাধারণ সংবিধান প্রণয়ন (যেখানে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নে সময় নেওয়া হয়েছিল ৯ বছর)। বঙ্গবন্ধু এই সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদে উপস্থাপন করার সময় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, এই সংবিধানই বাঙালির প্রথম সংবিধান। এই সংবিধানের মাধ্যমেই বাঙালি জনগণকে তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। মনে রাখা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ পেয়েছিলেন, তার ৬০ শতাংশ লোকই ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছিল, তা তারপরবর্তী সাত বছরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তিনি যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, সে সময় বাংলাদেশের

বার্ষিক খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন। এই খাদ্য ঘাটতি থেকে তিনি দেশকে ১৯৭৫ সালেই প্রায় মুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। '৭৫ সাল শেষ হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী পদক্ষেপের কারণে কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছিল। কিন্তু এই বাম্পার ফলনের ফলভোগী তিনি হননি। তিনিই সূচনা করেছিলেন ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা ও ছিটমহল বিনিময়। এই সূচনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন প্রায় চার দশক পরে তাঁরই কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা, আর কেউ নয়।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল–এই দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালির পরাজয়ের ইতিহাস। এই ২১ বছরে বাঙালিকে তার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে যারা কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করেছে, তারা বাঙালির যে অসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রাম, অসাধারণ আত্মত্যাগ, তা জানতে পারেনি। তখন আমাদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশে। প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের আগে অর্থমন্ত্রীরা ভিক্ষার থলি নিয়ে বের হতেন ওই সব প্রতিষ্ঠান কত ঋণ দেবে তার প্রত্যাশায়। আজ কিন্তু আমরা ভিক্ষুক নই। বাংলাদেশের বাজেট আজ আর বৈদেশিক অর্থঋণ ও অর্থ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। ১৯৯৬ সালে দেশরত্ন শেখ হাসিনা যখন প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসীন হন, তখনই তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিল তাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৯৮ সালে একটি ভয়াবহ বন্যা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ সালে বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় চার দশক পরে প্রথমবারের মতো স্বয়ম্ভর হয়েছিল। কিন্তু এই স্বয়ম্ভরতা চারদলীয় ঐক্যজোটের শাসনকালে স্থায়ী হয়নি। প্রথমবারের শাসনামলে দেশরত্ন শেখ হাসিনা কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি, পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা। গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করেন, নদীর নিম্নপ্রবাহের দেশের জলপ্রাপ্তির অধিকার। এ ছাড়া তাঁর পার্বত্য শান্তিচুক্তি ছিল এমন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে বহু অহেতুক মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজ এক অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব উন্নয়নের শিখরে নিয়ে গেছেন। ২০০৯ সালে দেশরত্ন শেখ হাসিনা যখন দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতাসীন হলেন, তখন বিশ্বজুড়ে চলছে গ্রেট রিসেশন বা মহামন্দা। বিশ্বের উন্নত বা উন্নয়নশীল প্রায় সব অর্থনীতির অবস্থাই ছিল সংকটাকীর্ণ। বাংলাদেশের অর্থনীতিও ছিল চরম ভঙ্গুর অবস্থায়। বিদ্যুতের অবস্থা এমনই ভয়াবহ ছিল যে, সন্ধ্যা হলেই ঘরে ঘরে নেমে আসত অন্ধকার। শহর-গ্রাম নির্বিশেষে দিনে-রাতে লোডশেডিং চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শিল্প-কারখানাগুলোর অনেকই বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেগুলো টিকেছিল, সেগুলোও ধুঁকছিল। এই বিদ্যুৎ সংকটের বড়ো একটি কারণ ছিল, চারদলীয় সরকারের আমলে

১০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিদ্যুতের খুঁটি আমদানি করা হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি করা হয়নি। বরং বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ৬০০ মেগাওয়াট কমে যায়। বিদ্যুতের এই মহাসংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দেশরত্ন শেখ হাসিনা এক অসীম সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। নানা দেশ থেকে এনে রেন্টাল বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করেন। কারণ একটি মাঝারি আকারের বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় ৬-৭ বছর। এই পদক্ষেপের ফলে অনেক এনজিও, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছিলেন যে শেখ হাসিনা দেশকে মহাবিপদের সম্মুখীন করছেন; কারণ কুইক রেন্টাল প্লান্টে ব্যবহৃত হবে ডিজেল বা ফার্নেস অয়েল, যা দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে, নিঃস্ব করবে। শেখ হাসিনা এদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করেননি। তিনি সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে মাত্র ৩-৪ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেলেন, যা শুধু ঘরে ঘরে বিদ্যুৎই এনে দিল না, দেশকে শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপরও দাঁড় করিয়ে দিল। এই একই সময়ে পাকিস্তানেরও বিদ্যুৎ ঘাটতি শুরু হয়। কিন্তু পাকিস্তানের নেতারা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ প্লান্টের আশ্রয় নেওয়ার সাহস করেননি। তাই আজ সেখানে বিশাল বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে লাহোর, পেশোয়ার, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, এমনকি রাজধানী ইসলামাবাদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎবিহীন থাকে। ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি আজ বাংলাদেশ থেকে অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আজ ২০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। প্রতিদিন প্রায় ১২ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ গৃহে বিদ্যুৎ পৌঁছেছিল, আজ তা ৯৫ শতাংশ। বিদ্যুতের প্রভাবে শহরের অনেক সুবিধাই আজ গ্রামবাসীর দ্বারপ্রান্তে; নিম্নবিত্তের ঘরেও আজ বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিভিশন ইত্যাদি পৌঁছে গেছে। যে বাংলাদেশ বার্ষিক প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করত, সেই বাংলাদেশ আজ ২০ লক্ষ টনের বেশি খাদ্যশস্য রপ্তানি করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ছিল ১ কোটি টন, আজ তা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন, যদিও কৃষিজমির পরিমাণ তখন থেকে অনেক কমেছে গ্রামীণ জমিতে বিভিন্ন ঘরবাড়ি ও ভৌত কাঠামো গড়ে তোলার ফলে। বিপুল বিদ্যুৎ উৎপাদন বাংলাদেশকে আজ একটি শিল্পঋদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৩.৭ বিলিয়ন ডলার, আজ তা প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ আজ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ, মাথাপিছু আয় প্রায় ২০০০ ডলারের কাছাকাছি, যা এক দশক আগেও ছিল ৬০০ ডলারের সামান্য ওপরে। বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এই আর্থিক বছরে ৮.১৩। অচিরেই তা ১০ শতাংশে পৌঁছুবে। এই বছর বিশ্বের যে ১০টি অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সারা বিশ্বকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করেছে। বাংলাদেশ আজ নিজের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেতু নির্মাণ করছে, যা তিন বছর আগেও বহু অর্থনীতিবিদ কোনোভাবে সম্ভব নয় ভেবেছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এত শক্ত ভিত্তির

ওপর দাঁড়িয়েছে যে সে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাকেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

বাংলাদেশ আজ চরম ক্ষুধাকে জয় করেছে, দারিদ্র্যকেও জয় করার প্রান্তে (বাংলাদেশে ২১ শতাংশ লোক এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে, যা তিন দশক আগেও ছিল ৪৭ শতাংশ)। প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণে আজ বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর। প্রতিবছর চার কোটি শিক্ষার্থীকে বছরের প্রথমে ৩৫ কোটি বই রাষ্ট্র থেকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, যা বিশ্ব ইতিহাসেই এক অনন্য ঘটনা। পদ্মা সেতু ছাড়াও অনেক বৃহৎ প্রকল্প রাষ্ট্র আজ নিজের হাতে গ্রহণ করেছে; যেমন–এলএনজি টার্মিনাল, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ রেললাইন, ঢাকা মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল ইত্যাদি। এ ছাড়া তৈরি করা হচ্ছে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, যেখানে হবে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থান।

যে বিজয় অর্জন করেছিলাম, বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে রূপ দেওয়া, পূর্ণতা দেওয়া। দারিদ্র্যমুক্ত, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিঋদ্ধ বাংলাদেশ সৃষ্টি, যেখানে প্রতিটি মানুষ মানুষের মর্যাদা পাবে। সেই বিজয়ের পথেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে যাব। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০০৯)

লেখক : বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

সারা জীবনের প্রয়াস

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের প্রয়াস ছিল জাতির একটি রাজনৈতিক সংজ্ঞা তৈরি করা, যে সংজ্ঞা পাকিস্তানের সংজ্ঞা থেকে স্বতন্ত্র। পাকিস্তানের জাতীয়তার সংজ্ঞা এথনিক, সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাকে মতাদর্শ ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে নির্মাণ করেছেন। পাকিস্তানের জাতীয়তা নির্মাণের ভিত্তি এথনিসিটি ও ধর্ম, বিপরীতে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নির্মাণ করেছেন জাতীয়তা। এই জাতীয়তা দুই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। প্রথম অভিজ্ঞতা নির্মিত হয়েছে পাকিস্তানি জাতীয়তা তদন্ত করার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা নির্মিত হয়েছে পাকিস্তানি জাতীয়তা প্রতিরোধ ও বিকল্প জাতীয়তা নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

পাকিস্তানি জাতীয়তার ভিত্তি পাকিস্তানি এথনিসিটি ও এই এথনিসিটির ভিত্তি ইসলাম। পাকিস্তানি এথনিসিটি একটি একক এবং এই এককের বিপরীত একক বাঙালি এথনিসিটি। বাঙালি এথনিসিটি তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানি এথনিসিটির চেয়ে নিকৃষ্ট, এই এথনিক জনগোষ্ঠী পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফ্রেমে অধঃস্তন পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কলোনির বাসিন্দা। যে ক্ষেত্রে পাকিস্তানি এথনিসিটির ভিত্তি 'শুদ্ধ' ইসলাম, সে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কলোনির বাঙালি মুসলিম এথনিসিটির ভিত্তি 'অশুদ্ধ' ইসলাম, বাঙালি হিন্দু এথনিসিটির ভিত্তি 'পৌত্তলিকতা', অন্যান্য জনগোষ্ঠী 'সত্য' ধর্ম বিচ্যুত।

পাকিস্তানি জাতীয়তার শ্রেষ্ঠত্বের অভিজ্ঞতা থেকে নির্মিত বর্ণবাদী ধর্মজ জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ একপক্ষে বর্ণবাদী, অন্যপক্ষে ধর্মজ। এই দ্বিবিধ উপাদান পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে করেছে জঙ্গি। এই জঙ্গি বর্ণবাদী ধর্মজ জাতীয়তার অভিজ্ঞতা পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশে নির্মম ও নিষ্ঠার। সমগ্র পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের জনসমষ্টির অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধু একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতির বোধে উত্তীর্ণ হন। তিনি এবং তাঁর কাছের এবং দূরের সহযোগীরা মওলানা ভাসানী থেকে তাউউদ্দীন আহমদ, মোজাফফর আহমেদ থেকে মণি সিং, রণেশ দাশগুপ্ত থেকে জয়নুল আবেদিন, রেহমান সোবহান থেকে আনিসুর রহমান সবাই জাতির এই বোধের মধ্যে মুক্তির অমিত সম্ভাবনা খুঁজে পান। এই বোধ ভারত বিভাগপূর্ব হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জবাব, একই সঙ্গে ভারত বিভাগোত্তর পাকিস্তানের মৌলবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এই বোধ দিয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যান করে একটি ভিন্নধর্মী জাতি গঠন যেমন সম্ভব, তেমনি জাতি গঠনের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি র‍্যাডিকেল আধুনিকতার বোধ উৎসারণ করা সম্ভব। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ভারে আক্রান্ত, পাকিস্তান মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের ভারে জঙ্গি, সে ক্ষেত্রে

বাঙালি জাতীয়তার বোধ একপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তার হিন্দু গৌরববোধের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য থেকে মুক্ত এবং অন্য পক্ষে পাকিস্তানি জাতীয়তার জঙ্গিপনা থেকে মুক্ত একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ–ভৌগোলিক পূর্ব বাংলায় আদিবাসী, বৌদ্ধ-হিন্দু, মুসলমান-খ্রিস্টান পরম্পরাক্রমে বসবাস করেছে, জনসমষ্টি এখানে তার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রেখে গেছে, এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ঐতিহ্য মূল্যবান।

ঔপনিবেশিক আমলে জাতীয়তার বোধ তৈরির সময়ে, জাতীয়তা বোধের মধ্যে পপুলিজমের বীজ সকল প্রবিষ্ট ছিল। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক ভাষণে, ভাবনায়, রচনায় কৃষক সমাজ ও কৃষি প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে এসেছে। এই পপুলিজম একটা বিষণ্নতার বোধে আক্রান্ত; পাকিস্তানি ধনতন্ত্র কৃষকদের দুর্গতিকে চরম পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, কৃষকরা প্রধানত পাটচাষিরা তাদের উৎপন্নের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। কৃষকদের সর্বনাশের অর্থ জাতীয়তা/কমিউনিটির ভিত্তি হয়ে ওঠে অস্থিতিশীল।

অন্যপক্ষে এই পপুলিজমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উৎকীর্ণ। কৃষিভিত্তিক ও কৃষকভিত্তিক জাতীয়তার লক্ষ্য কৃষি সমস্যা ও কৃষক সমস্যার সমাধান। ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফ্রেমে কৃষি সমস্যা ও কৃষক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সে জন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যাখ্যান ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সমর্থনে শক্তিশালী ধনতন্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে বিকল্প জাতীয়তা যেমন নির্মাণ সম্ভব, তেমনি বিকল্প জাতীয়তার অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কেন্দ্র ভিত্তিমূল কৃষি প্রশ্ন ও কৃষক প্রশ্নের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমাধান জরুরি। এসব যদি না করা হয় তাহলে, জাতীয়তার রাজনৈতিক অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণ সম্ভব নয়।

জমির প্রশ্নের মীমাংসা বাদে বিকল্প জাতীয়তা নির্মাণ অর্থহীন। সে জন্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীরা এই প্রশ্নটি তাঁদের রাজনৈতিক এজেন্ডায় নিয়ে আসেন এবং সবাই বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হন। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আমলে কৃষক আন্দোলন (আদিবাসী কৃষক থেকে হিন্দু-মুসলমান কৃষক পর্যন্ত এই আন্দোলনে ছিল যুক্ত) জমির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কৃষকের সম্পর্ক ও রাষ্ট্রের সঙ্গে জমি ও বিভিন্ন ধরনের কৃষকের সম্পর্ক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মীমাংসা করতে চেয়েছে। কৃষক আন্দোলন, কৃষি প্রশ্ন, বিভিন্ন ধরনের কৃষকের সঙ্গে জমির সম্পর্ক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক জাতীয়তা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বড়ো উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এখন থেকে বহু বিস্তৃত কৃষক আন্দোলন থেকে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ধর্মনিরপেক্ষতার বোধশক্তি লাভ করেছে ভাষা আন্দোলন থেকে ভাষা ব্যবহার ধর্মজ বিভিন্নতা অতিক্রমী এক ক্রিয়াশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। বিভিন্নমুখী নেতৃত্ব বিভিন্ন অতিক্রমী এক ক্রিয়াশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। বিভিন্নমুখী নেতৃত্ব বিভিন্ন কাজের মধ্যে রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বোধকে করে তোলে শক্তিশালী এবং জাতীয়তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বোধের অমিত সম্ভাবনা ব্যবহার

করতে থাকে আন্দোলন থেকে আন্দোলনে। বঙ্গবন্ধু প্রণীত জাতীয়তার কেন্দ্র ভিত্তিমূল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ উৎসাহিত হয়েছে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতার প্রতিরোধ থেকে। অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতা সাবেক পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ও লাঞ্ছিত করেছে। এই শোষণের প্রক্রিয়া ধনতন্ত্রী লাঞ্ছনার প্রক্রিয়া অধস্তনতা। সে জন্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীরা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানের ধনতন্ত্রী শোষণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন ও অধস্তনতাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত শোষণের বোধ থেকে জাতীয়তা নির্মাণ করা সম্ভব নয়, অধস্তনতা অব্যাহত রেখে জাতীয়তার গৌরব তৈরি করা সম্ভব নয়। বিকল্প জাতীয়তা শোষণহীন ও অধস্তনতাবহির্ভূত। তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য ধনতন্ত্র, পাকিস্তান রাষ্ট্র ধনতন্ত্র ও অধস্তনতা আরোপণের প্রতীক। তাঁদের রাজনৈতিক প্রজেক্ট, বঙ্গবন্ধু, মওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদ, মণি সিং, মোজাফফর আহমেদের ভাষণে, রণেশ দাসগুপ্ত, জয়নুল আবেদিনের সমাজ ভাবনায়, রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমানের অর্থনৈতিক চিন্তায় জাতীয়তার ভিত্তি হিসেবে কমিউনিটির/এথনিক/জাতিক কমিউনিটি সকল। সে জন্য জাতীয়তার অন্য শব্দ হিসেবে কমিউনিটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই কমিউনিটি নৈতিক কমিউনিটি, সে ক্ষেত্রটি শ্রেণি ভিন্নতা অতিক্রমী ও বিদ্যমান সম্পত্তি সম্পর্ক অতিক্রমী।

ঔপনিবেশিক সময়ে, ধনতন্ত্রী কাঠামো ও মৌলবাদী মতাদর্শের মধ্যে জাতীয়তার ধর্মনিরপেক্ষ কমিউনিটির বোধ প্রতিষ্ঠা এবং এই বোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাংলাদেশ আন্দোলনকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। সে জন্য বাংলাদেশ প্রজেক্টের ভিন্নতা চিহ্নিত করা জরুরি। বাংলাদেশ প্রজেক্টকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ভেবে থাকেন ভারতের জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ। পাকিস্তানি মতাদর্শিকরা বাংলাদেশ প্রজেক্টকে মনে করেন মুসলিম স্বাতন্ত্র্য বিনাশের একটি উদ্যোগ। দুই চিন্তাই ভ্রান্ত। তার দরুন রাজনৈতিক অর্থনীতির পটভূমি ও পরিসর বিশ্লেষণ করা জরুরি বঙ্গবন্ধু প্রণীত জাতির রাজনৈতিক সংজ্ঞার কাছে পৌঁছাবার জন্য। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১২)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের মহড়া

ড. রফিকুল ইসলাম

পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সুস্পষ্ট রায়কে পদদলিত করার জন্য, বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য পাকিস্তানি ক্ষমতাসীনদের ষড়যন্ত্রের পরিণামে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ তারিখে ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার সমস্ত মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তারা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ঢাকা সঙ্গে সঙ্গে একটি বিক্ষুব্ধ মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত, কলকারখানা-দোকানপাট, যানবাহন–সব বন্ধ হয়ে যায়। সংগ্রামী জনতার কাফেলা চারদিক থেকে পল্টন ময়দানের দিকে আসতে থাকে। চারদিকে কেবল জঙ্গি মিছিল, শেষ পর্যন্ত হোটেল পূর্বাণীর সামনে এক বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়। ওই হোটেলে তখন আওয়ামী লীগ পরিষদ দলের সভা চলছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনতাকে ধৈর্যহারা না হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু জনতা অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানায়। ওই দিন বিকেলে পল্টন ময়দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই দিন বিকেলে হোটেল পূর্বাণীতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার তীব্র প্রতিবাদ জনান। তিনি মঙ্গলবার ঢাকা শহরে হরতাল, বুধবার সারা দেশে হরতাল এবং ৭ই মার্চ রবিবার রেসকোর্সে জনতার অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ৭ই মার্চ জনসভায় পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচির রূপরেখা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন।

২ মার্চ তারিখে ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। জঙ্গি মিছিলে আর স্বাধীনতার স্লোগানে ঢাকা শহর মুখরিত হয়ে ওঠে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ছাত্রসভায় সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়। ২ মার্চ রাত্রে ঢাকা শহরে হঠাৎ বেতার মারফত কারফিউ ঘোষণা করা হয়। কারফিউ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও শ্রমিক এলাকা থেকে ছাত্র-জনতা ও শ্রমিকরা কারফিউয়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড স্লোগান তুলে কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। তাদের স্লোগান ছিল– 'সন্ধ্যা আইন মানি না', 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' প্রভৃতি। সমস্ত শহরে কারফিউ ভঙ্গ। সমানে রাত সাড়ে ৯টায় সামরিক বাহিনী জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। বিশাল এক জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে গভর্নর হাউসের দিকে এগিয়ে গেলে সেখানেও গুলি চালানো হয়। এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কারফিউ ভঙ্গকারীদের ওপর বেপরোয়া গুলি চলে। ৩ মার্চ আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। রামপুরায় ২ মার্চ ব্যারিকেড সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে সামরিক বাহিনীর গুলিতে ১৮ বছর বয়স্ক জঙ্গি ছাত্রনেতা ফারুক ইকবাল শহিদ হন।

৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতালের দিনে বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হামলা, সংঘর্ষ, অগ্নিকাণ্ড ও গুলিবর্ষণে চট্টগ্রামে ওই এক দিনেই প্রায় ৪০০ লোক হতাহত হয়। ৩ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি গ্রুপের ১২ জন নেতাকে ১০ মার্চ ঢাকায় এক বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গবন্ধু এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৫টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল। ৩ মার্চ পল্টনের ঐতিহাসিক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়। ওই ঘোষণাপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। মুক্তি আন্দোলনের চতুর্থ দিনটি পূর্ণ হরতাল, বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রা, গায়েবানা জানাজা, সভা ও স্বাধীনতার শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

৪ মার্চ চট্টগ্রামে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ৩ ও ৪ মার্চ দুই দিনে চট্টগ্রামে ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত হয়। ৩ মার্চ খুলনায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়। এদিকে শিল্পীরা এক বিবৃতিতে জানান, ২ মার্চ থেকে তাঁরা বেতার-টেলিভিশনে কোনো অনুষ্ঠান করছেন না, তাঁরাও এ সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

৫ মার্চ টঙ্গী শিল্প এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ফলে বহু শ্রমিক হতাহত হন। চট্টগ্রামে ইতোমধ্যে নিহতের ২২২ জনের লাশ পৌঁছে। রাজশাহীতে ওই দিন সামরিক বাহিনীর গুলিতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়, যশোরে ৩ মার্চ সেনাবাহিনী গণমিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করলে সেখানেও অনেক হতাহত হয়।

৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে দুষ্কৃতকারী আখ্যা দেন এবং ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল একটা ভাঁওতা মাত্র। গণহত্যার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানির প্রয়োজনীয় সময় লাভ করার জন্য ওই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত সত্তরের নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করে, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের বৈঠক স্থগিত এবং বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতাসংগ্রামের অনিবার্য এবং অপরিহার্য পথেই ঠেলে দিচ্ছিল।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা

৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্র। বাতাসে উড়ছে অসংখ্য পতাকা, সোনার বাংলার মানচিত্র আঁকা সূর্যের পতাকা, স্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে বাঙালির সংগ্রামের প্রতীক বাঁশের লাঠি, অসংখ্য লাঠি। মঞ্চে মাইক

থেকে স্লোগান দিচ্ছেন সংগ্রাম পরিষদের নেতারা। উদ্দীপ্ত হচ্ছে জনসমুদ্র– 'জয় বাংলা', 'আপস না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম', 'আমার দেশ তোমার দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ, 'পরিষদ না রাজপথ–রাজপথ রাজপথ', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। ৩টা ২০ মিটিটে বঙ্গবন্ধু সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ শুরু করেন। তিনি বক্তৃতার শেষে এক অবিস্মরণীয় ঘোষণা দেন–

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণ বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করেছে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে অপসারণ করে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁকে শপথ পাঠ করাতে অস্বীকার করায় তাঁকে কেবলমাত্র সামরিক শাসনকর্তা হিসেবেই কাজ করতে হয়। গণহত্যাযজ্ঞের শুরুতে টিক্কা খানকে গভর্নর এবং জেনারেল নিয়াজিকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়।

১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন 'সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, আদালত, রেলওয়ে, বন্দরসহ সরকারের সকল শাখা বাংলাদেশের জনগণের সাথে আমাদের নির্দেশ মেনে চলছে। যাঁরা মনে করেছিলেন যে শক্তির মাধ্যমে তাঁদের ইচ্ছা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন, তাঁদের স্বরূপ বিশ্বের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে তবুও জনবিরোধী হঠকারী চক্র উন্মুক্ত আচরণ অনুসরণ করে চলছে। রোজ পাকিস্তান থেকে সমরাস্ত্র ও সামরিক কর্মচারীদের আনা হচ্ছে। রংপুর ও রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন চলছে। শাসকচক্র শুধুমাত্র হত্যার শক্তি গড়ে তুলেই পরিতৃপ্ত হচ্ছে না, অধিকন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছে। দেশে ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে। সমরসজ্জা গড়ে তুলে একটা জরুরি অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট জাতিসংঘ কর্মচরীদের অপসারণের অনুমতি দিয়েছিল এবং এতে করে বাংলাদেশে বসবাসকারীদের জান ও মাল সামরিক শক্তি যে বিপজ্জনক করে তুলেছে, তা তিনি স্বীকার করে নিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর অনুধাবন করা উচিত যে, শুধুমাত্র জাতিসংঘ কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কারণ আজকে যে হুমকি দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে গণহত্যার হুমকি, জাতিসংঘ অনুযায়ী স্বীকৃত বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের হুমকি।' (দৈনিক পাকিস্তান, ১১ মার্চ ১৯৭১) ১১ মার্চ সিএসপি ও ইপিসিএস সমিতির পদস্থ বাঙালি সরকারি কর্মচারীরা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জনান। ১৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরো একটি বিবৃতি প্রচার

করেন। 'বাংলাদেশের মুক্তির উদ্দীপনা নিভিয়ে দেওয়া যাবে না, আমাদের পরাজিত করা যাবে না। কারণ আামাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বাধীন হয়ে এবং মর্যাদার সাথে বাস করতে পারে তার নিরাপত্তা বিধান করার জন্য আমরা প্রত্যেকে প্রয়োজন হলে মরতেও কৃতসংকল্প। অতএব আমাদের মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। যেকোনো ত্যাগের জন্য তৈরি হয়ে থাকতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে সম্ভাব্য সর্বোপায়ে তা প্রতিহত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' (দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ মার্চ ১৯৭১)

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বাহিনীর প্রায় সমুদয় জেনারেলকে নিয়ে কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকা আগমন করেন।

১৬ মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট হাউসে কড়া সামরিক প্রহরায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনার প্রহসন শুরু হয়। এই আলোচনার ছলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান বাহিনীর ঝানু জেনারেলদের নিয়ে আসন্ন সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে থাকেন, অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলনও পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। প্রতিদিন অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো প্রকার আপসের বিরুদ্ধে অবিরাম আওয়াজ তুলতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কর গ্রহণ করতে শুরু করে। সামরিক বাহিনীর নির্যাতনও অব্যাহত থাকে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, জোহা হল, মুন্নুজান হল, যশোর ও রংপুর সেনানিবাস এলাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা পিলখানা, ফার্মগেট, রামপুরা, কচুক্ষেত এলাকায় অসহযোগ আন্দোলনকারীদের ওপর নির্যাতন চলানো হয়, মা-বোনেরাও রক্ষা পাননি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্যাতন থেকে।

১৭ মার্চ পুনরায় ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনা হয়। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। ওই দিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন–

'আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। এই দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই-বা কী, আর মৃত্যুদিনই বা কী? এ দেশের জনগণের কাছে জন্মের আজ নেই কোনো মহিমা। যখনই কারো ইচ্ছা হলো আমাদের প্রাণ দিতে হয়। বাংলাদেশের জনগণের জীবনের কোনো নিরাপত্তাই তারা রাখেনি। জনগণ আজ মৃতপ্রায়। আমার আবার জন্মদিন কী? আমার জীবন নিবেদিত জনগণের জন্য। আমি যে তাদেরই লোক।' (দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ মার্চ ১৯৭১)

১৮ মার্চ 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের সমর্থন কামনা করা হয়। ওই বিবৃতিতে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি শক্তির প্রতি তাদের সরবরাহকৃত অস্ত্রের দ্বারা বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালানোর প্রয়াস বন্ধ করারও আবেদন জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক সমিতি ওই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে অসংখ্য তারবার্তা প্রেরণ করে।

১৯ মার্চ ঢাকার জয়দেবপুর এবং গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বনাম জনসাধারণ ও বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। ওই এলাকায় জনসাধারণ পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল বন্ধ করার জন্য অসংখ্য ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। কারফিউ জারি এবং ওই সব ব্যারিকেড তুলে ফেলার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বেধে যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ওই এলাকায় বেশ কয়েকবার গুলিবর্ষণ করে, গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি ঢুকে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে নির্যাতন করে, ফলে বহু হতাহত হয়। টঙ্গী এলাকাও সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়। সেদিন জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নটি অবস্থিত ছিল। ১ মার্চ জয়দেবপুরে বাঙালিদের ওপরে গুলি চালানোর জন্য ৫৭ নং ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জাহান জাব আরবার দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে আদেশ দিলে বাঙালি জোয়ান ও অফিসাররা সেই আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করে। তারপর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পাকিস্তানিদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এই ব্যাটালিয়নের বাঙালি জোয়ান ও অফিসারদের এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন মেজর সফিউল্লাহ (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অভ স্টাফ মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ)। জয়দেবপুরের ঘটনা টঙ্গী শিল্প এলাকা এবং ঢাকাতে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, বিশেষত দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার প্রয়াস এবং গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বাঙালি কর্মচারী ও জনসাধারণের হাত থেকে পাকবাহিনীর দখলের চেষ্টার খবরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বস্তুত ১৯ মার্চ গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বাঙালি কর্মচারীবৃন্দ জয়দেবপুর চৌরাস্তা ও আশপাশের গ্রামবাসী, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি জোয়ান ও অফিসারগণ এবং টঙ্গী শিল্প এলাকার শ্রমিকবৃন্দ শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যেভাবে লড়েছিল, তাকে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা বলা চলে। পাকবাহিনীর গুলিতে এ ঘটনায় হুরমত, নিয়ামত ও মনু খলিফা শহিদ হন।

১৯ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের তৃতীয় দফা বৈঠক হয়। শেখ সাহেব ১৯ মার্চ জয়দেবপুর ও টঙ্গী এলাকায় পাকবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'তারা যদি মনে করে থাকে যে বুলেট ও শক্তির জনগণের সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখা যায়, তাহলে তারা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছে–জনগণ যখন রক্ত দিতে তৈরি হয়, তখন তাদের দমন করতে পারে–এমন শক্তি দুনিয়ায় নেই।'

২০ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, মনসুর আলী, কামারুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ১৩০ মিনিট কাল স্থায়ী এক বৈঠকে এবং ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ৯০ মিনিট কাল আরেকটি বৈঠকে মিলিত হন। এরই ফাঁকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, জেনারেল মিঠ্ঠা প্রভৃতিকে নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিচ্ছিলেন। প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পিআইএ ফাইট

বোয়িং-৭০৭ বিমানযোগে সৈন্য ও রসদ নিয়ে সিংহল হয়ে ঢাকায় এবং কয়েকটি জাহাজ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসছিল। মার্চের শুরুতে গোলযোগ শুরু হওয়ার সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তান স্থলবাহিনীর শক্তি মাত্র এক ডিভিশনে সীমাবদ্ধ ছিল; ইতোমধ্যেই সে শক্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা হয়েছিল এবং ক্রমাগত তা আরো বৃদ্ধি এবং চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি করা হচ্ছিল। ২১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মিলিত হওয়ার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো ১২ জন উপদেষ্টা নিয়ে কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকা আগমন করেন।

২২ মার্চ ঢাকার সমস্ত সংবাদপত্রে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নির্ধারিত 'স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার' রঙিন প্রতিকৃতি প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় এবং ২৩ মার্চ তথাকথিত 'পাকিস্তান দিবসে' বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে ওই পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানানো হয়। ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নং ধানমণ্ডি রোডের বাসভবনে অগণিত শোভাযাত্রার স্রোত প্রবাহিত হয়। প্রতিটি শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। তিনি তাদের বলেন, 'আমার রক্ত দিয়ে আমি আপনাদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করব।'

২২ মার্চ ইয়াহিয়া-শেখ-ভুট্টোর ৭৫ মিনিট কাল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২৩ মার্চ বাংলাদেশের সর্বত্র, প্রতিটি গৃহে, প্রতিটি যানবাহনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়। সমস্ত বাংলাদেশে কালো পতাকা আর সোনার বাংলা পতাকা–এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য এ দেশের আর কখনো দেখা যায়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনেও সেদিন 'স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় শ্রমিক পরিষদের' নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। ২৩ মার্চ ঢাকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল 'জয় বাংলা বাহিনী'র কুচকাওয়াজ। রেকর্ডে জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' বাজানো হয়। জয় বাংলা বাহিনীর ১০টি প্লাটুন ও একটি ব্যাণ্ড প্লাটুন ছিল। কুচকাওয়াজ ও মহড়ার পরে এই বাহিনী মার্চ করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে গমন করে, সেখানে বঙ্গবন্ধু তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।

২৪ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সঙ্গে দুই ঘণ্টা স্থায়ী এই সভায় মিলিত হন। ২৪ মার্চেও যখন আওয়ামী লীগ নেতারা সংকট নিরসনের জন্য শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, ঢাকার মিরপুরে পাকবাহিনীর ইঙ্গিতে অবাঙালিরা সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় বাঙালি নিধন অভিযান শুরু করে দিয়েছে। হত্যা, লুণ্ঠন, লুটতরাজ, ধর্ষণ বস্তুতপক্ষে অবাঙালিরা ২৪ মার্চ থেকেই আরম্ভ করে দেয়, ফলে প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বাঙালির জানমাল বিনষ্ট হয়। ঢাকায় শেখ মুজিবের বাসভবনে সেদিনও বিক্ষুব্ধ জঙ্গি মিছিলের স্রোত। তাদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সাথে– শহিদের রক্তের সাথে আমি বেইমানি করতে পারব না। আমি কঠোরতর সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকব কি না, জানি না। দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।'

২৫ মার্চেও জনসাধারণের সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ২৫ মার্চ শেষ আশা ছিল একটা কিছু সমঝোতা হবে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, 'আর আলোচনা নয়, এবারে সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর বৈঠকের পর ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক'। সাংবাদিকরা ছুটে এলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে, তাঁকে বললেন ভুট্টোর বক্তব্য। শুনে বঙ্গবন্ধু গম্ভীর হয়ে গেলেন, আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। শেখ সাহেবের বাসভবনে দেশি ও বিদেশি অসংখ্য সাংবাদিক। একজন খবর নিয়ে এলেন, ইয়াহিয়া খান সাদা পোশাকে প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করে বিমানবন্দর বা ক্যান্টনমেন্টের দিকে গিয়েছেন। এই সময় একটা বোয়িং বিমান ঢাকা ছেড়ে করাচির উদ্দেশে চলে গেল, ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে গেলেন। যাওয়ার সময় সেনাবাহিনীকে চরম আদেশ দিয়ে গেলেন। শেখ সাহেবের কাছে খবর এলো সৈয়দপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য স্থানে অবাঙালিদের দিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করা হচ্ছে। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমি সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরে সামরিক অভিযানের সংবাদ জানতে পেরে মর্মাহত হয়েছি। বেসামরিক জনসাধারণের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের সংবাদ আসছে, পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকেও প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের সংবাদ আসছে। এসব কিছুই যখন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ঢাকায় আমি তাকে অবিলম্বে ওই রূপ সামরিক অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এটা জেনে রাখা উচিত যে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা ও বর্বরতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেওয়া হবে না। আমার আস্থা আছে যে 'বাংলাদেশের সাহসী সন্তানরা'। তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য, অর্থাৎ 'বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য' সর্বপ্রকার পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত। (ঢাকা টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র সংবাদ বুলেটিন, সান্ধ্য অধিবেশন ২৫ মার্চ ১৯৭১)

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান একাত্তর সালের ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালি নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ধাপ্পা দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫ মার্চ দিন শেষে বিশ্বের নৃশংসতম গণহত্যা অভিযান শুরু করে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও তাঁর অনুসারী হন। ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। তার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়্যারলেসযোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, শুরু হয়ে যায় '৭১-এর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৯)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

পঞ্চাশ বছরের পথে বাংলাদেশ

মুনতাসীর মামুন

২৫ মার্চের পটভূমিতে আসে ২৬ মার্চ। বঙ্গবন্ধু জানতেন, পাকিস্তানিরা সময়ক্ষেপণ করেছে এবং বাঙালিদের দমনের জন্য রক্তপাত ঘটাবে। সেই প্রস্তুতি থাকার কারণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিলেন। ২৬ মার্চ রাতে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা সাংবাদিক আতাউস সামাদের। তিনি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা দিলাম। এবার তাকে রক্ষা করো।' এরপর ২৫ মার্চ রাতে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন– '...তারা অতর্কিতে ২৫ মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে।'

পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এ পরিপ্রেক্ষিতে যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' ঘোষণা করে। তাতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।' বিচারপতি খায়রুল হকের (২০০৯) রায়ে এটি স্বীকৃত এবং বর্তমান সংবিধানের উপক্রমণিকায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই ভূমিকা দেওয়ার দরকার ছিল না; কিন্তু দিলাম এক কারণে। কয়েক দিন আগেও এক পাঠক আমার কাছে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য খালেদা জিয়া ও মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত নিজামী [সরকার] 'স্বাধীনতার দলিলপত্র'ও সংশোধন করেছিল। বাংলাদেশের গণপরিষদ, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানের উপক্রমণিকায় তার অন্তর্ভুক্তির পর এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিতর্ক আসার এবং এ

বিষয়ে যিনিই প্রশ্ন তুলবেন, ধরে নিতে হবে তিনি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কর্তৃক প্রভাবিত বা নিযুক্ত এজেন্ট এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। আজকের জেনারেশনের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ কী ছিল? সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তার ওপর ছিল অন্নের অভাব। এখানেই শেষ নয়, আমেরিকা, চীন, সৌদি আরব থেকে শুরু করে শক্তিশালীদের একটি অংশ ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। কিন্তু এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অবকাঠামো গড়ার কাজ হাতে নিয়েছেন। আজ যেসব আইন দেখি, বিভিন্ন করপোরেশন, এমনকি সমুদ্র ও স্থলবিষয়ক আইন/সিদ্ধান্ত সব বঙ্গবন্ধুর আমলে নেওয়া। আজ পঞ্চাশে পৌঁছাবার উপান্তেও তাঁকে স্মরণ করতে হয়। বর্তমানে পাকিস্তান রাজনীতির ধারার একজন নেতা মওদুদ আহমদ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না– 'শেখ মুজিব ছিলেন সেই ব্যক্তি, জীবনব্যাপী যিনি এই জাতির স্বার্থে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, বিরাজ করেছিলেন এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসেবে। তিনি ছিলেন সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক, যা এক সর্বব্যাপী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সোপান রচনা করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যতই পরিবর্তন আসুক না কেন, তার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পটপরিবর্তনের যত লীলাখেলাই চলুক না কেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধানতম নেতার আসন থেকে শেখ মুজিবকে বিচ্যুত করা সম্ভব হবে না। সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র বা নব্য মৌলবাদ, যেটাই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোতে ভিত গেড়ে বসুক না কেন, বা এ দেশে যত বিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল সরকারই ক্ষমতায় আরোহণ করুক না কেন, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ চিরদিন শেখ মুজিবের কীর্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে থাকবে।'

১৯৭৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়টুকুকে আমরা সাধারণত অন্ধকার বা পাকিস্তানীকরণের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করি। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার আমলটুকু ছিল এর ব্যতিক্রম। কেননা তিনি এই যুগ অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাঁর বিষময় রাজনীতির ফলাফল শুধু তাঁর পরিবার নয়, দেশের মানুষও ভোগ করছে। জাতিকে তিনি বিভক্ত করে গিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিতদের উত্থান এবং সে রাজনীতি এরশাদ থেকে শুরু করে খালেদা-নিজামীও করে গেছেন। তাঁদের প্রায় তিন যুগের শাসন কমপক্ষে তিনটি জেনারেশনকে বিপথে নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তি হবে ২০২১ সালে। যদি ২০০৮ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না আসতেন এবং পাকিস্তানি এজেন্টদের শাসন অব্যাহত থাকত তাহলে ২০২১ সালে তারা ঘোষণা করত, পাকিস্তানের প্রত্যাবর্তন আমাদের সফল হয়েছে।

আমাদের রাজনীতি সফল। কিন্তু সেটি হয়নি। শেখ হাসিনার অব্যাহত এক যুগের শাসন বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে। জাতির পিতার ১০০ বছর পূর্ণ হবে আগামী বছর এবং সে বছরকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ সাল থেকে বাংলা *মুক্তিসন ঘোষণা* করা হোক। বাংলা সনের সঙ্গে একই সঙ্গে এই *মুক্তিসন* চলতে পারে। ২০২১ সাল হবে ৫০ *মুক্তিসন* [মুক্তিসন বেশ কয়েকজন লেখা শুরু করেছেন]। কূটনীতিবিদ মাহবুবুল আলমও আমাকে এ প্রস্তাবের পরামর্শ দিয়েছেন।

যে অন্ধকার ইতিহাসের কথা বললাম তার বিবরণ লিখতে গেলে একটি বই লিখতে হবে। আমাদের জেনারেশনের অনেকে অন্তত শেষবারের মতো হলেও শেখ হাসিনাকে এবার ক্ষমতায় দেখতে চেয়েছিলাম, যাতে বঙ্গবন্ধুকন্যা তাঁর দেশের মুক্তিসন থেকে ৫০ মুক্তিসন গৌরবের সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে পারেন। আমাদের কাছে বিষয়টি ছিল অন্যরকম। আমাদের পক্ষে এ রকম দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী পাকিস্তানি দলকে সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। বিএনপির গত প্রায় চার দশকের ইতিহাস হচ্ছে দুর্নীতি-সন্ত্রাস-জুলুমের ইতিহাস। বাংলাদেশের মূল স্পিরিটের বিরোধী একটি ইতিহাস। পাকিস্তানীকরণের ইতিহাস। খুঁটিনাটি উদাহরণ দিতে গেলে কয়েক পাতা খরচ হবে।

জিয়া জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সেই থেকে খালেদা জিয়া পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন নষ্ট করতে চেয়েছে বিএনপি-জামায়াত; এমনকি রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে তাঁকে হত্যাও করতে চেয়েছে। এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর কিছু হতে পারে না।

সবচেয়ে অভব্য কর্মটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মিথ্যাচার এবং ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে খালেদা জিয়ার জন্মদিনের পার্টি ও ঘটা করে কেক কাটা। কোনো সভ্য মহিলা এ ধরনের কাণ্ড করেছে রাজনীতিতে এটি এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি।

মানুষ তাই বিশ্বাস করেছে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে এসবই করবে এবং জামায়াতের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের সব অর্জন শুধু বিসর্জনই নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে ফেডারেশনও করতে পারে। কে আর দেশে অস্থিতিশীলতা চায়? নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে কি কেউ অনুন্নয়ন চায় বা বিদ্যুতের বদলে হারিকেন চায়?

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'মুক্তির সংগ্রাম'; চেয়েছিলেন 'সোনার বাংলা'। দুর্বৃত্তায়নে আর যতই হোক মুক্তি আসে না। সোনার বাংলাও আসে না। কিন্তু গত এক যুগ সে পথেই এগোচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে বাংলাদেশের ৫০ বছর যখন পৌঁছাবে তখন দেশের চেহারা অনেকটা বদলে যাবে। এ পরিবর্তনটা আমরা বরং বেশি বুঝি– কারণ, পাকিস্তানের কলোনি আমল আমরা দেখেছি, ১৯৭১ সালের বিধ্বস্ত বাংলাদেশ দেখেছি, ১৯৭৫ থেকে অন্ধকার যুগের বাংলাদেশ আমরা দেখেছি। বঙ্গবন্ধু যে ভিত গড়ে দিয়েছিলেন, শেখ হাসিনা সেই ভিত্তিকে মজবুত করে ৫০ বছরের বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছেন।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রথম ক্ষমতায় আসেন। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের পর জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ২০০১-২০০৪-এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতার নীতি ত্যাগ করা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকারের এত অবনতি আর কখনো হয়নি। সেই অন্ধকার যুগে খালেদা-নিজামীরা যে কাজটি করেছিলেন গণতন্ত্রের নামে– তা হলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বদলে দেওয়া এবং ১৯৪৭ সালকে ১৯৭৫ সালের সঙ্গে যুক্ত করা। পাকিস্তানি মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য আবার তারা ফিরিয়ে এনেছিল, ঘোষণা করা হয়েছিল আওয়ামী লীগ ভারতের দালাল, অর্থাৎ হিন্দুদের দালাল, অর্থাৎ এরা ধর্মবিরোধী। শুধু তা-ই নয়, আওয়ামী লীগ বা সেক্যুলারপন্থিদের দমনের জন্য ফ্রন্ট হিসেব জঙ্গিদের সৃষ্টি করা হয়েছে সুচতুরভাবে। সরকারি উদ্যোগে হিটলারের আমলে এ ধরনের ঘটনা ঘটত।

ওই পাঁচ বছরে তারা যা করেছিল, তাতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা দলের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হতো; কিন্তু শেখ হাসিনা দলকে ধরে রেখেছিলেন, নিজেও টিকে ছিলেন স্রেফ আদর্শের জোরে। অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক শাসকরাও তাঁকে দমাতে পারেননি।

সোনার বাংলা গড়তে সময় লাগবে; কিন্তু শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দেখা সোনার বাংলার ভিতটা গড়ে দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন– যখন স্বাধীন হই তখন আমাদের গড় আয়ু ছিল ৩৬ বছর। এখন গড় আয়ু ৭২। যখন স্বাধীন হই তখন মাথাপিছু আয় ছিল কয়েক শ ডলার। এখন তা দুই হাজার ছুঁইছুঁই। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা খুব সম্ভব ৯৩ ভাগ। শিশুদের টিকা দেওয়া হচ্ছে ১০০ ভাগ। প্রসূতিমৃত্যু দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে বাংলাদেশে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারীদের অর্থনৈতিক অর্জনে বাংলাদেশ প্রথম। বস্ত্র রফতানিতে বিশ্বে বাংলাদেশ দ্বিতীয়, মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, ছাগ মাংস উৎপাদনে পঞ্চম, চামড়া রপ্তানিতে সপ্তম, আলু উৎপাদনে সপ্তম, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, বাইসাইকেল রপ্তানিতে সপ্তম, পাট রপ্তানিতে প্রথম, ফসলের জাত উৎপাদনে শীর্ষে, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় ইত্যাদি। ১৯৭১ সালে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, এখন জমির পরিমাণ ১৯৭১ সাল থেকে কমপক্ষে ২০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামে নগরায়ণের ছোঁয়া লেগেছে। প্রতিটি এলাকা একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত। গাড়ির ভিড়ে ঢাকায় হাঁটা যায় না। পদ্মা সেতু হয়ে গেল। মেট্রো রেল হচ্ছে। পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর হচ্ছে। পরমাণু শক্তির প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ চার লেন সড়ক হয়েছে। মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালীর পরিধি বেড়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বিস্ময়করভাবে। উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। হাসিনা আমলে উন্নয়নের ফিরিস্তি দিতে গেলে একটি বই লিখতে হবে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিছু কাজ শুরুও করেছিলেন। ঘাতকদের কারণে কাজ শেষ করতে পারেননি। তিনি সোনার

বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর কন্যা জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ জয় করেছেন। তিনি বাংলাদেশের স্থল ও জলসীমা চিরদিনের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আকাশে স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বলব, গত ১০ বছরে শেখ হাসিনা যা করেছেন, বাংলাদেশকে অনুন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করেছেন, গত কয়েক শ বছরে আর কোনো নেতা তা করতে পারেননি। আরেকটি সুখবর। কয়েক দিন আগে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ভারতীয় পার্লামেন্টে বলেছেন, বাংলাদেশে গত এক দশকে হিন্দুদের সংখ্যা ৮ থেকে ১০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল। এর অর্থ শেখ হাসিনার আমলে সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে নিরাপদ।

শেখ হাসিনার সবচেয়ে বড়ো অবদান, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করা, যা এখনো চলছে। পৃথিবীতে এই প্রথম অভ্যন্তরীণ আইনে আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার হচ্ছে। এশিয়ার দু-একটি দেশে এক যুগ আগে এ ধরনের বিচার শুরু হলেও দু-একজনের বেশি কারো বিচারকাজ সম্পন্ন হয়নি। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ৩০ জনেরও বেশি অপরাধীর বিচার হয়েছে। জঙ্গি-মৌলবাদীরা দমিত। সবচেয়ে বড়ো কথা পাকিস্তানীকরণ প্রতিরোধ। শেষ কাজটি হবে একসময়ের শত্রু দেশের রাজনীতি এখানে লুপ্ত করা। ৫০ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে ফেরা বোধহয় সম্ভব হবে। আর কিছু না হোক আমরা এমন বাংলাদেশ দেখে যাব, যা ১৯৭১ সালে আমরা কল্পনাও করিনি। জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু! ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

স্বাধীনতা মানে কী?

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

১৯১১-তে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা গোখেলকে প্রশ্ন করেন, ইংরেজরা ভারতের অনেক উন্নতি করিয়ে দিলেও ভারতীয়রা স্বাধীনতা চায় কেন? গোখেলের ঝটপট উত্তর ছিল–ভারতীয়রা স্বাধীন হয়ে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অর্থাৎ গোখেলের বিবেচনায় স্বাধীনতা আত্মমর্যাদার সমার্থক ছিল।

কবি শামসুর রাহমানের পঙ্‌ক্তি আছে– 'স্বাধীনতা মানে ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।' বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখানে স্বাধীনতা বলতে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

খ্যাতকীর্তি মার্কিন ইতিহাসবিদ হানাহ আরেনডেট (Hannah Arendt)-এর একটি সাড়াজাগানো প্রবন্ধ আছে, যার শিরোনাম 'Freedom'। প্রবন্ধটির একটি নজরকাড়া বাক্য হলো, স্বাধীনতা মানে দায়িত্ব (Freedom means responsibility)। স্বাধীন সত্তায় বিকশিত হওয়া দায়িত্বই তো বটে, বিশেষ করে স্বাধীন জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের জন্য।

স্বাধীনতার তিনটি নির্দেশিত মানে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতার মানে এবং তার স্থিতিপত্র তৈরি করা যায়। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন মানে শুধু অনুষ্ঠানসর্বস্বতা নয়, বা নয় আবেগে উদ্বেলিত হওয়া; স্বাধীনতার উদ্‌যাপন মানে মনের গহিনে স্বাধীনতার একটি স্থিতিপত্রও তৈরি করে নেওয়া। উল্লেখ্য, বছর বছর এমন স্থিতিপত্র তৈরি করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মানে পরিস্ফুট হবে। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারব স্বাধীনতার মানে অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছি কি না। অবশ্য আমরা কজন তা করি বা কেউ আদৌ তা করে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে; কিন্তু মনে হয় তা করা উচিত। কারণ, তা না হলে স্বাধীনতাকে ঘিরে প্রত্যাশা-প্রাপ্তির সমীকরণ হয় না।

অবশ্য এমন স্বাধীনতার মানে প্রত্যাশী স্থিতিপত্র তৈরি করতে হলে আমাদের হতে হয় কিংবদন্তির রোমক দেবতা জেনাসের মতো। জানা আছে, জেনাসের দুটো মুখ আর চারটি চোখ ছিল। ফলে সে সামনে-পেছনে উভয় দিকেই দেখতে পেত। অবয়বে আমরা জেনাস হতে পারব না; কিন্তু মানসিকভাবে পারি। মনের চোখ সামনে-পেছনে ছড়িয়ে অতীত-বর্তমানের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে পারি; এমনকি ভবিষ্যৎও ভেবে নিতে পারি।

তাহলে এবার আসা যাক স্থিতিপত্রের প্রথম খাতের কথায়; যা হলো আত্মমর্যাদা। বহুশ্রুত কবির পঙ্‌ক্তি আছে, 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় বলো'। স্বাধীনতাহীনতায় বাঁচা মানে মর্যাদাহীন বাঁচা। ব্যক্তিগতভাবেই হোক আর

সমষ্টিগতভাবেই হোক, স্বাধীন সত্তা তাই পরম কাঙ্ক্ষিত। উভয় পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রত্যাশার রূপায়ণ প্রক্রিয়াকে বলে আত্মঅধিকার (self-determination) প্রতিষ্ঠা। '৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণে যখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাঙালিকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না' তখন বাঙালির আত্মঅধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তা নিহিত ছিল। আর আত্মঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি ছিল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করে

সাবাস বাংলাদেশ,
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়,
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার,
তবুও মাথা নোয়াবার নয়।

আমরা মাথা নোয়াইনি; শত্রু হননের সাফল্যে মাথা তুলে মেরুদণ্ড সোজা করে স্বাধীনতাকে নির্বিঘ্ন করে বিশ্বের বুকে স্থান করে নিয়েছি। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে কবি সুকান্ত বাঙালির চিরদ্রোহী সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করে। মুক্তিযুদ্ধ যে আমাদের দ্রোহী সত্তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, তা বলার জন্য কোনো যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বলাই বাহুল্য, বাঙালির দ্রোহী সত্তা ভাষিক জাতীয়তাবাদের পাটাতনে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে এক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব নির্মাণ করেছে। এই রাষ্ট্রই বাঙালির আত্মমর্যাদার সূচক। স্বাধীনতা আমাদের অর্জন। স্বাধীনতার সংরক্ষণ আমাদের কৃতিত্ব।

বিগত সাড়ে চার দশকে এই অর্জন ও কৃতিত্বে কি কোনো সংযোজন হয়েছে? একাধিক সূচকের ভিত্তিতে আমাদের নির্দ্বিধ উচ্চারণ হতে পারে যে, আমাদের সংযোজন অনেক। বাহাত্তরের ধ্বংসস্তূপ বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে থাকা দেশের নাম। আমাদের অনেক ব্যর্থতা আছে, আছে বিচ্যুতিও। তবু বাংলাদেশ এখন নানা কারণে তৃতীয় দুনিয়ার এক মডেল দেশ।

কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতার অনেক মানে তুলে ধরা হয়েছে। তবে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে যে মানে আছে তা অর্থনৈতিক মুক্তির। স্মর্তব্য, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে মুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে একাধিকবার; স্বাধীনতার প্রসঙ্গ মাত্র একবার। তবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মুক্তির সোপান রচিত হয়। আর বঙ্গবন্ধু সার্বিক মুক্তির নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যা অর্জিত হবে স্বাধীন বাংলাদেশে। সেই কারণে বলা চলে যে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর; আর মুক্তির যুদ্ধ শুরু হয়েছে '৭১-এর ১৭ ডিসেম্বর থেকে, যা আজও চলমান। মুক্তির এই যুদ্ধ অনিঃশেষ, চলে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত। অবশ্য চূড়ান্ত মুক্তি অর্জন কোনো দেশে বা ব্যবস্থায় সম্ভব হয়নি; কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল থাকাটাই আসল কথা। মুক্তির লক্ষ্যহীন স্বাধীনতা অন্য কথায় স্বাধীনতার প্রহসন বৈ আর কিছু নয়। সুতরাং বাংলাদেশে সার্বিক মুক্তির যে যুদ্ধ চলমান, তা অব্যাহত থাকবে যত দিন না লক্ষ্য অর্জিত হয়। এই যুদ্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের সাফল্য আছে, আছে ব্যর্থতাও। অবশ্য ব্যর্থতার অর্থ হলো, আমরা যা অর্জন করতে পারিনি; কিন্তু যা অর্জন করা উচিত ছিল বা যা অর্জন করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

আর্থসামাজিক অঙ্গনে যে সাফল্যসমূহ আমাদের শ্লাঘা ও বিশ্বের বিস্ময়ের কারণ তার সূচনা হয় চরম প্রতিকূল পরিবেশে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর ধ্বংসস্তূপ বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে একজন ড. হেনরি কিসিঞ্জারের তির্যক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি (bottomless basket)। ড. কিসিঞ্জার কাগুজে কূটনীতিক হিসেবে খ্যাতকীর্তি ছিলেন, কিন্তু বাস্তবে নয়। কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয় রুখে দেওয়ার বাস্তব কূটনীতিতে তিনি ব্যর্থ ছিলেন। আর যা হোক, তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন না। তার প্রমাণ আর্থসামাজিক খাতে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলা আজকের বাংলাদেশ। অনস্বীকার্য, শুরুতে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু আজ বাংলাদেশ নামের ঝুড়িটির শক্ত তলা হয়েছে। উপরন্তু ঝুড়িটি কানায় কানায় পূর্ণ না হলেও তা করার আয়োজন-উদ্যোগের কমতি নেই; এবং যা পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির মোড়ল বিশ্বব্যাংকেরও নজর কেড়েছে।

অবশ্য উল্লেখ্য, বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে চিরদিন রেখে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভাব ছিল না বা এখনো নেই। তবু বাংলাদেশ তার স্বীয়তানির্ভর (autonomy-based) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছে। স্মর্তব্য, স্বাধীনতারপর ষড়যন্ত্রের কারণে বিগত শতকের ষাট-সত্তর দশকে আফ্রিকীয় সমাজতন্ত্র (African Socialism) ব্যর্থ হয়। আফ্রিকার নিজস্ব ধাঁচের এই সমাজতন্ত্র টিকে থাকলে আফ্রিকার দেশগুলো আজ অনেক এগিয়ে যেতে পারত; কিন্তু বিপরীতে বাংলাদেশকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আজ বাংলাদেশ অন্তত আর্থসামাজিক মানদণ্ডে ঘুরে দাঁড়ানো এক বিস্ময়কর দেশ; এবং এ ক্ষেত্রে অনেক দিক দিয়ে দেশটি ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে।

অবশ্য আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধি (growth) ও প্রগতির (progress) মানে এই নয় যে আমরা মুক্তির (liberation) চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করেছি। আমাদের প্রত্যাশা-প্রাপ্তির মধ্যে এখনো বিরাজমান দুস্তর ব্যবধান। আপাতদৃষ্টিতে ধনীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান; আর সেই কারণে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানও ক্রমবর্ধমান, যা সামাজিক অস্থিরতার কারণ। লক্ষণীয়, সামাজিক অপরাধ সূচকের ঊর্ধ্বগতি। উপরন্তু আছে শহর আর গ্রামের বৈষম্য। আছে কর্মসংস্থানের ঘাটতি ও বেকার সমস্যা। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তার একটি জায়গায় বলেন, 'দেশের মানুষ যদি খেতে না পায়, বেকার যুবক যদি চাকরি না পায় তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে।' দেশের মানুষ এখন খেতে পায়, কারণ বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ নয়। গণদারিদ্র্যের হারও কমেছে। কিন্তু বেকারত্ব সমস্যার আশানুরূপ সমাধান এখনো হয়নি। উদ্যোগ আছে, সময়ের ব্যবধানে সাফল্য অনিবার্য।

এবার স্বাধীনতার মানে নিয়ে সর্বশেষ প্রসঙ্গে আসা যাক। স্বাধীনতার প্রতি আমরা কতটুকু দায়িত্বশীল ছিলাম বা আছি? এত দিনের যা অর্জন তাতে নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত আমাদের দায়িত্বশীলতা। অন্যদিকে যা কিছু অর্জন করতে পারিনি,

তা আমাদের দায়িত্বহীনতার প্রতীক। অবশ্য দায়িত্বহীনতা প্রসঙ্গে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা একটি বিবেচ্য অনুষঙ্গ। ধরা যাক, গণতন্ত্রের কথা। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের আট হাজার আটশত তিরাশি দিনে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত ছিলাম। আর এই কারণে গণতন্ত্রের প্রতি এক ধরনের কাঠামোগত অঙ্গীকার (structural commitment) নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। বাহাত্তরের সংবিধান গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারের প্রতীক। কিন্তু তারপর গণতন্ত্র যেন মরুপথে হারানো নদীর ধারার মতো হয়ে গেল। যা অকল্পনীয় ছিল বা যা ছিল পাকিস্তানি ঐতিহ্য সেই সামরিক শাসন এবং প্রকারান্তরে সামরিক শাসন বাংলাদেশের ওপর চেপে বসল, থাকল একানব্বই পর্যন্ত। প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সামরিক স্বৈরাচার পিছু হটে; গণতন্ত্র-মুক্তির দরজাও উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এখন পেছন ফিরে দেখে যদি প্রশ্ন করি, গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে কি? উত্তরটি মিশ্র হতে বাধ্য। কারণ আমরা গণতন্ত্রের পথে এগিয়েছি, কিন্তু গন্তব্য এখনো বহুদূর। জানা কথা, গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; গণতন্ত্র স্বল্প সময়ে বা রাতারাতি হয় না। কোথাও তা হয়নি। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদের ভূমিকা আংশিক। ভূমিকার সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে উদ্যোগ অব্যাহত আছে। সুতরাং আছে আশাবাদও। তবে যত দিন চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত না হচ্ছে, তত দিন বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক না বলে গণতন্ত্রায়নের রাষ্ট্র বলা যৌক্তিক। ❐

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

ভালোবাসার বাংলাদেশ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সিদ্দিক সালিক। তাঁর লেখা 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইটিতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি এভাবে লিখেছেন : 'জেনারেল টিক্কা খানের হেডকোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তেজোদ্দীপ্ত স্লোগান শুনতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণের মাঝেই সেই 'জয় বাংলা' স্লোগান ছাপিয়ে রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে আসে। তারপর আসে অটোমেটিক রাইফেলের কর্কশ শব্দ, সর্বশেষে থেমে থেমে লাইট মেশিনগানের আওয়াজ। পনেরো মিনিট পর মানুষের কলরব আর শোনা গেল না, স্লোগানও থেমে গেল। মারণাস্ত্রের কাছে দীপ্ত স্লোগান হার মেনেছে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী চার ঘণ্টা সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যটি দেখেছি। সেই ভয়ংকর রাত্রিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি ছিল আকাশছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখা, মাঝে মাঝেই কালো ধোঁয়া কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠছিল; কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের শিখা সেটাকে ছাপিয়ে মনে হচ্ছিল বুঝি আকাশের নক্ষত্রকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। আকাশের নক্ষত্রের আলো আর চাঁদের জোছনা সেই রাতে মানুষের তৈরি অগ্নিকুণ্ডের কাছে হার মেনে ছিল। মনে হলো বুঝি নরকের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।'

'সেই রাতে প্রথম বুলেটটি যখন গর্জে উঠেছিল তারপরপরই পাকিস্তান রেডিওর কাছাকাছি তরঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর আবছাভাবে শোনা যায়। সেটি নিশ্চয়ই আগে থেকে রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর–শেখ মুজিব সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।'

২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড আর ধ্বংসলীলা চলাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক একটি ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। বাংলাদেশ নামে সেই অসহায় শিশুটি তখন রক্ত ক্লেদে মাখা, হিংস্র পশুরা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে, তার চারপাশে বৈরী পরিবেশ, অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক। শুরু হলো সেই অসহায় নবজাতককে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম, শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের ইতিহাস ছিল এই দেশের মানুষের গভীর একটি আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল একটি অর্জনের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই গণযুদ্ধে এই দেশের মাটিতে যুদ্ধ করছে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, দেশের সেনাবাহিনী-পুলিশ, ইপিআর-আনসার, দেশের পাহাড়ি এবং আদিবাসী। মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ে কাপড় নেই, পায়ে জুতা নেই, পেটে খাবার নেই, হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই, এমনকি যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ পর্যন্ত নেই–সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বলে দিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে তাদের প্রশিক্ষণ! শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, তাদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ছিল দেশের

জন্য গভীর ভালোবাসা। সামনাসামনি যুদ্ধে যাওয়ার আগে যখন তারা অস্ত্র হাতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গায় তখন তাদের চোখে কেন পানি চলে আসে তারা বুঝতে পারে না।

যাঁরা স্বচক্ষে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন এবং যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁরা এখন একজন একজন করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আর কয়েক বছর পর তাঁদের কেউ হয়তো বেঁচে থাকবেন না। মুক্তিযুদ্ধটা তখন বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। কেউ যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবে তখন তারা হয়তো কিছু সংখ্যা উচ্চারণ করবে : ত্রিশ লক্ষ শহিদ, চার লক্ষ ধর্ষিতা নারী, এক কোটি শরণার্থী, সাড়ে তিন কোটি ঘরহারা মানুষ– যেকোনো হিসাবে সংখ্যাগুলো বিশাল, বিশেষ করে যখন পুরো ব্যাপারটি ঘটেছে মাত্র ৯ মাসে। লন্ডন টাইমস সঠিকভাবেই লিখেছিল, 'যদি রক্তের দামে স্বাধীনতা কিনতে হয় তাহলে বাংলাদেশ থেকে বেশি মূল্যে কেউ স্বাধীনতা কেনেনি!' 'রেপ অভ নানকিং'-এর লেখক আইরিশ চ্যাং তাঁর মাতৃভূমির হত্যাযজ্ঞের কাহিনি লিখে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। আইরিশ চ্যাংয়ের ভাষায় পৃথিবীতে নানকিং ছাড়া আর যে স্থানে ভয়ংকর রকম নারী ধর্ষণ হয়েছিল সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ।

কিন্তু এই সংখ্যাগুলো শুধু পরিসংখ্যানের জন্য সংখ্যা নয়, এর প্রতিটির পেছনে একটি করে হৃদয়বিদারক কাহিনি আছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে রাইফেলের কালো নলের দিকে একজন মানুষ যে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দৃষ্টি যে দেখেছে, সেটি কি কখনো তার স্মৃতিতে এতটুকু ম্লান হবে? ধর্ষণকালীন একটি মেয়ের আর্তচিৎকার যে শুনেছে সে কি সেটি কখনো ভুলতে পারবে? শরণার্থী শিবিরে মায়ের কোলে যে শিশুটি কলেরায় মারা গেছে সেই মা কি কখনো তার সন্তানের ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাবে? আজ থেকে এক-দুই দশক পর সেই দুঃসহ কাহিনিগুলো বলার মতো কেউ থাকবে না–এগুলো তখন শুধু তথ্য হিসেবে ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে আমাদের দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সেই দিনটি থেকে আনন্দের দিন আমাদের জীবনে কখনো আসেনি। একই রকম আনন্দের দিন ছিল ১৯৭২ সালের জানুয়ারির ১০ তারিখ, যেদিন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসেছিলেন। একটি মানুষ যে আসলে একটি দেশ হতে পারে, সেটি সেদিন পৃথিবীর মানুষ অবাক হয়ে দেখেছিল। স্বাধীনতারপর আমরা যখন আমাদের দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখছি তখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'এই দেশটি হচ্ছে তলাবিহীন ঝুড়ি'। অবাক হওয়ার কিছু নেই, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝে হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন অন্যতম, ক্রিস্টোফার হিচেনস তাঁর লেখা 'দ্য ট্রায়াল অভ কিসিঞ্জার' নামের বইটিতে এই মানুষটিকে বাংলাদেশের গণহত্যার একজন কারিগর হিসেবে বিচারের দাবি করেছেন!

অস্বীকার করার উপায় নেই দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের মূল্য আমাদের কম দিতে হয়নি, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হারানোতেও শেষ হয়নি, এই দেশে প্রায় দুই যুগ বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে মানুষটি এই দেশের সাথে

সমার্থক তাঁর অবদান না জেনে এই দেশে কয়েকটি প্রজন্ম বড়ো হয়েছে। আমাদের অনেক বড়ো সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বের কারণে জন্মশতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু আবার তাঁর স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়েছেন।

হেনরি কিসিঞ্জারকে ভুল প্রমাণ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। দরিদ্র দেশের উদাহরণ দিতে হলে এখন কেউ আমাদের দেশের উদাহরণ দেয় না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যখন নিজের দেশকে সুইজারল্যান্ড বানানোর স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর সাংসদরা তাঁকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেশ নিয়ে তাঁর দেশকে বাংলাদেশ তৈরি করার পরামর্শ দেন। আমাদের জিডিপি ভারতবর্ষের জিডিপিকে ছাড়িয়ে গেলে তাদের বুদ্ধিজীবীরা যখন মাথা চাপড়ান সেটি দেখে আমরা যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করি। শ্রীলঙ্কা বিপদগ্রস্ত হলে বাংলাদেশ তাদেরকেও বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে অর্থ সাহায্য করতে পারে। দুর্নীতির অপবাদ দিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যখন বাংলাদেশকে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বঙ্গবন্ধুকন্যা তখন তাদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরি করেছেন। তথাকথিত সভ্য দেশ যখন তাদের নিজ হাতে তৈরি শরণার্থীদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য তাদের সীমানায় কাঁটাতার আর বৈদ্যুতিক তার লাগিয়েছে তখন আমরা তেরো লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছি।

কিন্তু দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, সেটি সত্যি নয়। সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতিতে একটি ধস নেমেছে, আমরা এর মাঝেই তার ধাক্কা অনুভব করছি। করোনার কারণে অসংখ্য মানুষ দরিদ্র হয়েছে, তারা এখন তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতেই হিমশিম খাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা কিছু ব্যবসায়ীর দুর্নীতি। দরিদ্র মানুষগুলো অসহায়, কার কাছে যাবে বুঝতে পারে না। সরকারকে এখনই তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, সে জন্য সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে আছে।

সব কিছুর পরেও নিজ দেশকে নিয়ে গর্ব করার মতো আমরা অনেক কিছুই খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু একই সাথে এই কথাটিও সত্যি, শিক্ষা এবং গবেষণার মতো বড়ো কিছু বিষয় এখনো আমাদের কাছে অধরা রয়ে গেছে। স্কুল-কলেজের মুখস্থনির্ভর, পরীক্ষানির্ভর, কোচিংনির্ভর, গাইড বইনির্ভর নিরানন্দ লেখাপড়া পদ্ধতি পাল্টে আনন্দময় পরিবেশে সত্যিকারের সৃজনশীল লেখাপড়া শুরু করার প্রক্রিয়াটিও শুরু হয়েছে। আমরা তার সাফল্যটিও দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

শিক্ষা এবং গবেষণা একে অন্যের হাত ধরে এগিয়ে যায়। পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় নানা গবেষণাগারে আমাদের অসংখ্য গবেষক-বিজ্ঞানী কাজ করে যাচ্ছেন; কিন্তু আমাদের দেশে এখনো গবেষণার কালচারটি গড়ে ওঠেনি। করোনার মহামারির সময় আমাদেরকে টিকার জন্য বাইরের দুনিয়ার দিকে হাত পেতে থাকতে হয়েছিল, আমরা কিউবার মতো নিজেদের টিকা নিজেরা উদ্ভাবন করতে পারিনি। আমাদের এখনো লজ্জায় মাথা কাটা যায় যখন দেখি মূলত গবেষণায় পিছিয়ে আছি বলে পৃথিবীর প্রথম কয়েক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে আমাদের দেশের একটি

বিশ্ববিদ্যালয়েরও নাম নেই! এ রকমটি হওয়ার কথা ছিল না, বাংলাদেশের এই রূপটি আমাদের তীব্রভাবে ব্যথাতুর করে। প্রয়োজন হলে 'জাম্প-স্টার্ট' করেও গবেষণার বিষয়টি নিশ্চিত করার সময় চলে এসেছে।

আগে হোক পরে হোক আমাদের শিক্ষা এবং গবেষণার বিষয়টি নিশ্চয়ই একদিন দাঁড়িয়ে যাবে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের সবার ভেতরে একটা চাপা উৎকণ্ঠা, সেটি হচ্ছে এই দেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান।

গত দুর্গাপূজার সময় কুমিল্লায় যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা যেকোনো হিসেবে যথেষ্ট দুঃখ এবং লজ্জার একটা বিষয় ছিল। কিন্তু তারপরে সেটা যত দ্রুত দেশের অন্য অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল সেটি হচ্ছে সত্যিকারের আতঙ্কের বিষয়। সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের দেশের বড়ো একটা জনগোষ্ঠীর ভেতর সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব এক ধরনের অসুস্থতার মতো ছড়িয়ে গেছে। সামাজিক নেটওয়ার্ক নামে মানুষের কলুষিত চিন্তাকে সবার মাঝে উন্মুক্ত করে দেওয়ার যে প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে চোখ বোলালেই মানুষের এই বিপজ্জনক রূপান্তরটি চোখে পড়ে। এই দেশের সংখ্যালঘু মানুষদের যদি আমরা জিজ্ঞেস করি এই পরিবেশে তারা কেমন আছে, আমার ধারণা তারা গভীর বেদনা নিয়ে বলবে যে তারা ভালো নেই। অর্থনৈতিক সূচক বা উন্নয়নের মাপকাঠি যা-ই বলুক না কেন–যে দেশে সংখ্যালঘুরা ভালো থাকে না, সে দেশটিই আসলে ভালো থাকে না। নিজ থেকে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, সমস্যাটাকে দেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

যারা ইতোমধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হয়ে আছে তাদের নিয়ে কিছু করার আছে কি না জানা নেই, কিন্তু নতুন প্রজন্মকে কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হতে দেওয়া যাবে না। নিজের ধর্মকে ভালোবাসতে শেখানোর আগেই তাদেরকে অন্য সকল ধর্মের জন্য সম্মানবোধ শেখাতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল ভাষার মানুষের সাথে অন্য সকল মানুষের ভালোবাসা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য এবং সবচেয়ে বড়ো সম্পদ।

আমাদের অনেক বড়ো সৌভাগ্য এই দেশে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতার জন্ম হয়েছিল, যিনি আমাদের এই দেশটিকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক, সেই ১৯৫৫ সালে তাঁর রাজনৈতিক দলকে অসাম্প্রদায়িক করার জন্য দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি সরিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের ভালোবাসার এই দেশটি যদি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক না হয় তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনেক বড়ো একটি অসম্মান করা হবে।

আমাদের ভালোবাসার এই বাংলাদেশে আমরা কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুর অসম্মান করতে চাই না। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০৯)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক।

স্বাধীনতার নবযাত্রা

হারুন হাবীব

নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই জানতে হবে, তাদের প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতার যাত্রাপথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সে পথ ছিল সংকট ও ভয়াবহ বিপদসংকুল। স্বাধীনতারপরবর্তী কালটিও কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি বাংলাদেশের। এই যে চার দশক পাড়ি দিতে চলেছে বাংলাদেশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর, এই সময়ে আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এ দেশকে। পরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর, রক্তার্জিত স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ধূলিস্মাৎ করার সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র আঁটা হয়েছিল। শক্ত জাল বুনেছিল স্বাধীনতাবিরোধীচক্র সেদিন। কিন্তু সহযোগী ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় সে ষড়যন্ত্রের সফল মোকাবিলা করেছিল যুদ্ধ পরিচালনাকারী মুজিবনগর সরকার। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই, বাংলার স্বাধীনতাকে সুসংহত করতে দেয়নি প্রতিপক্ষরা। স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকেই ওরা সক্রিয় হয়েছিল নতুন উদ্যমে।

সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাভাবিক ইতিহাসের যাত্রাপথ প্রথম রুদ্ধ করা হয়েছিল ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ভয়ংকর রক্তপাতের মাধ্যমে। এই হত্যাকাণ্ড ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম পরিকল্পিত আঘাত। বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল একটি রক্তাক্ত গণযুদ্ধের মাধ্যমে, সে বাংলাদেশের কাছে এ আঘাত ছিল সীমাহীন। এ আঘাতের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ৩৪টি বছর কাটাতে হয়েছে বাংলাদেশকে। পেরোতে হয়েছে অনেক চড়াই-উতরাই। কাজেই ১৯ নভেম্বর ২০০৯, যেদিন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার রায় প্রদান করেছেন, সেদিনটি কেবল ঐতিহাসিক দিনই নয়, একই সঙ্গে বদ্ধদুয়ার খুলে দেওয়ার জাতীয় ঐতিহাসিক নবযাত্রার।

ইতিহাস আজ নিজের প্রয়োজনেই অজেয় শক্তি নিয়ে মূর্তিমান। জাতীয় নবযাত্রার শক্তগ্রন্থি খুলে গেছে। বাংলাদেশ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। যে ঘাতক-তস্করেরা বাংলাদেশের জনক ও লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পঁচাত্তরে রক্তপাত ঘটিয়েছিল, যারা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বাভাবিক গতিপথ স্তব্ধ করতে ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, তারা আজ ইতিহাস ও আইনের হাতে সমর্পিত।

ইতিহাসের বিচার অমোঘ। বাংলাদেশের জীবন থেকে ৩৪টি বছর খসে গেছে। এ দেশের মাটি ও মানুষ ব্যর্থতার দুঃসহ যন্ত্রণার প্রহর গুনেছে প্রায় তিন যুগ।

যন্ত্রণাবিদ্ধ বাংলাদেশ গুমড়ে কেঁদেছে বছরের পর বছর। কিন্তু সে কান্নার পর নবযাত্রার শুরুটিও কি কম তাৎপর্যমণ্ডিত?

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মদান যে নতুন অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারই রোদনভরা বেদনা পঁচাত্তরের রক্তপাত। জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে পুরনো পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে দিতে ঘটানো হয়েছিল ১৫ আগস্ট। কারণ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিছক বা কিছু ব্যক্তির নিহত হওয়ার ঘটনার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল ধর্ম ও সেনাকেন্দ্রিক দুঃশাসনের পাকিস্তানকে টুকরো করে একটি আধুনিক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার দায়ে!

পাকিস্তানের ২৪ বছরের দুঃশাসনের পর ১৯৭১ ছিল পূর্ব অংশের নিপীড়িত বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর একটি সুখস্বপ্ন। সেনাতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের নিপীড়ন, সেই সাথে সেনাশাসকদের উদগ্র দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এ দেশের নিপীড়িত বাঙালি জনগোষ্ঠীকে রঙিন স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সে স্বপ্নের দ্রষ্টা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কাজেই পঁচাত্তর ছিল স্বাধীনতাবিরোধী গোপন ও প্রকাশ্য শত্রুদের একটি সম্মিলিত প্রতিশোধ। নতুন রাষ্ট্রকে আঁতুড়ঘরে গলাটিপে মারার সর্বাত্মক অভিযান।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রতিমুহূর্তে পঁচাত্তরের পর থেকে। ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলছে গেছে স্বাধীনতার রঙিন স্বপ্ন। গণতন্ত্র ও সুশাসনের বদলে এসেছে দুর্ভাগ্যজনক একটি সময়। যে রুগ্‌ণ পাকিস্তানি চেতনাকে বহিষ্কার করতে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, সেই গণবিরোধী রুগ্‌ণ রাজনীতি-দর্শনকে এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে। সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র ধর্মবাদের পুনরাভিযান সুনিশ্চিত করেছে এই সামরিক ও আধাসামরিক শাসকবর্গ। নির্বাচনকে পরিণত করেছে অগণতান্ত্রিক শাসন দীর্ঘায়িত করার কৌশলে। বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বললেও মূলত ওরা প্রতিষ্ঠিত করেছে সেনানিয়ন্ত্রিত এমন এক দুঃশাসন, যাকে মুক্তিযুদ্ধের মাঝ দিয়ে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

ইতিহাস সততার স্বার্থেই মানতে হবে, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে জড়িত ছিল পরবর্তীকালের এই কুশীলবরাও। জাতির নতুন যাত্রাপথ কণ্টকহীন করার স্বার্থেই এদের চিহ্নিত করা জরুরি। ইতিহাস সততার স্বার্থেই এ সত্য পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে এই এরাই বাংলাদেশ সৃষ্টির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ভূলুণ্ঠিত করেছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আত্মাকে অস্বীকার করে বাঙালি জাতিসত্তাকে আঘাতের পর আঘাত করেছে। বাঙালির যা কিছু অর্জন, যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলের তাকেই এরা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। বিকৃত করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যন্ত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এমন কিছু জেনারেশন, যারা জাতীয় ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্ত। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই নতুন প্রজন্ম জাতীয় মর্যাদার প্রতীক নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে; কিন্তু পরিকল্পিতভাবে তাদের পঙ্গু করা হয়েছে।

বলতেই হবে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড মামলার চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাভাবিক যাত্রাপথের প্রধান কাঁটাটি দূর হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটিও সত্য যে বাংলাদেশ এখনো নিরাপদ হয়নি। এ দেশকে নিরাপদ করতে চাই দৃঢ়চিত্ত আদর্শিক নেতৃত্ব। আমি বলতে বাধ্য, যে নবযাত্রায় জাতিকে আজ ধাবিত করতে হবে, সে যাত্রায় আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের অবশ্যই মানতে হবে যে একাত্তরের খুনি, পরাজিত পাকিস্তানি প্রেতাত্মা এবং পঁচাত্তরের খুনিরা ভিন্ন কোনো সত্তা নয়। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এরা। এরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে খুনি কেউ-বা পরোক্ষে। এদের কেউ বাধ্য হয়ে পরিস্থিতির চাপে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও বাংলাদেশের জন্মের আদর্শিক চেতনা এদের কাউকে কখনো উদ্বুদ্ধ করেনি। কাজেই সত্যসন্ধানী গণতান্ত্রিক মানুষকে আজ একই সঙ্গে ঘৃণা করতে হবে খুনিদের দোসরদেরও, যারা একাত্তর ও পঁচাত্তরের খুনিদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছিল, বাংলাদেশের গণমানুষের অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাসবিরোধী অপচেতনার পুনরুত্থান ঘটিয়েছিল এবং দেশে জঙ্গিবাদের ভিত্তি সূচিত করেছিল।

১৯ নভেম্বর ২০০৯ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সাংবিধানিক মর্যাদা ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রায়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে, আধুনিক রাষ্ট্র চলবে তার সংবিধানের আওতায়, রাষ্ট্রক্ষমতার বদল হবে ভোটের মাধ্যমে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে, সেনাবাহিনী বা তার বিচ্ছিন্ন কোনো অংশের হঠকারিতায় নয়।

কাজেই এ রায়ের মধ্য দিয়ে যে নবযাত্রা সূচিত হয়েছে তাকে অধিকতর নিরাপদ করাই এখনকার বড়ো কাজ। মনে রাখতে হবে, যে রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতাসীন তাদের সামনে আছে সুবিশাল দায় ও দায়িত্ব। একই সঙ্গে আছে স্বাধীনতা বিরোধীদের সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের প্রতিপক্ষরা কিছুতেই এ রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল দেখতে চায় না। নব্য পাকিস্তানিরা লক্ষ শহিদের রক্তে গড়া বাংলাকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়। কাজেই সর্বাত্মক সতর্কতা সময়ের দাবি। বিন্দুমাত্র আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। নবযাত্রার যে আয়োজন তাকে দৃঢ়চিত্তে ও সুদৃঢ় পদভারে এগিয়ে নিতে হবে। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়, এ দেশের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ বিচার বাংলাদেশকে আরো অধিকতর নিরাপদ করবে। প্রিয় বাংলাদেশ অবশ্যই প্রার্থিত এ নবযাত্রায় সফল হবে, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে–এ আমার বিশ্বাস। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বার ২০১৬)

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক।

বাঙালি জাতিসত্তার বিজয়

ড. হারুন-অর-রশিদ

১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। ৪৫ বছর পূর্বে এদিন মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সেনা সদস্য জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করে। অর্জিত হয় পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়। যাঁর নেতৃত্ব ও বিরামহীন সংগ্রামের ফলে এ বিজয় অর্জন, তিনি হলেন ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৬ ডিসেম্বরের বিজয় কি শুধু ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়, নাকি এর পরিপ্রেক্ষিত আরো সুদূরে বিস্তৃত? ১৬ ডিসেম্বরের যে অর্জন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্যই বা কী? এককথায়, বাঙালির হাজার বছরের পরিসরে বিস্তৃত দীর্ঘ জাতি গঠন প্রক্রিয়া ও জাতীয় মুক্তির লড়াই-সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিতে '৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও সে যুদ্ধে বিজয়।

বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর পাঁচমেশালি জাতি বাঙালি। প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতের যে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তাদের বসবাস, আজকের বাংলাদেশ তার একটি অংশমাত্র। বিভিন্ন কৌম সমাজ ও স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিল সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও এর মানুষ। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সেখানে কালক্রমে বঙ্গ থেকে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা বা বাংলা, সুবে বাংলা, নিজামত, বেঙ্গল, পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান। পরিশেষে, স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অভ্যুদয়।

অষ্টম শতাব্দীতে বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা ও তাদের ৪০০ বছরের শাসনকালে বাঙালির স্বতন্ত্র সত্তা মূর্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলেও বিভিন্ন বিজাতীয়, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন ও হস্তক্ষেপের ফলে সে সম্ভাবনা স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পায়নি। পালদের শাসন শেষে বাংলা যেসব বহিরাগত বা বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনাধীনে আসে, তা হলো দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশ (একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এয়োদশ শতাব্দীর শুরু), তুর্কি এবং আফগান সুলতানি শাসন (১২০৪-১৫৭৫), মুঘল সুবেদারি এবং নবাবি শাসন (১৫৭৬-১৭৫৬), ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৭৫৭-১৮৫৭), ব্রিটিশ শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭) এবং সর্বশেষে পাকিস্তানি শাসন (১৯৪৭-১৯৭১)।

বাংলার মধ্যযুগ ছিল বহিরাগত মুসলিম শাসনকাল, যা ৫৫০ বছরব্যাপী বিস্তৃত ছিল। মুসলিম শাসন আমলের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এক. বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও

সংস্কৃতি চর্চায় শাসকবর্গের, বিশেষ করে সুলতানি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ; দুই. অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত বিভিন্ন অঞ্চলকে একই ভৌগোলিক সত্তায় নির্দিষ্ট রূপ দান, যা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে খুবই আবশ্যকীয় ছিল।

বাঙালির মানস গঠনে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাব পূর্বাপর লক্ষ করা গেলেও এ সময়ে মুসলমান সুফি-সাধকদের উদার ইসলামি দর্শন বা সুফিবাদ এবং শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩), কবীর, নানক প্রমুখের বৈষ্ণববাদ ও ভক্তিবাদ মিলে বাঙালির জীবনে জন্ম নেয় একটি সহনশীল ও সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতি, পরবর্তীকালে অসাম্প্রদায়িকতা যার উত্তরাধিকার।

বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সৃষ্টি ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। নবম-দশম শতকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গীতিমূলক রচনা *চর্যাপদ* থেকে মধ্যযুগের পদ্য ছন্দের দোভাষী পুঁথিসাহিত্য হয়ে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপ নেয়। তবে মধ্যযুগেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির বিশেষ অনুরাগ লক্ষ করা যায়, যা ওই যুগের কবি আব্দুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)-এর কণ্ঠে এভাবে প্রতিধ্বনিত হয় : 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'। কবি আব্দুল হাকিমের এ উক্তির মধ্যেই যে বাঙালির আধুনিককালের ভাষা আন্দোলনের চেতনা নিহিত ছিল, সে কথা বোধ করি বলা যায়।

প্রায় ২০০ বছর ধরে বাংলা ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন ছিল খুবই ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের এ শাসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক হলো, যোগাযোগব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাজগতে বিস্ফোরণ ও এর অভূতপূর্ব প্রসার। প্রধানত ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে, যাদের সরব উপস্থিতি সমাজ-রাজনীতির সর্বক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃতি পেয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে নেতিবাচক দিক হলো, প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসনামলের সহনশীল ও সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতির ধারাকে দ্রুত পাল্টে দিয়ে তদ্স্থলে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনার সৃষ্টি এবং একে প্রবল করে তোলা। এতদ্সত্ত্বেও অসাম্প্রদায়িক সমাজ-রাজনীতির ধারায় হিন্দু ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রচ্ছন্ন আকারে হলেও বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিষয়টিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাও তখন বিদ্যমান ছিল।

চল্লিশের দশকে বাঙালির স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র-ভাবনা একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ছিল এর প্রথম আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে এ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-ভাবনার ধারাবাহিকতায় দেশবিভাগের প্রাক্কালে যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎ চন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায়, আবুল হাশিম প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান কলকাতায় এই উদ্যোগের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হন। তবে ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙালি জাতিসত্তা তখনো স্পষ্ট রূপ নেয়নি, বরং 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' বিভ্রান্তির দোলাচলে দুলতে থাকে এবং এ কারণে ওই উদ্যোগ সেদিন সফল হতে পারেনি। ফলে হাজার মাইলের ব্যবধানে দুটি অঞ্চল নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র।

বাঙালিদের বিপুল সমর্থন ও ভোটদান ব্যতীত যেখানে পাকিস্তান রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করত না, সেই রাষ্ট্রে শুরু থেকেই তাদের ওপর নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসন-শোষণ, জাতি নিপীড়ন। ১৯৪৭-১৯৭১ বা পাকিস্তানি আমলটি ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় বা পর্ব। সংগ্রামের এ পর্বের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৯৪৮ ও '৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের একজন। পাকিস্তানি শাসন পর্বে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সর্বসময় জুড়ে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর জীবদ্দশায়ও বঙ্গবন্ধু ছিলেন এর মধ্যমণি।

'৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে তা মাত্র ৫৬ দিনের বেশি টিকে থাকতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্রের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করা, যা তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের (Basic Democracy) মোড়কে এক দশক ধরে অব্যাহত থাকে।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-কাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর সম্মুখে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা' কর্মসূচি পেশ করেন। এ কর্মসূচি ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ। ৬ দফাভিত্তিক আন্দোলনকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক 'আগরতলা মামলা' করে। এর প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয় ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়লাভ সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ওই গণরায় মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে সামরিক শক্তিবলে বাঙালির মুক্তির স্বপ্নকে চিরতরে নস্যাৎ করতে উদ্যত হয়। ১ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একতরফা বন্ধ ঘোষণা করেন। প্রত্যুত্তরে ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির উদ্দেশে এক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য নিয়ে রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার

সভায় তিনি হাজির হলেন। সেখানে রাখেন ৭ই মার্চের সেই জগদ্বিখ্যাত অবিস্মরণীয় ১৮ মিনিটের ভাষণ। বঙ্গবন্ধু তাঁর ওই ভাষণে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা, অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা, সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেওয়ার ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবিলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যেকোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শ ইত্যাদির পর ঘোষণা করেন, '...ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে...। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচার আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের কিছু পর, অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ স্বাধীনতার ঘোষণা আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না। এ ছিল তাঁর জীবন-স্বপ্ন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ। Newsweek ম্যাগাজিনের (৫ এপ্রিল ১৯৭১) ভাষায় : "When Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the Independence of Bangladesh last week some of his critics declared that he was merely yielding to the pressure of his extremist supporters, seeking to ride the crest of wave in order to avoid being engulfed by it. But Mujib's emergence as the embattled leader of a new Bengal nation is the logical outcome of lifetime spent fighting for Bengali nationalism, his presence there is no accident."

৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শেষে হানাদারমুক্ত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙালির স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ।

আমাদের অতীত কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষক আন্দোলনের গণচেতনা, শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর, ক্ষুদিরাম ও মাস্টার দা সূর্য সেনের সাহসী প্রত্যয় ও প্রতিরোধ সংগ্রাম, মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের (১৬২০-১৬৯০) দেশাত্মবোধ ও ভাষাপ্রীতি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশের দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সাহিত্য-চেতনা, মধ্যযুগের সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতি, সুফিবাদ-ভক্তিবাদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারা, পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে বাঙালি কৃষক-প্রজা সাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন। সর্বোপরি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা– এ সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও নেতৃত্বের মর্মমূলে। বাঙালির সমাজ-রাজনীতির মূল এ ধারাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তিনি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তাকে পূর্ণতা দেন। বিজয় ঘটে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র যার মূর্তরূপ। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১০)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

কাছের-দূরের বন্ধুরা

হাসান ফেরদৌস

মার্কিন গায়িকা জোয়াস বায়েজ ১৯৭১-এ বাংলাদেশ নিয়ে একটি গান বেঁধেছিলেন। আশ্চর্য সেই গানের কয়েকটি লাইন এ রকম :

The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nation stands
Which is to sacrifice a people for a land.

জোয়াস বায়েজ এ গান গেয়েছিলেন ১ আগস্ট, ১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিউ ইয়র্কে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আয়োজিত এক কনসার্টে সেদিন আরো অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন। যেমন–জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলান ও রবিশঙ্কর। আলো ঝলমলে ম্যানহাটন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের এক দেশ। শিল্পী বা দর্শকদের অধিকাংশেরই সে দেশের সাথে কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই। বস্তুত তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। মুক্তির জন্য লড়ছে একটি দেশের মানুষ, স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তাঁরা–নানা দেশের, নানা জাতির মানুষ সেদিন সমর্থনের হাত বাড়িয়েছিলেন, নির্মাণ করেছিলেন সংহতির বর্ম। সেই মুক্তিসংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভের মধ্যে দিয়ে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু সে যুদ্ধের সৈনিক ছিল সারা বিশ্ব। তাদের কারো নাম আমরা জানি। যেমন–ফরাসি লেখক আঁন্দ্রে মালরো, তিনি অস্ত্র নিয়ে সে যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা জানি, মার্কিন কবি গিনসবার্গের কথা, উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে লিখেছিলেন সেই আশ্চর্য কবিতা, 'যশোর বোর্ড।' অথবা ব্রিটিশ রাজনীতিক পিটার শোর, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে যাঁর জোরালো বক্তব্য একাত্তরে বাঙালির বুকে সাহস জুগিয়েছিল। 'টেস্টিমনি অভ সিক্সটি' এই নামে অক্সফাম প্রচারিত প্রতিবাদপত্রে বিশ্বের যে ৬০ জন নামিদামি ব্যক্তিত্ব আমাদের মুক্তির পক্ষে আওয়াজ তুলেছিলেন, তাঁদের কথাও আমরা শুনেছি। সে তালিকায় ছিলেন মাদার তেরেসা, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ। ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের চাকরির ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও বাংলাদেশে মার্কিন নীতির প্রতিবাদ করে স্টেট ডিপার্টমেন্টে জরুরি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের কথাও আমরা শুনেছি।

একই রকম ঝুঁকি নিয়েছিলেন এক তরুণ মার্কিন নৌ সেনা, যিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের গোপন নথিপত্র ফাঁস করে দেন। মার্কিন

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের স্মৃতিকথায় আমরা তাঁর কথা পড়েছি, যদিও তাঁর নামটি আজও উদ্ধার হয়নি।

কিন্তু যাঁদের কথা আমরা শুনিনি এমন মানুষের সংখ্যা অসংখ্য। প্রতিবেশী ভারতে বন্ধুর আলিঙ্গনে উদ্বাস্তু বাঙালিকে সানন্দে আশ্রয় দিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। লন্ডনে ও প্যারিসে বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিলে শামিল হয়েছেন সে দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও ফ্যাক্টরি শ্রমিক। বাঙালি উদ্বাস্তুদের সাথে সংহতি জানিয়ে হোয়াইট হাউসের সামনে ম্যানহোলে রাত্রি যাপন করেছেন মার্কিন বন্ধুরা। ইউক্রেনের অখ্যাত শহর খারকফে গান গেয়ে চাঁদা তুলেছে যুব পাইওনিয়াররা। বালটিমোরের সমুদ্রবন্দরে পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ ঠেকাতে জীবন বাজি রেখে শুধু ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে তা 'অবরোধ' করেছেন 'ফেন্ডস অভ বেঙ্গল'-এর নবীন-প্রবীণ মার্কিন সদস্যরা। সে সময় বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হয়েছেন মার্কিন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ, এভাবে তা হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের নিজেদের লড়াই।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রথাগত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হয়তো ছিল না, কিন্তু সে লড়াইয়ের আইনগত ভিত্তি ঔপনিবেশিক লড়াই থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। একটি সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী শুধু অস্ত্রের বলে তাদের শাসন, শোষণ ও বিশ্ববিক্ষ্যা বাঙালিদের ওপর চাপাতে চেয়েছিল। বাঙালি তা প্রত্যাখ্যান করে দাবি করেছিল নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। সেখান থেকেই লড়াই। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত, এই নীতি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর গণমুক্তি আন্দোলনের আইনি ভিত্তি প্রদান করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেই আইন সমভাবে প্রযোজ্য। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিতর্কে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ সে আইনি ভিত্তির যুক্তি তুলে ধরে।

উদাহরণ হিসেবে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ী প্রতিনিধি ইয়াকফ মালিকের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ প্রশ্নে জরুরি বিতর্কে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রদূত মালিক স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রতিটি জাতিরই রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। কোনো বহুজাতিক রাষ্ট্রের ভেতরে স্বায়ত্তশাসিত, অথবা সে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পুরো অধিকার তার রয়েছে। 'কেবলমাত্র নেওয়ার অধিকার রাখে'। আন্তর্জাতিক আইনেই যে সে অধিকার দেওয়া আছে, সেদিনের বিতর্কে ভারত ও পোলান্ডের প্রতিনিধিও তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের অন্য আইনি ভিত্তি ছিল মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আইনে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যাতে জাতি হত্যাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং তা নিষিদ্ধ

ঘোষিত হয়েছে। এই চুক্তির ভিত্তিতে পরবর্তীতে আশি ও নব্বইয়ের দশকে জন্ম নেয় নিজ নাগরিকদের রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের ধারণা এবং সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তেমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি। রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার সংরক্ষণ সে দেশের সরকারের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অথবা রাষ্ট্র নিজেই যখন নিজস্ব জনগোষ্ঠীর একাংশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হয়ে ওঠে– তেমন সরকার বা রাষ্ট্র শুধু যে আন্তর্জাতিক ধিক্কারের সম্মুখীন হয় তা-ই নয়, তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ারও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন ছিল সেই এখতিয়ারের বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু এসব আইনগত ব্যাখ্যার চেয়েও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বড়ো শক্তি ছিল তার প্রতিরোধের নৈতিক ভিত্তি। একাত্তরে বাঙালি নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে মরণপণ লড়াই করেছে। অশীতিপর বৃদ্ধ আঁন্দ্রে মালরো বাঙালির সেই প্রতিরোধে নিজের সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছিলেন, এক অসম যুদ্ধে বাঙালিরা লিপ্ত। তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। যে প্রাচীন সভ্যতার অংশ বাঙালিরা, যার বয়স তিন হাজার বছরেরও বেশি, তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিরোধে বাঙালির যুদ্ধ তাই সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত।

এই যুদ্ধে তারা একা নয়, প্রবাসী ফরাসি লেখক ও রাষ্ট্রনায়কের মুখে এ কথা শুনে বাঙালি যোদ্ধারা সেদিন বুকে বল পেয়েছে। স্বাধীনতারপর মালরো ঢাকা এসেছিলেন এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পক্ষে জোর দাবি তুলেছিলেন।

একই কথা বলেছেন রিচার্ড টেইলর, যিনি বালটিমোরে পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজের 'ব্লকেডে' নেতৃত্বে দিয়েছিলেন। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থনে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। ২০০০ সালে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে বাঙালিদের এক সমাবেশে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মুক্তিযুদ্ধের এক নায়ক' বলে। রিচার্ড টেইলর আপত্তি করে বলেছিলেন, নায়কোচিত কোনো কাজই তিনি করেননি। যা করেছেন, নাম কেনার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর পেছনে ছিল না। এক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সংহতি দেখাতেই তাঁরা সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। যে চেতনা তাঁদের অনুপ্রাণিত করে তা হলো গভীর নাগরিক দায়িত্ববোধ।

'বর্বর সেনাবাহিনীর আক্রমণে যে মানুষ বাংলাদেশে মরেছে, সে আমারও ভাই। কারণ সবাইকে নিয়ে যে মানবগোষ্ঠী, আমরা তারই অংশ।' রিচার্ড যখন এ কথা বলছিলেন, তাঁর চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত, কিন্তু তাতে ছিল আলোর ঝলক।

আজ ৪০ বছর পরে একটি কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে বাংলার মানুষ তার সেই বন্ধুদের সালাম জানায়, যারা সবচেয়ে বিপদের দিনে বাংলাদেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যি তারাও আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামী যোদ্ধা। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০৯)

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক

বিজয় দিবসে কী কথা হয়

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

তারপরে কেটে গেল চার দশকের কাছাকাছি সময়কাল। সাল ২০০৯, ক্যালেন্ডারের পাতার দিন-তারিখ মোতাবেক আজ ডিসেম্বর ১৬; স্বাধীন 'নেশন স্টেট' বাংলাদেশের বিজয় দিবস। বিশেষ এই দিনে পনেরো কোটি বাঙালি জনমানুষ আমরা উদ্‌যাপন করছি, দখলদার পাকিস্তানি অপশক্তিকে হটিয়ে লড়ে-নেওয়া 'মুক্তির সেই একাত্তর'। আর এখন এই একই সাথে পাঠ নেব আমাদের বিজয় দিবসের ইতিহাসে।

বটে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে হাজারো সংকট, বিভ্রান্তির জটাজাল– অবস্থান-নির্বিশেষে আপামর সাধারণের তা নিত্যদিনের পীড়ন। বাহুল্য বলা যে, সমস্ত দেশ উদ্ধারের লক্ষ্যে আশু এক বিরাট কর্মযজ্ঞ–আয়োজনের প্রয়োজন। তবে উপস্থিত এই ক্ষণে আমাদের জরুরি সন্ধান অন্যত্র। বিবেচনা করছি–বারংবার সেই সন্ধানের সত্যটিকেই চিহ্নিত করবার প্রয়াস নিতান্তই ফরজ। যে সত্য-সন্ধানের জন্য আবেদন, বিষয়টা কিন্তু তদর্থে জটিল নয়। আমাদের সন্ধানের প্রস্তাব–কেন 'বাংলাদেশ'? কী প্রকারে সম্ভুত 'মুক্ত স্বাধীন' বাংলাদেশ? এইখানে আমরা অবশ্য বুঝে নেব–তা' উপরিতলের তাৎক্ষণিক একটা ব্যাপার/কাণ্ড নয়। গভীরে কাজ করেছে, অনেক দিন ধরে অতিনিষ্ঠায়, ব্রতে সাধিত হয়েছে সেই কাজ–একটি বিশ্বাস, ঈমানের আবিষ্কার এবং তাই থেকে জাত আপসহীন চেতনা, তার নাম 'বাংলাদেশ চেতনা'। অতঃপর জানি, ওই ঈমানের চেতনায় প্রাণিত মানুষেরা লড়াই করেছিল। সেইটেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এখন ইতিহাসবিদরা, পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন। মৌল কার্যকারণসমূহ আবিষ্কার করবেন। আর সাধারণ আমরা আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা জানাব ঘরের নবজাতক সন্তানদেরকে। সেই সময়ের আমরা, আমাদের জন্য তা ছিল রূঢ় বাস্তবতা, যাকে বলব জীবনসত্য। ভূমিসংলগ্ন আমাদের কিন্তু আপন বুঝেই জানা ছিল–কেন বাংলাদেশ। জানা ছিল–ঈমানে কেন ওই চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কণ্ঠে কেন প্রার্থনার মতো উচ্চারিত হতো 'জয় বাংলা', দুঃসাহসী রণধ্বনি 'জয় বাংলা'। চেতনাটি রক্তে মিশেছিল। তাই থেকে কী দ্রুত জয় করে নিয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর চিহ্নিত '৭১-এর ঐতিহাসিক দিবসটি। রোমাঞ্চিত হই যখন মিলে যায় প্রায় দুই শতাব্দী কাল পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবের সাথে। ওদের কণ্ঠেও ত' বিশ্বাসের আওয়াজ ওই রকমেরই ছিল 'Vive Lei Revolution Francaise'. ইতিহাসের পাঠক অবগত ফরাসি বিপ্লব শেষ অবধি বিশ্বমানসের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। এখন ক্ষোভের কথাটি এই–আর বাংলাদেশে? মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব করেছে যে দেশকে, সেই খানে? সেখানকার মানুষগুলির বরাতে ঘটল কী? একপ্রকারে 'বরাতই' বটে। তখনকার সমকালীন আমরা, মুক্তিযুদ্ধ সম্পৃক্ত আমাদের তাবৎ চেতনা-মূল্যবোধ ইতিমধ্যেই কী বিস্মৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়ে এসেছে। কেমন

এক ওলট-পালট বিকৃতির ঘোরে সমস্ত কিছুই যেন নিমজ্জিত হচ্ছে। আর বর্তমানের এই নবীন প্রজন্ম? বেশ চতুর, কুটিল মতলবে তাদের মগজ-ধোলাই ক্রিয়াটি সাধন করা হয়েছে। তারা জানছে আরেক ইতিকথা। তারা জানছে না তাদেরই পিতাদের সমুদয় মহৎ কীর্তির কথা। বরং বিপরীতে ঐতিহ্যহীন, বংশপরম্পরাবিচ্যুত একটি প্যারাসাইট মানবগোষ্ঠী নির্মাণের সর্বাত্মক অপপ্রায়াস চলছে। ঈশ্বরের অপার করুণা–এমত দুঃসময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা অর্জনের স্মারক দিবস। সে কারণেই নিবেদন–এখন মাহেন্দ্রক্ষণ দর্পণে আপন মুখদর্শনের, উঠে দাঁড়াবার, '৭১-বিরোধীকে প্রতিহত করবার এই বর্তমানে এবং বাংলাদেশ-বাঙালিত্বের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার। আর অতিসংগত হেতুতেই বারংবার আসবে এই সব প্রাসঙ্গিকাতর প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ-মুক্তিযোদ্ধা; '৭২-এর সংবিধান; '৭৫ আগস্টে জনকহত্যা; ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ; দেশে সামরিক শাসন-ক্যু কাউন্টার ক্যু; রাজার পুনর্বাসন; স্বৈরশাসনের পর্ব; স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের জয়; এবং অতঃপর।

যখন বলি মানুষের অধিকার, মানুষের মুক্তি–বিশেষ বর্তমান প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ–বিষয়টি গভীর, পটভূমি ব্যাপক। সামগ্রিকতায় তা বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সহজ বুঝের কথায় এভাবে উপস্থাপন করা যাক। প্রাকৃত সাধারণের মুক্তি-লোপাটকারী শক্তির শাসন-শোষণ থেকে, দাসত্বের দখলদারিত্বের নিগড়-নিপীড়ন থেকে। ইতিহাস বলে, যুগে যুগে দেশে দেশে শৃঙ্খলিত করবার প্রক্রিয়াটা মোটামুটি একই প্রকারের। রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয় আবরণে আগ্রাসন। সেইখানে এসেছে সম্রাট, সেনাপতি, চার্চ, সামন্তপ্রভু, বণিক-শিল্পপতি। মতলবে জোট বেঁধেছে কায়েমি স্বার্থের যত প্রতিনিধি। মূল উদ্দেশ্য, ওই যে বলা গেছে, সাধারণ মানুষকে দাসবন্দিত্বে আটক করে অবাধ শোষণ। ওদিকে তেমনি কালে কালান্তরে নানা দেশেই সর্বমাত্রিকায় মুক্তির লক্ষ্যে মানুষেরা সংগঠিত হয়েছে, প্রতিরোধ আন্দোলন-বিদ্রোহ করেছে, শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র লড়াই করেছে। দূর অতীতে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে-স্পার্টাকাস বিদ্রোহের কথা আমরা পাঠ করে জেনেছি। সেই থেকে অদ্যাবধি কত না উত্থানের, বিপ্লব-বিদ্রোহের ইতিহাস। বিংশ শতকের অপরাহ্নে দেখেছি ভিয়েতনামে হো চি মিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা–তাঁরা সব নেতৃত্বে দিয়েছেন নানা চেহারার প্রভুত্ববাদের মোকাবিলায়। বঞ্চিত দলিত কোটি সাধারণের মুক্তির জন্য। এখন বুঝে নিই এই আমাদের দেশেও তেমনি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির লক্ষ্যে যুদ্ধ।

হঠাৎ করেই ত' আর ইতিহাসের সৃজন হয় না। তাৎক্ষণিক চরম উত্তেজনায় বিস্ফোরণ সংঘটিত হতে পারে। তবে তা সাময়িক, ক্ষণান্তরে মিলিয়ে যায়। অপরপক্ষে আমাদের '৭১ অত্যুজ্জ্বল ইতিহাসগর্ভ কীর্তি। সারাটা দেশজুড়ে যে বিশাল গণ-অভ্যুত্থান, অনেক রয়েছে পশ্চাদ্‌পটের গভীরে, ফল্গুস্রোতের বহমানতায়। আর ইতিহাস যখন থেকে উপরিতলে দানা বাঁধছে আমরা তা নিকট প্রত্যক্ষ করেছি। অনেকেরই রয়েছে

সক্রিয় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা। প্রসঙ্গত, এইখানে একটি রূপরেখা উপস্থাপিত করা যাক। বিশেষ করে বর্তমান জমানার মানুষদের জন্য–

ক. বলব যে, যথার্থ ইতিহাসের যাত্রারম্ব '৪৮-'৫২-র ভাষা আন্দোলন দিয়ে;

খ. পঞ্চাশের দশকে চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, ঢাকায় এবং টাঙ্গাইলে কাগমারীত অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলন। ক্রমেই স্পষ্ট করে জানা যাচ্ছে আপন ঐতিহ্যের ঠিকানা; আমাদের চেতনাসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে হাজার বছরের বাংলার বহমান সংস্কৃতি-সম্ভারে;

গ. '৫৪-র নির্বাচনে পাকিস্তানিত্বের নিশানবরদার মুসলিম লীগের ভরাডুবি। এই ঘটনা পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের তৎসহ আর্থ-অধিকারের আন্দোলন সূচিত করে দেয়;

ঘ. '৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন এবং দশকজুড়েই রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন, যা কিনা বাঙালিত্বের চেতনাকে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে সহায়ক ভূমিকায় কাজ করেছে;

ঙ. '৬২-তে শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের প্রতিবাদে তীব্র ছাত্র আন্দোলন;

চ. '৬৬ থেকে ৬ দফা দাবি অর্জনের আন্দোলনের দেশব্যাপী ক্রমবিস্তার;

ছ. '৬৮-তে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান তুঙ্গে পৌঁছে গেছে;

জ. অতঃপর কেমন দ্রুত ঝাঁপিয়ে এলো '৭১-এর অগ্নিঝরা মার্চ। বঙ্গবন্ধু ডাক দিলেন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের, আর তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। অতঃপর মাত্র সপ্তাহ তিনেকের মতো কালব্যবধানে আমরা পৌঁছে গেলাম সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে।

এ ত' কেবল কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি মাত্র নয়। এ যে ইতিহাসের রথপরিক্রমার স্তর থেকে স্তরান্তরে উত্তরণের চলচ্চিত্র। একই সাথে মিলিয়ে নিতে হবে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অন্তরে কেমন করে বিশ্বাসের শিকড় প্রসারিত হচ্ছে, মূলে তা প্রোথিত হচ্ছে। তার উচ্চারণ শ্রবণ করি বিশেষ তাৎপর্যবাহী এসব বাণীবন্ধে : 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো', 'জয় বাংলা', 'বাংলার জয়', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' ইত্যাদি এবং চূড়ান্ত গিয়ে সব মিলিত হচ্ছে এ মোহনায়, সেখানে মরণজয়ী প্রেরণার ওই রণধ্বনি 'জয় বাংলা'। লক্ষণীয় যে বারংবার ফিরে ফিরেই আসছে মাতৃভূমি বাংলার কথা, মানুষ বাঙালির কথা। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালির বীরের জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করার দিন

মোজাফফর হোসেন পল্টু

লেখকের ভাষা উদ্ধৃত করে বলছি, 'সময় নামের নদী বয়ে যায় নিরন্তর। মহাকালের সাগর, মহাসাগরে হারিয়ে যায়। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া নদী যেমন রেখে যায় তার দুই তীরে বসতি উজাড় করা ভাঙনের নির্মম দুঃখবহ স্মৃতি, তেমনই রেখে যায় সোনালি ফসলের আশাজাগানিয়া উর্বর পলিও। একইভাবে সময়ও রেখে যায় তার কিছু অবিস্মরণীয় স্মৃতি, কালজয়ী কিছু ঘটনাপ্রবাহ, যাকে আমরা বলি ইতিহাস। সেই ফেলে আসা সময়ের অনেক কিছু হারিয়ে যায়, হারিয়ে গেছে বটে আমাদের জীবন থেকে, কিন্তু জ্বলন্ত সূর্যের দীপ্তি হয়ে রয়ে গেছে ১৯৭১।'

বাঙালি জাতি পরাধীনতার শেকল ভেঙে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। ২৪ বছরের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক নতুন সূর্যোদয়। প্রভাত সূর্যের রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সমস্বরে একটি ধ্বনি যেন নতুন বার্তা ছড়িয়ে দেয় 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।' মহামুক্তির আনন্দঘোর এই দিনে এক নতুন উল্লাস জাতিকে প্রাণ সঞ্চার করে সজিবতা এনে দেয়। যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি চোখে আনন্দ অশ্রু আর ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যায় সামনে। বিন্দু বিন্দু স্বপ্নের অবশেষে মিলিত হয় জীবনের মোহনায়। 'বিশ্ব কবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের তাহার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।' বাঙালি যেন খুঁজে পায় তার আপন সত্তাকে।

আদি বাঙালির সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক জীবন এবং ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে বাঙালির শৌর্য-বীর্য যেন আর একবার ধপ করে জ্বলে ওঠে। প্রথম আগুন জ্বলে '৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি। ফাগুনের আগুনে ভাষা আন্দোলনের দাবি আর উন্মাতাল গণমানুষের মুষ্টিবদ্ধ হাত একাকার হয়ে যায় সেদিন। ভাষার জন্য প্রথম বলীদান বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে। সেই থেকে শুরু হয়ে যায় বাঙালির শেকল ভাঙার লড়াই। পাকিস্তানিদের সাথে হিসাব-নিকাশের হালখাতার শুরুতেই রক্তের আঁচড় দিয়ে বাঙালি শুরু করে তার অস্তিত্বের লড়াই। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত হওয়া বাংলার স্বাধীনতা আবার ১৯৭১ সালে উদিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বদৌলতে। '৫২ সালে যে আগুন জ্বলেছিল রাজধানী ঢাকা শহরে সে আগুন যেন ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশের আনাচ-কানাচ–সবখানে। যে আগুন জ্বলেছিল মোদের প্রাণে, সে আগুন ছড়িয়ে যায় সবখানে। বাঙালির বুকের

ভেতর জ্বলে ওঠা আগুন যেন সহস্র বাঙালির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। বাষট্টি, উনসত্তর এবং সত্তর শেষ করে একাত্তরে বাঙালি জাতি হিসাব করতে বসে। হিসাব-নিকাশ আর দেনা-পাওনায় পাকিস্তানিরাও বসে থাকেনি। তারাও অঙ্ক কষতে থাকে কীভাবে বাঙালি জাতিকে যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শেকল পরিয়ে রাখা যায়। তাদের কাছে এই অলংকারই বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য। ঘড়ির কাঁটার টিক টিক শব্দ জানিয়ে যায় সময় আসছে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দেওয়ার পালা। অবশেষে গভীর কালো নিকষ আঁধার থেকে জেগে ওঠে হিরন্ময় হাতিয়ার। ৭ই মার্চ একাত্তরের বিশাল জনসমুদ্র থেকে যুগের কবি, মহাকাব্যের প্রণেতা বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব–ইনশাল্লাহ।' এই একটিমাত্র উচ্চারণে যেন বাঙালি সত্যিকার দিকনির্দেশনা পেয়ে যায়। চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালি। বাঙালি বুঝে যায় শেষ কামড় দেওয়ার সময় আসন্ন। পাকিস্তানিরাও আর বসে নেই। পুরো জাতিকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে মারাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে ২৫ মার্চ একাত্তর ঘুমন্ত জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় বাঙালি নিধন যজ্ঞ। বাতাসে লাশের গন্ধ, বারুদে বারুদে আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ। এ যেন এক প্রেতপুরী। আকাশে শকুনের উদ্যত থাবা, নিচে বিপন্ন মানুষের বিলাপ। হায় বাংলাদেশ। একি বাংলাদেশ। এ যেন এক জ্বলন্ত শ্মশান। কিন্তু ঠিকই হাড়ের আর খুলির স্তূপ একদিন পাললিক হয়। মুক্তিপাগল বাংলার দামাল ছেলেরা স্বাধীনতার রক্তসূর্যকে ছিনিয়ে আনবে বলে একদিন অস্ত্র কাঁধে তুলে নেয়। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার সবাই শরিক হয়ে থাকে এ লড়াইয়ে। যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকে আরো শাণিত হয় প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র। লক্ষ্য স্থির রেখে শত্রু হননে দৃঢ়তায় এগিয়ে যায় বীর বাঙালি। ইতোমধ্যেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী ভারতও জড়িয়ে পড়ে বাঙালির ভাগ্যযুদ্ধে। ডিসেম্বর শেষ পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত রূপ নেয় এই যুদ্ধের। অবশেষে ৯ মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতির জীবনে এলো নতুন প্রভাত। ১৬ই ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সূচিত হলো মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য বিজয়। এর মধ্য দিয়ে এলো হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বাঙালি জাতি এদিন অর্জন করে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার। ৩০ লাখ শহিদের রক্ত আর দুই লাখ ধর্ষিতা মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা ধরা দেয় বাঙালির জীবনে। বিজয় দিবস বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য এবং বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিন। বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সাল থেকে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চে গণহত্যা শুরু হলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাখ শহিদ

ও দুই লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। সেই হিসাবে বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তির দিন ছিল গত বিজয় দিবস। গত বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে দেশ ও জাতি। হাজার বছর ধরে পরাধীন বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৭১ এমন মহত্তম আশাজাগানিয়া উদ্বেল সময় আর কখনো আসেনি। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর শঙ্কা জেনেও এমন দুঃসাহসী আর ঐক্যে অটুট যোদ্ধার ভূমিকায়ও কখনো আর দেখা যায়নি বাঙালিকে। মহান মুক্তিযুদ্ধ বিজয় ও স্বাধীনতার ৫১ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা যারা বেঁচে আছি নিঃসন্দেহে তারা বড়ো ভাগ্যবান। কত বীর মুক্তিযোদ্ধা '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের উল্লাসে মুক্ত জন্মভূমিতে স্বাধীনতা অর্জনের আনন্দে উল্লসিত হয়েছেন, কিন্তু স্বাধীনতার ৫১ বছর পরে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে সমৃদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত বাংলাদেশকে তাঁরা দেখলেন না, শামিল হতে পারলেন না এমন ঐতিহাসিক গৌরবময় আনন্দ উদযাপনে। কী বিস্ময়করভাবেই না বদলে গেছে বাংলাদেশ! অনুন্নত, দারিদ্র্যপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, একটা ভূখণ্ড কীভাবে সচ্ছল, সমৃদ্ধশালী, তথা উন্নয়নের আলোয় আলোকিত, প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগের আধুনিকতম সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত আজকের বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ থেকে আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত আমাদের যাদের অভিজ্ঞতা, আবারও বলি সত্যিই তারা ভাগ্যবান। গত বছর মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে গিয়ে আমাদের মনে পড়েছিল ১৯৭১ সালের লাখ লাখ মানুষের আত্মাহুতি, স্বাধীনতার বেদিমূলে তাঁরা তাঁদের বর্তমান উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য। ৩০ লাখ শহিদ আর কয়েক লাখ মা-বোন তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এই স্বাধীনতার জন্য। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো আজ প্রবীণদের স্মৃতির জানালা খুলে দেবে, পেছন ফিরে তাকালে কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ছবি ভেসে উঠবে। প্রিয় মাতৃভূমি মৃত্যুগুহা হিসেবে দেখতে বাধ্য হওয়া অগণিত মানুষের অশ্রু আর রক্তের মর্মস্পর্শী সেই ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতিকে আপ্লুত করে দেবে নিশ্চয়ই।

এই ডিসেম্বরে নিঃসন্দেহে স্মৃতিতে ভেসে উঠবে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৬ই ডিসেম্বর শেষ বিকেলে জেনারেল নিয়াজির পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের সেই দৃশ্য, যা বাঙালির জন্য অনন্য গৌরবের স্মৃতি হয়ে আছে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নির্বাচনে বিজয় থেকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় পর্যন্ত অনন্য ঘটনাপ্রবাহ চোখের সামনে ভেসে উঠবে আজ। মনে হয় যেন এ সবই সেদিনের ঘটনা! অথচ ৫১ বছর হয়ে গেল। ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট সামরিক শাসনে পিষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় বাংলার মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ ২৩ বছর

যে কঠিন ত্যাগস্বীকার আর প্রাণপণ সাহসী সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের ঘটনাবলিও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর ডিসেম্বরে আমাদের স্মৃতিতে ধ্রুবতারার মতো দেদীপ্যমান হয়ে জ্বলছিল। বলতে গেলে পাকিস্তানে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলার মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি আর অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক আঘাত আসার পর থেকে দিনে দিনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধিকারের সংগ্রাম এসে একাত্তরে উপনীত হয় স্বাধীনতাসংগ্রামে। ১৯৬৬ সালেই বঙ্গবন্ধু চূড়ান্ত নকশা প্রণয়ন করেছিলেন স্বাধীনতার গন্তব্যে যাওয়ার। সেসব ইতিহাস আজ সর্বজনবিদিত। একাত্তরে বাংলাদেশে যে কঠিন মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তার সোনালি ফসল আজ ঘরে তুলছে বাংলাদেশ। একদিন সাম্রাজ্যবাদীরা যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিল, তলাবিহীন ঝুড়ি বলে অপমানের অপচেষ্টা করেছিল, আজ তারাই বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দেখার জন্য স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশসমূহকে পরামর্শ দিচ্ছে। বাংলাদেশে আপন দক্ষতায় স্বনির্ভর উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় ভূষিত। বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বে গত এক যুগে বদলে গেছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ এক দ্রুত উন্নয়নশীল বিকাশমান অর্থনীতির রাষ্ট্র। সংগত কারণেই আজ ৫০ বছর পেরিয়ে এসে আমাদের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির দিকেও দৃষ্টিপাত করা দরকার। ৩০ লাখ শহিদের রক্তস্নাত এই বাংলাদেশে যদি সর্বক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হয়ে উঠতে না পারে, তাহলে সব আনন্দই ম্লান হয়ে যাবে। অর্জনের আনন্দ আমাদের গর্বিত করছে, কিন্তু আগামী দিনগুলোতে যদি উন্নয়নের এই প্রবাহ বেগবান রাখা না যায়, তাহলে তা হবে লাখো শহিদের মৌন দীর্ঘশ্বাস আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হতাশার; যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন–এমন কোনো মানুষের কাম্য হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের ৫১ বছর পরে আজ বাংলাদেশ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তা কম গৌরবের নয়। কিন্তু এই গৌরবের পাশেই ইতিহাসের কিছু কলঙ্কও রয়ে গেছে। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিজয়কে শাণিত করেছিল। তিনি স্বদেশে ফিরে যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তুলতে দিন-রাত পরিশ্রম করছেন, যখন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় সন্তোষজনক পর্যায়ে উত্তীর্ণ, যখন জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদস্য পদ অর্জন বাংলাদেশকে বিশ্বপরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিচিতি এনে দিয়েছে, তখনই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ভয়ংকর ধাক্কা সামলানো বাংলাদেশের জন্য এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল বৈকি। জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুধু বাংলাদেশকে অভিভাবকশূন্যই করা হয়নি, মুক্তিযুদ্ধের প্রগতিশীল চেতনার যে রাষ্ট্রদর্শন, সেই শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নকেও হত্যা করা হয়েছে। তাঁর অবর্তমানে যাতে নেতৃত্ব গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। যে কারণে একাত্তরের ঐক্যবদ্ধ জাতির বিভক্তি ঘটিয়ে আবার সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাজনীতির উত্থান ঘটে, যার বিষফল আজও বাংলাদেশকে ভোগ করতে হচ্ছে। পাকিস্তানি দর্শনে উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা পেয়েছে রাষ্ট্রীয় সমর্থন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সাল

পর্যন্ত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত স্রোতেই প্রবাহিত হয়েছে। অধিকাংশ সময় কেটেছে সামরিক শাসনে। কখনো সামরিক পোশাকে, কখনো সিভিল পোশাকে। ফলে ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটলেও জনসাধারণের জীবনমান উন্নত হয়নি। দরিদ্র মানুষ আরো দরিদ্র হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার কথা চিন্তাও করা হয়নি। দুস্থ-দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সভ্য রাষ্ট্রের জন্য অনিবার্য কর্মসূচি। কিন্তু সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যও বাংলাদেশকে ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই একটি ঘটনা থেকেই অনুধাবন করা যায় প্রগতিশীল আধুনিক দর্শন থাকলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়। গত এক যুগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির দিক থেকে যে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, তা বিশ্ববাসীর কাছেও বিস্ময়। বঙ্গবন্ধু যদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার না হতেন, যদি আর ১০টি বছরও বেঁচে থাকতেন, তাহলে এই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর একটি হিসেবে গৌরবের আসন নিশ্চিত করতে পারত। কিন্তু পরাশক্তিসহ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দেশি-বিদেশি নানা শক্তির গভীর চক্রান্ত সেই স্বপ্ন নস্যাৎ করে দিয়েছিল জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে। বিলম্বে হলেও আজ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ বাংলাদেশ বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু আরো বহুদূর যেতে হবে সত্যিকারের সুখী-সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর আজীবন স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২১)

লেখক : বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি

জাফর ওয়াজেদ

প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির একটি রোগ। তাই ৫০ বছর আগে যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করা দূরে থাক, উপরন্তু বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা হয়নি বলে সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে গ্লানিময় কণ্ঠে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কখনো পরাভব মানেনি। তাই স্বদেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চার দশক পর হলেও অব্যাহত রেখেছে। এবার পাকিস্তানি সেই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রতীকী হলেও শুরু করতে যাচ্ছে। বিশ্ব জনমত আজ হোক, কাল হোক, এদের বিচারের জন্য পাকিস্তানকে চাপ দেবেই।

স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও প্রশ্ন ওঠে–এখনো কেন ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার হলো না। বিচার ছাড়াই তাদের কেন পাকিস্তানিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। কেন পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি দিয়েও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পদক্ষেপ নেয়নি। আটকে পড়া বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে ফেরত এলেও বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিরা এখনো কেন পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করছে না? প্রশ্ন যখন আছে, উত্তরও তার রয়েছে দণ্ডায়মান। কেন, কী কারণে যুদ্ধবন্দিরা মুক্তি পেল? এর নেপথ্যে ঘটনার ঘনঘটা কম নয়।

৫০ বছর আগে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার সেনাদের আত্মসমর্পণ। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত–এই তিন দেশের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক টানাপোড়েন শুরু হয়। যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের বিচার নিয়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়। ভারত এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই সমর্থন করে; কিন্তু ভারতের তখন তাদের আশ্রিত প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির ভরণপোষণ নিয়ে হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। বাংলাদেশও আটকে পড়া পাকিস্তানিদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পক্ষে তাদের ভরণপোষণও অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদিও এরা তখন থেকেই জেনেভা কনভেনশনের অধীনে। যেমন ছিল পাকিস্তানি পরাজিত সেনারা। ভারত যেহেতু আন্তর্জাতিক জেনেভা কনভেনশনের সদস্য এবং যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, তাই যুদ্ধবন্দিদের রক্ষা করার জন্য দেশটি আন্তর্জাতিকভাবে দায়বদ্ধ। যে কারণে পাকিস্তানি হানাদাররা বাঙালি মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে আগ্রহী হয়নি। হলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদা পেত না। যদিও যৌথ বা মিত্রবাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু দলিলে মিত্রবাহিনীর বাঙালি পক্ষের স্বাক্ষর নেই। তবে বাংলাদেশি পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের জন্য যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তাতে যৌথ বাহিনীর কথা উল্লেখ ছিল। আত্মসমর্পণ দলিলেও বলা হয়, 'আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সব পাকিস্তানি সামরিক ও

আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।' এতে হানাদারদের স্থানীয় সহযোগী রাজাকার, আলশামস ও আলবদররা জেনেভা কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এদের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের হাতে ন্যস্ত বলে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছিলেন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতে স্থানান্তরকালে।

যুদ্ধবন্দিদের যাতে বিচার হতে না পারে, সে জন্য পাকিস্তান তখন 'তুরুপের তাস' হিসেবে সে দেশে আটকে পড়া চার লাখ বাঙালিকে জিম্মি করার হুমকি দেয়। যুদ্ধবন্দিদের দ্রুত পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর জন্য জাতিসংঘসহ মুসলিম দেশগুলো ভারত ও বাংলাদেশকে চাপ দিতে থাকে। একাত্তরের সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে তখন শুরু হয় তিন দেশের মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই এবং তাতে বিশ্বের অন্য দেশগুলোও জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশই প্রথম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটাকে সামনে নিয়ে আসে। মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম কামারুজ্জামান ১৯৭১-এর ২৭ ডিসেম্বরে ঘোষণা দেন যে, 'বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৩০ জন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছে এবং গণহত্যায় সহযোগিতার জন্য অচিরেই তাদের বিচার হবে।' এর পরই একাত্তরে গণহত্যার শিকার সাত বাংলাদেশি কর্মকর্তার পরিবারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে দোষী পাকিস্তানিদের বিচারে বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়ে কলকাতায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য ডিপি ধর বলেন, 'ভারত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন পরীক্ষা করছে। সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারত স্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে, 'যুদ্ধাপরাধী বিচারের ব্যাপারটি বাংলাদেশের এখতিয়ারের ভেতর। কারণ, পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে। ফলে এ নিয়ে ভারতের একার বলার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই। যা কিছু করতে হয় তা বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার ভিত্তিতেই করতে হবে।' বাংলাদেশ সরকারও ঘোষণা দেয় যে, 'কূটনৈতিক স্বীকৃতির আগে এবং সম্পর্কের সমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা বলতে সে প্রস্তুত নয়। আর ১৯৭১-এর ২০ ডিসেম্বরে ক্ষমতায় বসে ভুট্টো দেখলেন, তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখা সহজ নয়। 'জাতশত্রু' ভারতের কাছে হেরে এবং আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের তখন করুণ দশা। ভুট্টো জাতিসংঘে দাবি তোলেন—ভারতে আশ্রিত দ্রুত তাঁর ৯৩ হাজার সেনাকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ তখন গোঁ ধরে বসে আছে; যুদ্ধাপরাধের জন্য তারা পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করবে। সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধাপরাধী সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের এক তালিকাও বাংলাদেশ তৈরি করে। ভুট্টোর জন্য তখন প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল সে বিচার ঠেকানো এবং যুদ্ধাপরাধীসহ সব বন্দিকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া। ভুট্টোর জন্য এই এজেন্ডা পাকিস্তানি জেনারেলরা ঠিক করে দেয় ক্ষমতায় বসার প্রথম দিন থেকেই। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন সে সময় ছিল পাকিস্তানের বিবেচনার বাইরে বরং যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখবে না বলে পাকিস্তান ঘোষণা দেয়।

তাই দেখা যায়, ১৯৭২-এর প্রথম দিকে ছোটো ছোটো গোটা কয়েক দেশের সঙ্গে পাকিস্তান তার সম্পর্ক ছেদও করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করায় যুক্তরাজ্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ থেকেও বেরিয়ে আসে।

বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। সে অনুযায়ী বিচারের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার বাহাত্তরের ২৯ মার্চ ঘোষণা করে যে জেনারেল নিয়াজি, রাও ফরমান আলীসহ ১১০০ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হবে। সে জন্য একটি প্রস্তাবনাও উপস্থাপন করা হয়। যাতে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীর বিচারে দেশি-বিদেশি জুরি নিয়োগ এবং অন্যদের জন্য শুধু দেশীয় জুরি নিয়োগের উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সেসব পাকিস্তানি সেনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়, যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে 'প্রাইমা ফেসিইকেল' যোগ করতে পারবে। বাংলাদেশের সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ১৪ জুন ভারত সরকার নিয়াজিসহ প্রাথমিকভাবে ১৫০ যুদ্ধবন্দিকে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ জুন বঙ্গবন্ধু পুনরায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলার মাটিতেই তাদের বিচার করা হবে।

১৯৭২ সালের ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই ভারতের শৈলশহর সিমলায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্দিরা-ভুট্টো বৈঠক। ভুট্টোকন্যা ১৮ বছর বয়সি বেনজিরও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ইন্দিরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। প্রথমে ইন্দিরা ও ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক হয় অন্য কোনো উপদেষ্টা বা পরামর্শক ছাড়াই। এরপর উভয় সরকারের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের উপস্থিতিতে ইন্দিরা-ভুট্টোর মধ্যে আরো কয়েক দফা বৈঠক হয়। অতঃপর দুই দেশের মধ্যে অতীতের সব সংঘর্ষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংকল্প ব্যক্ত করে ইন্দিরা ও ভুট্টো এক চুক্তি সই করেন। এটাই 'সিমলা চুক্তি' নামে খ্যাত। সামরিক ও রাজনৈতিক নানা দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নিয়ে বৈঠকে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের স্বীকৃতি বা যুদ্ধবন্দি ফেরত নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। চুক্তিতে কাশ্মীর সীমান্তসহ দ্বিপক্ষীয় কতিপয় বিষয়, যেমন : পাকিস্তানের যে অঞ্চল ভারত দখল করেছে, তা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সিমলা চুক্তির পরপরই বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে।' প্রতিবাদ জানান ভুট্টো, 'পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচার করার কোনো অধিকার বাংলাদেশের নেই। কারণ পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনীর কাছে।' তখন ভারত সরকার বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, 'প্রকৃত সত্য এই যে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে। আর এ কারণেই যুদ্ধবন্দিদের প্রশ্নে যেকোনো সিদ্ধান্ত ভারত ও বাংলাদেশের মতৈক্যের ভিত্তিতেই গৃহীত হবে।'

যুদ্ধবন্দিদের বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার সে দেশে আটকে পড়া চার লাখ বাঙালিকে তখন 'জিম্মি' করে। বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারী সন্দেহে বহুজনকে বন্দিশালায় আটকে রাখে। প্রায় ১৬ হাজার বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা, যাদের একাত্তরেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল, তাদের পাকিস্তান ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তান সেখানে আটকে পড়া বাঙালিদের পরিবারসহ অমানবিক পরিবেশে বন্দিদশায় রাখে। অনেক বাঙালি আফগানিস্তানের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দেশে আসার পথে মারা যান। যাঁরা আফগানিস্তান হয়ে পালিয়ে আসছিলেন, সেসব বাঙালিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ভুট্টো সরকার মাথাপিছু এক হাজার রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বাঙালিবিদ্বেষী অনেক পাকিস্তানি অসত্য অভিযোগ এনে প্রতিবেশী অনেক বাঙালিকে পরিবারসহ ধরিয়ে দেয়। যাদের পুলিশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি পাকিস্তানে বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন পেশ করেছিল। যাতে বলা হয়েছিল, 'হাজার হাজার বাঙালি বিনা বিচারে জেলে আটক আছে। পাকিস্তান ত্যাগ করতে পারে–এই অভিযোগে বাঙালিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিদিনই তাদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং তারা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা উঁচু পদে রয়েছেন এবং বিত্তবান, তাঁরা দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছেন। বাঙালিদের 'নিগার' বা নীচুজাত হিসেবে দেখা হচ্ছে। যারা ইতোমধ্যেই নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার, তাদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। তবে সেনাবাহিনীসহ সরকারি উঁচু পদে অনেক বাঙালি পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে চাকরিরত রয়েছেন।' যেসব বাঙালি নারী বা পুরুষ পাকিস্তানি বিয়ে করেছেন, তাঁদের অবশিষ্টাংশ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বহাল তবিয়তে সে দেশে রয়ে যান। ভুট্টো প্রকাশ্য জোরগলায় বলেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাংলাদেশের প্রস্তাবের বিপরীতে পাকিস্তান আটকে পড়া বাঙালিদের জিম্মি করতে বাধ্য হয়েছে।'

আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত আনার জন্য তাদের পরিবার ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। প্রয়োজনে যুদ্ধাপরাধীদের বিনিময়ে তাদের স্বজনদের ফেরত আনার দাবি জানাতে থাকে। এই দাবিতে তারা সমাবেশ এবং অনশন পালন অব্যাহত রাখে। ১৯৭২ সালের ৪ মে ঢাকাজুড়ে জনতার বিক্ষোভ মিছিল বের হয় বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে। সরকারের ওপর তারা ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকে। আটকে পড়া বাঙালিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ তখন বিশ্ব জনমতের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের সাহায্য কামনা করে ভারতের মাধ্যমে আবেদন জানায়। অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় নিহত শহিদদের পরিবারগুলো সারা দেশে সভা-সমাবেশ করতে থাকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার দালাল আইন জারি করে। আলবদর, আলশামস, রাজাকারসহ দালালদের গ্রেফতার অব্যাহত রাখে এবং বিচারকাজ শুরু করে। চীনাপন্থি দল, উপদল ও গ্রুপ এবং মওলানা ভাসানী এই আইন বাতিলের দাবি জানাতে থাকেন। তাঁরা এই আইনে কাউকে গ্রেফতার করা

যাবে না বলে সভা-সমাবেশ ও মিছিলে হুঁশিয়ারি জারি করেন। পাশাপাশি মুজাফফর ন্যাপ, সিপিবিসহ কয়েকটি দল আটকে পড়া পাকিস্তানিদের দ্রুত পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর দাবি তুলতে থাকে। নানামুখী চাপে তখন বঙ্গবন্ধু সরকার। অন্যদিকে ভুট্টো বুঝতে পেরেছেন, আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত নিতে শেখ মুজিবের সরকার চাপের মুখে রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি না করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কর্মরত সেনা সদস্য ও চাকরিজীবী কয়েক শ বাঙালিকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধু তাদের মুক্তি দেওয়ার দাবি জানালেও ভুট্টো তাতে সাড়া দেননি বরং আটকে পড়াদের বিনিময়ে সব যুদ্ধবন্দিকে ফেরত নিতে ষড়যন্ত্র আঁটে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভুট্টো বিহারি অধ্যুষিত সিন্ধুপ্রদেশে 'বিহারি বাঁচাও' নামে মিছিল-সমাবেশ করান এবং আন্তর্জাতিক মহলকে এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে আবেদন জানালেও বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

১৯৮৯ সালে দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওমান এরিয়াস' গ্রন্থে অধ্যাপক ডেনিস রাইট উল্লেখ করেছিলেন, সে সময়ের কথা 'বিকৃত বিচারের বদলে যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্নটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় দেশের জন্যই একটি 'কূটনৈতিক তুরুপের তাস'-এ পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ একে ব্যবহার করছে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। আর পাকিস্তান স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে দাবি করছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নাকচ করার জন্য।'

যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সেনাদের নিয়েও বিপাকে পড়ে ভারত। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এদের নিরাপত্তা, খাওয়াদাওয়াসহ ভরণপোষণ এবং ভাতা প্রদান করতে হতো ভারতকেই। এ খাতে প্রতি মাসে ব্যয় দাঁড়াচ্ছিল এক লাখ ডলারের বেশি। যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধবিরতি চুক্তিও সই হয়েছে, পরাজিতরা আত্মসমর্পণও করেছে। সুতরাং তাদের আর আটকে রাখার পক্ষে কোনো যুক্তিও ভারতের সামনে তখন ছিল না। ভারত আকাশবাণীর বিশেষ চ্যানেল চালু করে, যেখান থেকে যুদ্ধবন্দিরা পাকিস্তানে তাদের পরিবারের কাছে নিজের অবস্থা জানান দিয়ে বার্তা প্রচার করতে থাকে। তাই দেখা যায়, বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডাইম ভারত সফরে এসে ইন্দিরা গান্ধীকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দেন। ইন্দিরা অবশ্য সরাসরি জানিয়ে দেন, বাংলাদেশের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারত একতরফাভাবে কিছু করতে পারে না, করবেও না। ইন্দিরা জানতেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে শেখ মুজিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকায় ১৫০০ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যথাযথ তথ্য-প্রমাণ হাজির করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় তালিকা কমিয়ে আনে। শেষে তা দাঁড়ায় ১৯৫ জনে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত বাংলাদেশের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি এই তালিকা করে। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে যুদ্ধবন্দি বিষয়ে প্রথম আইন পাস করা হয়।

দিল্লি থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ; সার্চ ফর নিউ রিলেশনশিপ' গ্রন্থে অধ্যাপক মুহম্মদ আইউব লিখেছেন, 'ভুট্টো জানতেন, তাঁর দেশের আটক যুদ্ধবন্দি ভারতের জন্য বোঝাস্বরূপ। আজ বা কাল হোক, ভারতকে সব যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দিতেই হবে। ফলে এই প্রশ্নে দেনদরবার করে কোনো বাড়তি ফায়দা আদায় হবে না। ভুট্টো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন ও হেনস্তা করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। পুরো ১৯৭২ সাল তাই ভুট্টো বাংলাদেশকে ভারতের অধিকৃত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতেন। ১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো বলেন, 'বাংলাদেশ ভেবেছে যে আমাদের বন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে তাদের ভেটো ক্ষমতা আছে। ভেটো আমাদের হাতেও একটা আছে।' ভুট্টো জানান যে 'পাকিস্তানের অনুরোধে চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের বিষয়ে ভেটো দেবে।' সে সময় সদ্য-স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশ সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন করে। ২৫ আগস্ট চীন নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের বিষয়ে ভেটো দেয়। বাংলাদেশের অপরাধ তখন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করা। তদুপরি বাংলাদেশ বিচারের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। দূতিয়ালির জন্য বঙ্গবন্ধু চীনেও প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন গোপনে। চীন তখন পাকিস্তানের বিষয়ে অন্ধ এবং গণহত্যাকারীদের বিচারের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। ফলে বাংলাদেশের দূতিয়ালি সফল হতে পারেনি। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল পুরো একাত্তর সালসহ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত।

১৯৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভুট্টো ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন, 'কয়েক শ পাকিস্তানি বন্দিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার জন্য রেখে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁর আপত্তি নেই।' কিন্তু ১৯৭৩ সালে ভুট্টো তাঁর মত পরিবর্তন করে বলেন, 'পাকিস্তানি বন্দিদের বিচার করা হলে সেই আটকে পড়া বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' (হু কিল্ড মুজিব, এএল খতিব)। ১৯৭২ সালের নভেম্বরে ভারতে আটক পাকিস্তানি সেনা পরিবারের প্রায় ৬ হাজার সদস্যকে মুক্তি দেয়। বিপরীতে পাকিস্তানও আটকে পড়া ১০ হাজার বাঙালি নারী ও শিশুর একটি দলকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসনে সম্মত হয়। কিন্তু পাকিস্তানে আটক অধিকাংশ বাঙালির কী হবে, এ নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে বাংলাদেশের। যুদ্ধবন্দি ও আটকে পড়া বাঙালিদের বিনিময় নিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতার আড়ালে চাপা পড়ে যেতে থাকে আটকে পড়া পাকিস্তানি তথা বিহারিদের ফেরত যাওয়ার বিষয়টি। জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন এদের শরণার্থী হিসেবে মর্যাদা দেয়। এরা যেসব ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়, তা জেনেভা ক্যাম্প নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রায় ৬ লাখ বিহারি পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। এদের একটা অংশ ১৯৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মিরপুর দখল করে রেখেছিল। আলশামস বাহিনীর

সদস্যও ছিল এরা। ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই ব্রিটিশদের কূটকৌশলে বিহার থেকে এরা এ দেশে আসে রেলসহ অন্যান্য সেক্টরে কাজের জন্য। পাকিস্তান যুগে এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃজনে এরাই প্রধান নৃশংস ভূমিকা রেখেছিল। প্রচণ্ডভাবে বাঙালিবিদ্বেষী বিহারিরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় জায়গা-জমি দখল করে গোত্রভুক্ত হয়ে থাকত। ১৯৭১ সালের মার্চে এরা বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। আর পুরো ৯ মাস গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটে এরা পাকিস্তান বাহিনীর বিশ্বস্ত হিসেবে নৃশংস হয়ে উঠেছিল। এদের একটি বড়ো অংশ, অর্থাৎ বিত্তবানরা ডিসেম্বরের আগেই পাকিস্তান চলে যায়। দরিদ্র বিহারিরা আর পালানোর পথ পায়নি। পাকিস্তানি হানাদাররাও এদের সঙ্গে নিয়ে যায়নি। এই আটকে পড়ারা পাকিস্তান যাওয়ার জন্য চার দশকেরও বেশি অপেক্ষমাণ।

যুদ্ধাপরাধী বিচারের পথ বন্ধ করতে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় লেখা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বাংলাদেশের সরকারপ্রধান শেখ মুজিবকে পরামর্শদান উপলক্ষে জানিয়ে দিয়েছেন যে একটি বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার করা হলে পাকিস্তানের হতোদ্যম জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তা সামলাতে পারবেন না এবং এর ফলে উপমহাদেশে শান্তি স্থাপন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রত্যাহারের জন্য এটাই প্রথম বিদেশি চাপ তা নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেন এ ধরনের পরামর্শ দিয়েছে, তাও নয়। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে গণহত্যায় লিপ্ত, তখন যেসব মুসলিম দেশ এসবেরও প্রতিবাদ করেনি, তারা ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর জন্য গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিশেষত, মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভাগ্যের সঙ্গে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ে। তখন ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল টানা চার দিনের আলোচনা শেষে বাংলাদেশ ও ভারতে যৌথ ঘোষণায় যুগপৎ প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব রেখে বলে, যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আটক সব নাগরিককে একযোগে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হবে। এর আগে তিনটি দেশ নাগরিকদের সাতটি ক্যাটাগরি প্রণয়ন করেছিল। এই তালিকায় আটকে পড়া বাঙালি ও বিহারি ছাড়াও পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি। তাই প্রস্তাব আনা হয়, ভারত সে দেশে আটক প্রায় ১০ হাজার বন্দিকে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করবে। বিনিময়ে পাকিস্তান সে দেশে আটকে থাকা বাঙালিদের মধ্যে দুই লাখকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশে আটক প্রায় দুই লাখ ৬৩ হাজার অবাঙালি তথা বিহারিকেও পাকিস্তান ফেরত নেবে। তারপরও বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি থেকে সরে আসেনি। এমনকি অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের এই প্রত্যাবাসন প্রস্তাবের বাইরে রাখে। যুগপৎ এই প্রত্যাবাসনে ভুট্টো সায় দিলেও মাত্র ৫০ হাজার বিহারিকে ফেরত নিতে রাজি হয়। তবে ভুট্টো বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানান। সদম্ভে ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশ যদি

অভিযুক্ত পাকিস্তানিদের বিচার করে, তাহলে তিনি পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশের নাগরিকদের একই রকম ট্রাইব্যুনালে বিচার করবেন।' ১৯৭৩ সালের ২৭ মে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো বলেন, 'বাঙালিদের এখানে বিচার করার দাবি জনগণ করবে। আমরা জানি, বাঙালিরা যুদ্ধের সময় তথ্য পাচার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হবে। কতজনের বিচার করা হবে, তা এখনই বলতে পারছি না। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করে, তাহলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্যুর মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সরকারের পতন ঘটাবে এবং দুই দেশের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে। এই চক্রান্তের জন্য ইতোমধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েক শীর্ষ কর্মকর্তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।'

ভুট্টোর এসব বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদ করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৩ সালের ৭ জুন নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ভোলা সম্ভব নয়। এই হত্যা, ধর্ষণ, লুটের কথা জানতে হবে। যুদ্ধ শেষের মাত্র তিন দিন আগে তারা আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। তারা প্রায় দুই লাখ নারীকে নির্যাতন করেছে, এমনকি ১৩ বছরের মেয়েকেও। আমি এই বিচার প্রতিশোধের জন্য করছি না। আমি এটা করছি মানবতার জন্য। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে বাঙালিদের বিচারের হুমকির প্রতিবাদ করে বলেন, 'এটা অবিশ্বাস্য। এই মানুষগুলো চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তা; যারা বাংলাদেশে ফেরত আসতে চায়, ওরা কী অপরাধ করেছে? এটা ভুট্টোর কী ধরনের প্রতিহিংসাপরায়ণতা।' কিন্তু ভুট্টোর কুমন্ত্রণা তার আদ্যোপান্ত জীবনজুড়ে। তিনি ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াতে থাকেন। পাকিস্তান সে দেশে আটক ১৯৫ শীর্ষ বাঙালি কর্মকর্তাকে বিচারের জন্য গ্রেফতার করে বলে ১৯৭৩ সালের ২৬ আগস্ট নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় সফরে যান যুগোশ্লাভিয়ায়। এ সময় পাকিস্তানি নোবেলজয়ী পরমাণুবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম এক পত্রে বঙ্গবন্ধুর জামাতা ড. এম ওয়াজেদ মিয়াকে জানান, তিনি বেলগ্রেডে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভুট্টোর একটা বৈঠকের আয়োজন করতে চান। পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব নাকচ করে দেন। প্রফেসর সালাম বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে পত্রে অনুরোধ জানান, 'শেখ সাহেবের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির মধ্যে শুধুমাত্র ১৯৫ কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে বাকিদের বিনা শর্তে মুক্তি দেন। পরবর্তীতে ১৯৫ জনের বিচার করে ওদের থেকে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ফাঁসি দেওয়া যেতে পারে।'

বাংলাদেশ ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস, দালালদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারি করে। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশের নয়া সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এতে

৪৭(৩) ধারা সংযুক্ত করা হয়। যাতে 'গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিত্বে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করার বিধান' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০ জুলাই জারি করা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩। ফলে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাদের জন্য পাকিস্তানি সেনা এবং দেশীয় যুদ্ধাপরাধী রাজাকার, আলবদরদের বিচারের ব্যবস্থা নেওয়ার পথ সহজ হয়।

বাংলাদেশও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অনড় অবস্থানে থাকে। তবে ভারতের শিবিরে থাকা অন্য যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে অনাগ্রহী ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের বিপরীতে চীনের অবস্থান ভারতকে বিপাকে ফেলে। চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াতে ভারত তখন আগ্রহী নয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণেই। আন্তর্জাতিকভাবে যেমন, তেমনই অভ্যন্তরীণভাবেও ইন্দিরা সরকারের ওপর চাপ তৈরি হতে থাকে। যাতে ভারত দ্রুত সব যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিমলা চুক্তির সূত্র ধরে ভারত-পাকিস্তান দুই দফা বৈঠকে বসে। ১৯৭৩-এর জুলাইয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এবং আগস্টে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইন্দিরার বিশেষ উপদেষ্টা পিএন হাকসার এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর একটি চুক্তি সই হয়। ভারতে আটক থাকা পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এই লোক বিনিময় শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বাকি ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিষয় চূড়ান্ত করবে। কিন্তু বাংলাদেশকে আলোচনায় না রাখায় দুটি বৈঠকে চুক্তি জোরালো হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, একমাত্র সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ এ ধরনের কোনো আলোচনায় বসতে পারে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এই চুক্তি সই হওয়ায় স্বভাবতই আশা করা হয়েছিল যে অতঃপর পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে; কিন্তু বাস্তবে স্বীকৃতিদান দূরের কথা, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ঠেকিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তান ধরনা দেয় গণচীনের দরবারে। পাকিস্তানের প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহম্মদ পিকিং (বেইজিং) ছুটে যান এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে চীনা নেতাদের সঙ্গে দেনদরবার করেন। অতঃপর আজিজ আহম্মদ এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানি ১৯৫ যুদ্ধবন্দির বিচারের সিদ্ধান্ত বাতিল না করা পর্যন্ত পাকিস্তান ও চীন বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপ্রাপ্তির বিরোধিতা করে যাবে।'

১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট যে দিল্লি চুক্তি সই হয়, তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে বাংলাদেশকে ছাড় দিতে হয়। চুক্তিতে বলা হয়, পাকিস্তান বাঙালি 'গুপ্তচরদের' বিচার করবে না। আর যে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশ চিহ্নিত করেছে, তাদের বিচার হবে এবং বাংলাদেশেই হবে। তবে এ ব্যাপারে যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে, তবেই তা হবে। বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা এর পরও উল্লেখ করতে থাকে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে একতরফাভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ আর থাকেনি। দিল্লিচুক্তি স্পষ্ট করেছিল, যুদ্ধাপরাধীদের আর বিচার হচ্ছে না। কারণ পাকিস্তান এ প্রশ্নে কখনোই বাংলাদেশের সঙ্গে সহমত ঘোষণা করতে চায় না। দিল্লিচুক্তিকে পাকিস্তানি সংবাদপত্র উপমহাদেশে নতুন সম্পর্কের সূচনা করবে বলে অভিমত জানায়। নিউইয়র্ক টাইমসের ২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বলা হয়, নতুন সম্পর্ক হয়তো এখনই শুরু হচ্ছে না। কিন্তু এ কথায় কোনো ভুল নেই যে এই তিন দেশের মধ্যে সম্পর্ক নতুন মোড় নিচ্ছে।

১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন কালে সৌদি বাদশাহর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বৈঠক করেন। বাদশাহ ফয়সল দাম্ভিকতার সঙ্গে শর্তারোপ করেন যে বাংলাদেশকে সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে দেশটির নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অভ বাংলাদেশ' রাখতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো : অবিলম্বে সব পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাদশাহকে কড়া জবাব দিয়ে যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে বলেন, 'এটা তো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিষয়। এই দুটি দেশের মধ্যে এ ধরনের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। যেমন ধরুন, বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ পাকিস্তানি নাগরিককে সে দেশে ফেরত নেওয়া এবং পাকিস্তানে আটকে পড়া পাঁচ লক্ষাধিক বাঙালিকে বাংলাদেশে পাঠানো এবং বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থসম্পদ পরিশোধ করা। এমন বেশ কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। আর এসবের মীমাংসা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধু বিনা শর্তে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে না। আর সৌদি আরবই বা এত উদ্‌গ্রীব কেন?' বঙ্গবন্ধুর কড়া ভাষ্য শুনে সৌদি বাদশাহ একটু রূঢ়স্বরে বলেন, 'শুধু এটুকু জেনে রাখুন, সৌদি আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান আমাদের সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু। যা হোক, আমার শর্ত দুটি বিবেচনা করে দেখবেন। একটা হচ্ছে, বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও অপরটি বিনা শর্তে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি। আশা করি, এরপর বাংলাদেশের জন্য সাহায্যের কোনো কমতি হবে না।' সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এবং পশ্চিমা অনেক দেশই যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিপরীতে অবস্থান নেয়। কিন্তু বাংলাদেশ তাদের বিচারের বিষয়ে তখনো অনড় অবস্থানে। বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাকি যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবাসনে আপত্তি তোলেনি; কিন্তু পাকিস্তান যুদ্ধাপরাধীদের ছাড়া যুদ্ধবন্দিদের ফেরত নিতে আপত্তি বজায় রাখে। ভুট্টো জানতেন, যুদ্ধবন্দিদের ভারত এমনিতে ফেরত দিতে বাধ্য হবে। কারণ, বেশিদিন ভরণপোষণ দিতে পারবে না। আর পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের নিরাপত্তা বা সুরক্ষার দায়িত্ব তার নেই। যদিও বেশির ভাগ বাঙালিই যুদ্ধের সময় থেকেই চাকরি হারাতে থাকেন। বেকারত্বের কারণে তাঁরা সহায়-সম্পদ সবই বিক্রি করতে বাধ্য হন। এসব তথ্য জেনে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ৮ মার্চ জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে এই করুণ অবস্থার অবসানে এগিয়ে

আসার আহ্বান জানান। ১৯৭৩-এর ২৮ আগস্ট দিল্লিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈঠকটি হয় বাংলাদেশের সম্মতিতেই। বৈঠকে উভয় দেশ 'দিল্লিচুক্তি' সই করে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে যুগপৎ প্রত্যাবাসন নিয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। অন্যদিকে শর্তারোপ করা হয়, পাকিস্তান গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে আটক বাঙালিদের বিচার করবে না। তবে বাংলাদেশ সে দেশে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর যে বিচার করতে চায়, এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঐকমত্য হলেই তবে বিচার হবে। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তাঁর সরকারের দৃঢ়তার কথা বিভিন্ন পর্যায়ে তখনো বিবৃত করেছেন। কিন্তু এই চুক্তির ফলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার নামে প্রথম সপ্তাহেই ১৪৬৮ বাঙালি এবং ১ হাজার ৩০৮ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির প্রত্যাবাসন ঘটে। বাংলাদেশ ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী ফেরত না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় পাকিস্তান দুই শতাধিক বাঙালিকে পণবন্দি হিসেবে জিম্মি করে রাখে। এসব সিদ্ধান্তের আগে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ভুট্টো একটি নতুন প্রস্তাবও রেখেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তান তার যেকোনো যুদ্ধবন্দির বিচার ঢাকায় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে, কারণ অভিযুক্ত অপরাধ পাকিস্তানের একটি অংশেই ঘটেছে। সুতরাং পাকিস্তান নিজে বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এদের বিচারে আগ্রহী, যা আন্তর্জাতিক আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে।' (পাকিস্তান অ্যাফেয়ার্স, ১ মে ১৯৭৩)। কিন্তু টিক্কা খান পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান থাকাবস্থায় এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচারে পাকিস্তানি প্রস্তাবে সন্দেহ পোষণ করে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশে যে বিচার করা সম্ভব হবে না, তা বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ তখন আটকে পড়া নির্যাতিতসহ সাধারণ বাঙালিদের দেশে ফেরত আনা জরুরি হয়ে পড়েছে। অথচ এই বাঙালিদের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে। এক দোটানায় পড়ে যায় বাংলাদেশ। তথাপি যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার আগে পাকিস্তানের কাছে চারটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। প্রথমত, যুদ্ধাপরাধের জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ খোলা রাখা এবং তৃতীয়, সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য, চীনসহ অন্যান্য দেশে পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদান। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নে শর্ত সাপেক্ষে ভুট্টোকে একক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। ভুট্টো সংসদে বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের দাবি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কোনো স্বীকৃতি নয়।'

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ভাষণে বলেন, '১৯৫ যুদ্ধবন্দির মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে ফেরত না পাঠানো পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের শর্ত অপূর্ণই থেকে যাবে। আর জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের

প্রশ্নই ওঠে না।' এর ১২ দিন পর ৩ অক্টোবর চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী চিয়ান জিয়ান হুয়া অধিবেশনে বলেন, 'জাতিসংঘের প্রস্তাব কার্যকরী করার পরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। তার আগে কোনোক্রমেই নয়।'

দিল্লিতে ১৯৭৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে তিন দেশীয় প্রতিনিধিরা এক যুক্ত ঘোষণায় বলেন, 'উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করে দেওয়া হবে।' অবশ্য এই যুক্ত ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রথম দলটি ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা পৌঁছে। কিন্তু এরপর প্রত্যাবাসন থেমে যায়। পাকিস্তান এ ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে অথচ যুক্ত ঘোষণায় ত্রিমুখী লোক বিনিময় যুগপৎ পরিচালিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ২২ অক্টোবর টোকিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে প্রতিটি বাঙালি ফেরত নিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি নাগরিকদের বিপুলসংখ্যককেই পাকিস্তান নিচ্ছে না।' এর কয়েক দিন পরই ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিক বিহারিদের পাকিস্তান ফেরত নেবে না।' অথচ প্রায় পাঁচ লাখ বিহারির মধ্যে অধিকাংশই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে দেশে ফেরত যেতে আগ্রহী। বাংলাদেশের পক্ষে এদের ভরণপোষণ ভারবাহী হয়ে দাঁড়ায় গোড়াতেই।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন কালে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ও আটকে পড়া বাঙালিদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু বৈঠক চলাকালে সাংবাদিকদের জানান, 'পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাঙালিদের দেশে ফেরাসহ অনেক বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন হবে। এই সম্মেলন শুরুর আগে, অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছি। আল্লাহর নামে এবং দেশের জনগণের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করছি।...আমি বলছি না যে এটি আমি পছন্দ করছি। আমি বলছি না আমার হৃদয় আনন্দিত। এটি আমার জন্য একটি আনন্দের দিন নয়, কিন্তু বাস্তবতাকে আমরা বদলাতে পারব না।' ভুট্টোর ঘোষণার আগের রাত, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সৌদি আরব, মিসর, ইন্দোনেশিয়াসহ ৩৭টি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উভয় দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থন হয়। তবে বাংলাদেশ তখনো ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচার থেকে সরে আসার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। লাহোর সম্মেলন থেকে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু জানালেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তিনি আপাতত স্থগিত রেখেছেন। তবে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান শীঘ্রই আলোচনায় বসবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

যেখানে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের জন্য অভিযোগ করেছে।

ভুট্টো এই কমিশনের প্রতিবেদনে যেমন প্রকাশ করেননি, তেমনই ১৯৫ জনকে বিচারের মুখোমুখি করেননি। কারণ প্রধান আসামি কসাই টিক্কা খান তখন ভুট্টোর সেনাপ্রধান। দিল্লিচুক্তিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা থাকলেও ভুট্টো তা করেননি। অন্যদিকে চুক্তিতে আটকে পড়া বাঙালিদের দেশে ফেরত পাঠানোর উল্লেখও রয়েছে। ভুট্টো চুক্তির কোনোটিই আসলে কার্যকর করেননি। কারণ ভুট্টো বলেছিলেন, চুক্তির আগে পাকিস্তান নিজে তার জাতীয় আইনের ভিত্তিতে তাদের বিচার করবে। ভুট্টো তো বাহাত্তর সাল থেকেই নিজে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কথা রাখেননি। সময়টা ছিল বাংলাদেশের প্রতিকূলে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা নাজুক ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া আর কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। এমনকি মুসলিম দেশগুলোও নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার মতো বাস্তব অবস্থা এবং উপকরণগত সহায়তাও বাংলাদেশের ছিল না।

সে সময় বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়, দুটি কারণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিতে রাজি হন। প্রথমত, পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় চার লাখ বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা তাঁর প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে 'সম্পদ' হিসেবে গণ্য হবেন। তা ছাড়া যুদ্ধবন্দি বিচারের ওপর প্রায় চার লাখ আটকে পড়া বাঙালি ও তাদের আত্মীয়স্বজনের জীবন-মরণ ও সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে। দ্বিতীয়ত, যেসব দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সহায়তা করেছে এবং সাহায্য দিয়েছে, তাদের মধ্যে ভারত ছাড়া আর প্রায় দেশই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভুট্টো জিম্মি করে রেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ বিষয়ে সেভাবে এগিয়ে আসেনি। ভারত এ ব্যাপারে পাকিস্তানের ওপর চাপ বহাল রেখেছিল; কিন্তু এই বাঙালিদের ফেরত আনার জন্যই সেদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দিল্লিচুক্তি অনুযায়ী তাদের বিচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। যদিও তাদের প্রয়োজনই আর জীবিত নেই। কিন্তু মরণোত্তর বিচারকাজটি পাকিস্তানের করা উচিত তাদের নিজেদের স্বার্থে যেমন, তেমনই বিশ্বের শান্তির স্বার্থেও।

যুদ্ধাপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার নজির বিশ্বে আর নেই। কূটনৈতিক লড়াইটায় খোদ পাকিস্তান বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ও শরণার্থী কমিশন এবং রেডক্রস তাদের নিয়ে কাজ করে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের শরণার্থী মর্যাদা দেওয়া হয়। রেডক্রস তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টার অংশ হিসেবে নাগরিকত্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করলে তারা নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক পরিচয় দিয়ে সে দেশে ফেরত যেতে চায়। সে সময় থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারিদের 'আটকে পড়া পাকিস্তানি' বলে অভিহিত করা হয়।

এদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ৬৬টি ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়। এর মধ্যে ঢাকার মিরপুরে ২৫টি ও মোহাম্মদপুরে ৬টি ক্যাম্প। ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অভ রেডক্রস বিদায় নিলে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে জেদ্দাভিত্তিক সংগঠন রাবেতা আল আলম ইসলাম জরিপ চালায়। তারা তালিকাও প্রণয়ন করে। সর্বশেষ ২০০৩ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার উর্দুভাষী পাকিস্তানি ৮১টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। এদের ফেরত নিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জিয়াউল হক সত্তর দশকে একটি তহবিল গঠন করেছিলেন; কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ পুনর্বাসন থমকে থাকায় তা ব্যয় হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ক্যাম্পগুলো বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চলছে।

১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী, ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৬৬৯ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক দাবি করে সে দেশে ফিরে যেতে চায়। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় একাধিক চুক্তি করে। ইন্দো-পাক অ্যাগ্রিমেন্ট ১৯৭৩, জেদ ট্রাইপাটাইট অ্যাগ্রিমেন্ট অভ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ১৯৭৫–এই চুক্তিগুলোর অন্যতম। ১৯৭৪ সালে তিন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ মাত্র তিন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের পাকিস্তানে ফেরত নিতে সম্মত হয়। চুক্তির আওতায় পাকিস্তান ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬৩৭ জনকে ফেরত নেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে মাত্র ১ লাখ ২৬ হাজার ৯৪১ জনকে ফেরত নেয়। বাকি ৪ লাখ ফেরত নেয়নি।

বাংলাদেশে উর্দুভাষীদের মূল সমস্যাটি নাগরিক সংক্রান্ত। তারা বাংলাদেশি না পাকিস্তানি? ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দশকগুলোয় ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে কাজ করার জন্য অনেক উর্দুভাষী বিহার, ওড়িশা ও উত্তর প্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গে আসে। এদের বেশির ভাগই বিহারের। যাঁরা প্রধানত রেলপুলিশ, বিচারব্যবস্থা ও অন্য বেসামরিক পদগুলোয় যোগ দিয়েছিলেন। সৈয়দপুরে বৃহৎ রেল ওয়ার্কশপে কাজ করার জন্য ব্রিটিশরা বিহার থেকে ৭ হাজার জনকে নিয়ে এসেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে ১৩ লাখ মুসলিম অধিবাসী পূর্ব বাংলায় আসে। এর মধ্যে ১০ লাখ বিহারি। এদের মোহাজির অভিহিত করা হয়। পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতার পাশাপাশি ভাষাগত ভিন্নতার মুখোমুখি হয় তারা। বাংলা ভাষা বা লিপি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ কারণে এবং রাজনৈতিক নীতির কারণেও এরা বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে এড়িয়ে চলে এবং দৃঢ় গোষ্ঠীগত বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এমনকি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন থাকে। এরাই হিন্দুদের জমিজমা দখল করার জন্য ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটায়। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সহযোগী হয়ে গণহত্যায়ও অংশ নেয়। এরা আলশামস বাহিনী গঠন করেছিল।

১৯৯২ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দেয় যে ৩০০ বিহারি পরিবারকে পাকিস্তানে ফেরত নেওয়া হবে; কিন্তু ১৯৯৩ সালে মাত্র ৫০ পরিবারকে ফেরত নেওয়ার পর প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ বিষয়টি উত্থাপন করলেও সন্তোষজনক কোনো সুরাহা হয়নি। আটকে পড়া সবাইকে ফেরত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ পাকিস্তান উপেক্ষা করে আসছে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারের সহযোগী বিহারিদের বাংলাদেশ জিম্মিও করেনি কিংবা যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের বিচারের আওতায় আনেনি। এরা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মিরপুর দখলে রেখেছিল। মুখোমুখি সশস্ত্র প্রতিরোধে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তা মুক্ত করে। চিত্রনির্মাতা-সাহিত্যিক জহির রায়হান ওখানেই গোলাগুলিতে নিহত হন।

পাকিস্তান আটকে পড়া পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের জন্য যে কমিটি করেছে, তারা বছর সাতেক আগে সুপ্রিম কোর্টে বলেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৪ থেকে ৫ লাখ পাকিস্তানি আটকে পড়ে আছে। পাকিস্তান এদের ফেরত এবং দায়দায়িত্ব নেবে না। বাংলাদেশকেই এদের দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। বাংলাদেশ অবশ্য বলে দিয়েছে, একাত্তরপূর্ব সময়ে জন্মগ্রহণকারী পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে হবে।

১৯৯২ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গোলাম আযমের বিচার সম্পর্কে বিতর্ক হয়। বিএনপির মন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম মিয়াসহ বিএনপি সরকার পক্ষের কতিপয় সদস্য বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় রাজাকার ও পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'যেসব রাজাকারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ছিল, তাদের ক্ষমা করা হয়নি।' ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা সংসদে আরো বলেন, 'পাকিস্তানে আটকে পড়া ৪ লাখ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই সরকারকে বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল।' শেখ হাসিনা এমনও বলেন, 'সেনাপতি নূরউদ্দিন খান, বিডিআরপ্রধান আবদুল লতিফ, জেনারেল সালাম, মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, মাজেদুল হকসহ ৪ লাখ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল, তাদের পরিবার-পরিজনদের মাতমে সাড়া দিয়েই বঙ্গবন্ধু সেদিন যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি সেনাদের ছেড়ে দিয়ে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে এনেছিলেন।' (সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ১৯৯১)।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে পেরেছিল। তেমনি ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিও পাকিস্তান ফিরেছিল বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু বিহারিদের আর বিনিময় হয়নি। দিল্লিচুক্তি রক্ষা করে পাকিস্তান ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে বিচার করেনি যেমন, তেমনই বিহারিদের ফেরত নিচ্ছে না। বিশ্ব জনমতই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১১)

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা দিবসকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবনা

পান্না কায়সার

ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও ডিসেম্বর মাস এলেই বুকের ভেতর ঝড় ওঠে। কত কথা, কত স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আনন্দ-বেদনায় ভেতরটা অনুরণিত হয়। একুশের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে সংগ্রাম-আন্দোলনে বহু প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি পৌঁছেছে সাধের স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। এই দীর্ঘ পথে হ্যামিলনের বাঁশির সুরের মতো গোটা বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তোলেন মহাকালের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আশ্চর্য ধীশক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাসে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন জাতির পিতা। অস্ত্র হাতে নিয়ে গোটা বাঙালি দেশকে শত্রুমুক্ত করে সাধের স্বাধীনতা অর্জন করে মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরবে। মাত্র ৯ মাসে বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণার শক্তি বুকে নিয়ে কুখ্যাত পাকসেনাদের পিছু হটিয়ে দেশ স্বাধীন করে ঘরে ফেরা। বোধের ভেতর কী আশ্চর্য অহংকারের জন্ম দেয় সেসব গর্বের কথা ভেবে।

বছর ঘুরে মার্চ এলো। গর্বের, অহংকারের আর গৌরবের এ মাস। আগুনঝরা এ মাস। সংগ্রাম, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের এ মাস। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বাঙালি নিরঙ্কুশ জয় লাভ করেছে বঙ্গবন্ধুর সঠিক নেতৃত্বে। আনন্দে উদ্বেলিত বাঙালি। দু'চোখে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু গোটা পাকিস্তানকে শাসন করবেন। তিনিই হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। দীর্ঘদিনের অবহেলা-বঞ্চনার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবে বাঙালি। পাকিস্তানের কুখ্যাত অত্যাচারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় জাতীয় পরিষদ সভায় বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ১ মার্চ। কী গভীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলাম। কবে আসবে সেই শুভক্ষণ। বাঙালির জীবনে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সকল সংগ্রামের ইতি ঘটল–এ স্বস্তিতে বাঙালি উদ্বেল। এখন শুধু অপেক্ষা ১ মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের সভা; মহামানব, যাঁর জন্ম না হলে দেশ স্বাধীন হতো না সেই মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদ সভায় পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা পাবেন। ভাবতেই চৈতন্যে আলোর খেলা চলছিল। পাকিস্তানের শাসন-শোষণের অবসান ঘটবে। সোনার বাংলা গড়ে উঠবে ঝলমলিয়ে। ১ মার্চকে স্বাগত জানানোর জন্য বাঙালির উৎকণ্ঠা! আনন্দ!

সব উৎকণ্ঠাকে স্তব্ধ করে ইয়াহিয়া ১ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ সভা স্থগিত করে দিল বেতার ভাষণে। ইয়াহিয়ার এমন ঘোষণায় বাংলার মানুষ জ্বলে উঠল আগুনের মতো। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শহর হয়ে উঠল ঢাকা শহর। মুক্তির পাদপীঠ হয়ে উঠল ৩২ নম্বর বাড়ি। দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার এই ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পেরে ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। একজন নেতার অঙ্গুলিহেলনে গোটা বাঙালি জাতি '৭০-এর বিজয়কে ধরে রাখার জন্য যেকোনো ত্যাগকে স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত। মিটিং-মিছিল, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শহর প্রকম্পিত। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে

যে ভাষণ দিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভাষণ আর কোনো নেতা দিয়েছেন কি না, জানি না। ৭ই মার্চে এই মহান নেতা দেশকে শত্রুমুক্ত করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা করে ফেললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই জনসভায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উপস্থিত থাকার। এটি আমার জীবনে দুর্লভ সৌভাগ্য। সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখল বঞ্চিত-শোষিত ও অনগ্রসর এক জাতি এক মহান নেতার নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল হয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

তার পরের ঘটনা আরো নারকীয়, জঘন্য, বীভৎস, নিষ্ঠুর! ২৬ মার্চ অতর্কিতে পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ। লাশের স্তূপে পরিণত হয়েছে যেন শহর। আর অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র হাতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় আগুনঝরা পথচলা শুরু। ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে গেল। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু জানেন, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মন্ত্রে বাঙালির চেতনায় যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধজয়ের–সেটাই হবে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি। হলোও তাই। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনার অলিন্দে অলিন্দে বঙ্গবন্ধুর কঠোর নির্দেশ আর অনুপ্রেরক শক্তিই ছিল তাদের সাহসী যুদ্ধ। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা বিশাল তাৎপর্য বয়ে আনে। যার যাক প্রাণ দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা নিয়ে ঘরে ফিরব–এ প্রত্যয় জাগে মুক্তিযোদ্ধাদের সত্য প্রতিজ্ঞায়। স্বাধীনতার মাসটা এলেই কত ছবি, কত কথা ছবির মতো ভেসে ওঠে চোখের ওপর। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ মাস। রক্ত গোলাপের মতো এ লাল রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে, শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় মহা আনন্দ-বেদনায়, অবিমিশ্রি আবেগে। এ দিনটি এলেই বুকের ভেতর রক্তক্ষরণের কান্নার শব্দে কান পেতে শুনি– স্বাধীনতা তুমি আর কত দূর! ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা আর ২০১১ সালের স্বাধীনতা! ফারাক অনেক! তাৎপর্য অনেক! গৌরব আর অহংকারের জায়গাটুকুতে কেন যে চোখের পাপড়ি ভিজে যায়। '৭১-এর স্বাধীনতার স্বপ্ন কি আমরা সফল করতে পেরেছি? শহিদের কাছে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর সংগ্রামের ফসলে কৃষক-শ্রমিক মজুরের গোলা ভরাবেন। দেশকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে সোনার বাংলাকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেশকে সাজিয়ে মানুষকে গড়ে তুলবেন সোনার মানুষ হিসেবে। দেশকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলার জন্য স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার মানুষ আন্তরিকভাবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কাজ করতে বঙ্গবন্ধুর শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সার্বিকভাবে গড়ে তুলতে সময়ের প্রয়োজন। প্রয়োজন বিশ্বজ জনমতের সাহায্যের হাত। বঙ্গবন্ধুর দিন–রাত পরিশ্রম–নতুন নতুন পরিকল্পনাকে কাজে লাগানোর আপ্রাণ চেষ্টা। বঙ্গবন্ধু একজন দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমাদের আদর্শ হলো বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম, ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে মাথা উঁচু করে রাখার নতুন সংগ্রাম। শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা।' স্বাধীনতারপর বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা

বলেছেন। দেশে ফিরে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা যুদ্ধের সময় শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। কেন করেছিলেন? নিজের জন্য? তা নয়। এ দেশের গরিব-দুঃখীদের জন্য। যাতে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে পারেন– সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করে বাংলার মানুষ যেন সুখী হয়।' দেশ ও দেশের মানুষকে নিয়ে এ ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয় বঙ্গবন্ধুর সুন্দর স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়ার ষড়যন্ত্রের জাল ইতোমধ্যে বিস্তার হয়ে গেছে। তাঁর কাছের মানুষ অনেকেই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। বঙ্গবন্ধু প্রাণ হারালেন সপরিবারে। যে ৩২ নাম্বার বাংলার মানুষের মুক্তির তীর্থস্থান ছিল সেই ৩২ নাম্বারের সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ। ওপরে-নিচে পরিবারের লাশ। ১৫ই আগস্টের এই নির্মম, নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাংলার মানুষের বুকে দুঃসহ পাথর হয়ে গেল।

বাংলাদেশের রাজনীতি উল্টো দিকে ঘুরে গেল। সামাজিক শাসন, স্বৈরশাসনের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল গণতন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল্যবোধের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত ইতিহাসে প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে দিনের পর দিন। আমাদের রক্তেভেজা সংবিধান বেআইনিভাবে নিজেদের ইচ্ছামতো সংশোধন! ইমডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি। সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ। স্বাধীনতারপর বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকা পর্যন্ত যে আবেগে- প্রত্যয়ে আর যে স্বপ্নে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল '৭৫-এর পরে তা পালিত হয়েছে ম্রিয়মাণভাবে। আমাদের স্বপ্ন আর স্বপ্নের আশ্বাস ফুটে ওঠেনি স্বাধীনতা মাসের সূর্য দিয়ে। কী দুঃসহ কষ্ট-বুকভরা কান্না নিয়ে শুধু অপেক্ষা। আবার ফিরে পাব হারানো গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঐতিহ্যে দুঃখিনী বাংলাদেশকে গড়ব। বাংলার মানুষ নীরবে বসে থাকেনি। সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়ে এ দুঃসহ অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা তো কম হয়নি। 'সত্য যে কঠিন। কঠিনেরে ভালবাসিলাম।' এই সত্যের পতাকা উড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীরদর্পে বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ালেন অভয় বাণী নিয়ে। ১৯৮১ সালের ১৭ মে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। বাংলার হারানো গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য শুরু হলো তাঁর অকুতোভয় পথচলা। জাতির পিতার কন্যা বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাঙালি তাঁকে স্বাগত জানাল প্রাণভরে। আবার দুঃখের নদী পেরিয়ে বাংলার মানুষকে নিয়ে শেখ হাসিনার সাহসী পথচলা। সংগ্রামী, ত্যাগী, মানবদরদি মহামানবের কন্যা বাবার মতোই অবিচল। '৭৫-এর পর থেকে '৮১-র ১৭ মে পর্যন্ত কী নিরানন্দে কেটেছে দিন। কেটেছে স্বাধীনতা দিবস। বড়ো ম্লান মনে হয়েছে স্বাধীনতা দিবসের সূর্যোদয়কে। বুকে পাথর চাপা দেওয়া দিন কেটেছে। মুক্তিযুদ্ধের নারকীয় দৃশ্যগুলো চোখের ওপর ভেসে উঠত। কিছু করতে না পারায় কষ্টে ছটফট করেছি। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার পর চৈতন্যে আলো ঝলমলিয়ে উঠল। হতাশাগ্রস্ত বাঙালি আবার আলো দেখল। শেখ হাসিনা বীরদর্পে হারানো গণতন্ত্র ও মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রামের মোকাবিলা করেছেন সাহসিকতার সঙ্গে। কত চড়াই-উতরাই, বাধা-বিপত্তিকে দুপায়ে ঠেলে পথকে পথ চলেছেন। স্বৈরাচারের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাঁর দূরদর্শিতা প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলার জনগণ শেখ হাসিনার

পাশে। জনতার মঞ্চ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রেস ক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চে মানুষের প্রতিবাদী ঢল। রাজনীতিবিদ, সুশীলসমাজ, ছাত্র-শিক্ষক, এক সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জনতার মঞ্চে এসে যোগ দিল। জনতার মঞ্চে মানুষের ঢল নামে। ডা. মিলন হত্যা দুঃখজনক হলেও এই মৃত্যু জোয়ারের মতো ছড়িয়ে দেয় আগুনের ফুলকি। জনতার মঞ্চ, ডা. মিলন হত্যা ও জনতার রুদ্ররোষের কাছে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে জয়ী হয় জাতীয়তাবাদী দল; কিন্তু নতুন ও আদর্শহীন এই দল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসে। ফলে তাদের পাঁচ বছরের শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর কোনো কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেনি। বিরোধী দলের আসনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে দেখে সামনের অন্ধকারের দুয়ার খুলে আলোর বিচ্ছুরণ বাংলার মানুষের মনে নতুন স্বপ্ন দানা বাঁধল। প্রাজ্ঞতা আর তুখোড় পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে তিনি যে প্রমাণ রেখেছেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে এই আশা জাগল যে তাঁর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ হারানো গৌরব ফিরে পাবেই। ১৯৯৬-তেই শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন। বাংলার মানুষের মহাআনন্দের দিন। বিকৃত ইতিহাস থেকে মুক্তি পাবে প্রজন্ম আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠবে জাতি। আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই দীর্ঘ বছরের জাতির কলঙ্কের তিলক মুছে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ তুলে দিলেন। জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারের কার্যক্রমও শুরু হলো। প্রচলিত আইনে বিচার-বিশ্লেষণে খুনিদের ফাঁসির আদেশ জারি করে বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ হলো।

লিখতে বসেছিলাম স্বাধীনতা দিবস নিয়ে আমার ভাবনার কথা। '৭২-এর স্বাধীনতা দিবস আর ২০১১ সালের স্বাধীনতা দিবস। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস ছিল সমুজ্জ্বল, আনন্দের, অহংকারের। '৭৫-এর পর প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস এসেছে। আমার কাছে ছিল তা ম্রিয়মাণ। '৭৫-এর পরে ষড়যন্ত্র করে যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের কথা লিখতে গেলে দীর্ঘ ইতিহাসকে টেনে আনতে হয়। অল্প কথায় তা সম্ভব নয়। তাদের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ২০১১ সালের স্বাধীনতা দিবসে উপড়ে যাক। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি এখন ক্ষমতায়। যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা আজ প্রধানমন্ত্রী। দেশপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক এই নেত্রীর শাসনামলে এ স্বাধীনতার মাস। এ মাস ৭ই মার্চের। এ মাস বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের মাস। এ মাস স্বাধীনতার মাস। বহুমাত্রিক তাৎপর্যপূর্ণ এই মাসে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার শপথ নিতে হবে। এ মাসে বসেই ২০১২ সালের স্বাধীনতা দিবসের আরেক সাফল্যের ভাবনায় আলোড়িত হতে হবে–তা হলো ২০১২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সুসম্পন্ন হবে এবং ওরা ফাঁসিতে ঝুলবে। এই প্রত্যাশা শুধু তো আমার নয়, গোটা দেশবাসীর। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বার ২০২২)

লেখক : শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।

বাংলাদেশের বিজয়ের সেই দিনগুলি

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

৫১ বছর আগে গোটা বিশ্বে দিনের আলো ফোটার আগেই বাঙালিরা যেখানেই ছিল, টিভি বা রেডিও খুলে বসে পড়েছিল সুসংবাদটি শোনার জন্য। বেলা যত বাড়তে থাকে, বাঙালির মনে একটি প্রশ্ন–কখন পৃথিবীর মানচিত্রে উঠে আসবে নতুন দেশটি, যার নাম হবে বাংলাদেশ। ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে ৪টায় ৯৩ হাজার সেনা নিয়ে দুর্দান্ত প্রতাপশালী ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। তার ১৫-২০ মিনিট পরেই পৃথিবীর মানচিত্রে উঠে এলো একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ। আমরা কলকাতায় বসে দেখেছি ৯ মাস ধরে দেশ স্বাধীন করার জন্য হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী ভারতের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিএসএফের কাছে ট্রেনিং নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ৯ মাসের দীর্ঘ যুদ্ধ, ভারতের সংসদে বিরোধী দলের নেতারা একসুরে দাবি করতে থাকেন ওপার বাংলার বাঙালিদের বাঁচাতে হবে। তখনকার প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন বলতেন, 'আপনারা যে দাবি তুলছেন সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সময়মতো সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমিও আপনাদের মতো চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।'

সেই ৯ মাসের ঘটনার তো কোনো বিরাম নেই। ৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কার্যত এটিই ছিল তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা। সম্প্রতি তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তিনি একটি বই লিখেছেন, বইটির নাম 'মুজিব বাংলার, বাংলা মুজিবের'। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক ভাষণ যখন তিনি দেন, তখন তাঁর হাতে কোনো কাগজ ছিল না। ছিল না কোনো নোট। চোখের চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে তিনি ভাষণটা দিলেন ঠিক সে কথা, যা তাঁর মনে এসেছিল। বাংলার মানুষের মনে প্রতিটি কথা গেঁথে গিয়েছিল।' 'স্বাধীনতা' শব্দটা বুকে ধারণ করে তিনি যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা দেশের মুক্তিকামী মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বিজয় অর্জন করেছিল। শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়েছে। এ ভাষণের আবেদন আজও অটুট। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষণ এত দিন ধরে আবেদন ধরে রাখতে পারেনি। এই ৫০ বছর ধরে এই ভাষণ কতবার এবং কত জায়গায় বাজানো হয়েছে! কত মানুষ শুনেছে, তা কি কখনো হিসাব করা গেছে? যায়নি। প্রতিবছর ৭ মার্চে ভাষণ বাজানো হচ্ছে ঢাকা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত, মানুষ এ ভাষণে প্রেরণা পায়। ১৯৭৫ সালের পর ২১ বছর সময় লেগেছে এ ভাষণ জনগণের সামনে সরকারিভাবে প্রচার করার জন্য। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসার

পর সরকারি গণমাধ্যমে এ ভাষণ প্রচার শুরু হয়। আজ এই ভাষণ ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো তার মেমরি অভ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

'দ্য ওয়ার্ল্ডাস গ্রেটেস্ট স্পিচেস' শীর্ষক রেফারেন্স বইয়ে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। লেখক ও ইতিহাসবিদ জ্যাকব এক-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস দ্য স্পিচেস দ্যাট ইনস্প্যায়ার্ড স্টোরি গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল ছিল এই ভাষণে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা প্রস্তুত রেখে ছিল তাদের সমরাস্ত্র। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে কী বলেন, তা শুনেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ময়দানে। এয়ার অ্যাটাক করবে এবং গুলি করে সমবেত মানুষকে হত্যা করে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণের রণকৌশলে বাঙালি জাতি আশ্বস্ত হয়ে সকল প্রস্তুতি নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গ্রামবাংলায়। প্রস্তুতি নিয়েছিল যুদ্ধের। প্রতিটি ঘর পরিণত হয়েছিল একেকটি দুর্গে। প্রতিটি মানুষ হয়েছিল একেকজন যোদ্ধা। ওই ভাষণ ছিল সকলের প্রেরণার উৎস। আর সে কারণেই বাঙালি এত দ্রুত বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল।

বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনামাফিক আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা কলকাতায় পৌঁছে যান। পৌঁছে যান '৬৯ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচনে নির্বাচিত ৩০০ জন জনপ্রতিনিধি এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার ১৬৯ জন প্রতিনিধি। তাঁরা কলকাতায় একটি সিনেমা হলে সভা করে পাঁচজন প্রতিনিধিকে বেছে নেন অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য। সেই কর্মসূচি অনুযায়ী এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দীন আহমদ। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আবু হেনা কামারুজ্জামান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান। বিদেশ মন্ত্রক দায়িত্ব দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার মোশতাককে। সকালে কলকাতা থেকে দেশি-বিদেশি ১৫০ জন সাংবাদিককে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বিএসএফ তাদের গাড়িতে করে নিয়ে গেলেও আমরা কনভয়ের মধ্যে নিজেদের গাড়িতে ছিলাম। ঘটনাটা খুব গোপন রাখা হয়েছিল। তারপর চলে যুদ্ধ যুদ্ধ প্রস্তুতি। কিন্তু পাকিস্তান বাঙালি হত্যায় এক মুহূর্তের জন্য থেমে থাকেনি। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, যৌথ বাহিনী এবং বিএসএফ জোয়ানরা লড়াই চালাচ্ছিল। বাংলাদেশে ঢুকে দেখেছি মুক্তিবাহিনীরা পাকিস্তানের একের পর এক বাংকার গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধী উত্তরবঙ্গে শরণার্থী ক্যাম্পে এসেছিলেন। সেখানে তিনি রাত কাটান শিলিগুড়ির কাছে সামরিক বাহিনীর ৩৩ ডিভিশনের সদর দপ্তরে। জোয়ানদের উদ্দেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যুদ্ধ হবে।

তোমরা কি যুদ্ধে জিততে পারবে? জোয়ানরা বন্দুক উঁচিয়ে বলেছিলেন, 'হামলোগ জিতেগা'। তারপর তিনি দিল্লি ফিরে গিয়ে ওয়াশিংটন চলে যান নিক্সনের কাছে। নিক্সনের কাছে তিনি হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'আপনি পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে বাঙালি হত্যা বন্ধ করে।' পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

পেন্টাগন থেকে পাকিস্তানকে যত রকম বাঙালি হত্যা করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৩ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল একটি জনসভা করছিলেন। সেদিনই খবর আসে পাকিস্তান দিল্লিসহ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, আগ্রায় বোমাবর্ষণ করেছে। মিটিং ছেড়ে আমরা আগাম রাজভবনে পৌঁছে গেলাম। গেটে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্য সচিব নির্মল সেনগুপ্ত। তিনি কতগুলো টেলেক্স বার্তা শ্রীমতী গান্ধীর হাতে দিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি পড়ে যাও'। নির্মলবাবু পড়ে গেলেন পাকিস্তান কোথায় কোথায় বোমা মেরেছে। আমরাও দ্রুত তাঁর পেছনে দমদম বিমানবন্দরে চলে গেলাম। বিমানের সিঁড়িতে পা দিতেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম, পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। আপনি কিছু বলছেন না? তিনি হাত জোর করে বললেন, 'আমাকে তিন ঘণ্টা সময় দাও। আমি রেডিওতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেব।' দিল্লিতে ফিরে গিয়ে তিনি ভাষণে বলেছিলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে।

ভারত তার সমুচিত জবাব দেবে। বাংলাদেশ হোগা, হোগা, হোগা। জয় হিন্দ্, জয় বাংলা বলে স্লোগান দিল। পাকিস্তান সেদিন রাতেই বনগাঁও সীমান্ত দিয়ে ৬টি ট্যাংক পাঠিয়েছিল। ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী সেগুলোকে ঢুকতে দিয়েছিল। তারপর ভারতীয় ট্যাংক দিয়ে তাদের ঘিরে রাখে। পরে সেই ট্যাংকগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সাত দিনের মাথায় পাকিস্তান বাহিনী চরম পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ৯০ শতাংশ বাংলাদেশের এলাকা যৌথ বাহিনীর সেনারা দখল করে নেয়।

১১ ডিসেম্বর তাজউদ্দীন সরকার যশোরে একটি জনসভা করে। সেই জনসভায় তাজউদ্দীন সাহেব বলেছিলেন, সাত দিনের মধ্যে ঢাকা দখল করে নেব। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। জয় আমাদের প্রায় হয়েই গিয়েছে। এদিকে আকাশবাণী থেকে ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রধান ঘন ঘন হিন্দি, উর্দু, ইংবেজি ও বাংলার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনারা কে কোথায় আছেন জানি। এখনই ভারতীয় সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করুন, না হলে আপনারা আর পাকিস্তানে ফেরত যেতে পারবেন না।'

৫১ বছর আগের ঘটনা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাজউদ্দীন আমাকে উদ্দেশ করে বলেন, সচিবালয়ে গিয়ে দেখি (যার নাম আমরা মুজিবনগর করেছিলাম) যা যা করছি, কেউ কোথাও নেই। চলে গেলাম হিন্দুস্তান হোটেলে। যে ঘরে ডিপিধর থাকতেন, সেটির দরজা খোলা। ভেতরে পাঁচজন মন্ত্রী। মানেকেশ পূর্বাঞ্চলের প্রধান জয়দীপ সিং আরোরা, জেনারেল সওগত সিং, জেনারেল জ্যাকব এবং

জেনারেল ভোলা সরকার। তাঁদের সামনে ঢাকা শহরের একটি বড়ো মানচিত্র। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টসহ ছাউনিগুলো একদিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকদের বাসস্থান চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাজউদ্দীন বলছেন, সামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করুন, সিভিলিয়ান এলাকায় বোমাবর্ষণ করেবন না। ভারতীয় সামরিক বাহিনী তাজউদ্দীনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

১১ তারিখ সকালেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর কয়েকটি বিমান বাংলাদেশের ওপর চক্কর দিয়ে আসে। পাকিস্তানের হাতে তখন কোনো বিমান বা ট্যাংক ছিল না। ১২ ডিসেম্বর পোর্ট উইলিয়াম থেকে জেনারেল জ্যাকব পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি হত্যার নায়ক জেনারেল নিয়াজিকে ফোন করে বলেন, এখন তো আপনাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে একটু পরেই আমি ঢাকায় আসছি। নিয়াজি রাজি হলেন। জেনারেল জ্যাকব, ভোলা সরকার, সওগত সিং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়াজির সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দেন। জ্যাকব তাঁকে বলেছিলেন, আপনি আপনার পরিবার এবং ৯৩ হাজার সেনাকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করুন। জ্যাকব নিজেই আমাকে বলেছিলেন, কতবার আমরা আত্মসমর্পণের কথা বলছি ততবার নিয়াজি পাল্টা বলছিলেন, আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধবিরতি। তাঁদের মধ্যে ৪০ মিনিট কথা হয়। জ্যাকব বললেন, জেনারেল আমরা ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের কোনো নিরাপত্তা আমরা দিতে পারব না। নিয়াজি জ্যাকবকে বললেন, আমাকে ১০ মিনিট সময় দিন। পাশের ঘরে গিয়ে তিনি ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলেন। জ্যাকবকে তিনি বলেন, তাহলে কখন সারেন্ডার হবে? উত্তরে তিনি বলেন, কলকাতা ফিরে গিয়ে জানাব। তাঁকে রাতে জানিয়ে দেওয়া হলো তিন দিন পর ১৬ ডিসেম্বর। সারেন্ডার অনুষ্ঠানে নিয়াজি তাঁর ব্যাজগুলি খুলে টেবিলের ওপর রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীতে এই আনন্দ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় বাঙালিরা উল্লাসে মেতে ওঠে। নিয়াজিকে নিয়ে পোর্ট উইলিয়ামে চলে আসেন জ্যাকব। তখন রাত ৮টা। আমি নিয়াজির সাক্ষাৎকার চাইলাম। জ্যাকব ভেতরে গিয়ে নিয়াজিকে বোঝালেন আমাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে জ্যাকব চেষ্টা করলেও নিয়াজি বলে দেন তাঁর মাথা ধরেছে। কথা বলতে পারবেন না। পূর্ব বাংলা একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিল। পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরো হলো।

কন্ট্রোলরুম থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে ফোন করা হলো। আর ১৫-১৬ মিনিটের মধ্যে আমরা লাহোর দখল করতে পারি। আমাদের সেনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারা নির্দেশ চায়। ওয়াররুমের সদস্যদের খবর দেওয়া হলো। শ্যামমোনকেশকেও তলব করা হলো। ইন্দিরা গান্ধী একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখনকার ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজজগজীবন উল্লসিত হয়ে বললেন, বহিনজি আমি কালই লাহোর যাব। আপনি লাহোর দখল করার নির্দেশ দিন। ইন্দিরা সবার কথা শুনে অর্থমন্ত্রীকে বললেন, ভারতীয় সেনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই থাক। আর এগোতে হবে না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। ইন্দিরা গান্ধী বললেন, '৬২-তে

চীনের সঙ্গে যুদ্ধ, '৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, আবার কালই চলে আসবে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা। আমাদের ভাণ্ডার শূন্য শ্যাম যে-ই কথায় সায় দিলেন, অন্য মন্ত্রীরাও সায় দিলেন। আর কলকাতা শহরে দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় মিছিল। তারা স্লোগান দিচ্ছে, এশিয়ার মমিমূর্ত ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই। আর এই যুদ্ধে (১৩ দিন) আজকের বাংলাদেশ আর্থিক দিক থেকে বলীয়ান হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে আছে, ঢাকার কন্টিনেন্টাল হোটেলের লবিতে মাইক হাতে লে. জেনারেল ভোলা সরকার সাংবাদিকদের বলছেন, ঢাকার রায়েরবাজারে একটি পুকুরে কয়েক শ মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষক। ১৩ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে পাকসেনারা তাঁদের গুলি করে মেরে সেখানে ফেলে দিয়েছিল। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করতে ছেয়েছিল। সব কিছুকে মিথ্যা প্রমাণিত করে শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মতোই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বপ্নপূরণের নতুন দিগন্তে এখন বাংলাদেশ। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০)

লেখক : বিশিষ্ট ভারতীয় সাংবাদিক।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের পরম্পরা

ড. আতিউর রহমান

৭ মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতির মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। এই ডাক ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির। তাঁর আহ্বানে পুরো জাতি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ওই সময়ে একটি স্বাধীন দেশের মতোই রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে পুরো জাতিই যে মুক্তির সংগ্রামে বদ্ধপরিকর, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। তাই সংলাপের ছলে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো নিচ্ছিলেন গণহত্যার প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ শুরু হয় পরিকল্পিত নির্মম গণহত্যা। আর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মূলত মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক-সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা। বন্দি বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বীরের বেশে ফিরে আসেন মুক্ত বাংলাদেশে। শুরু করেন বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম।

যুদ্ধের ছাইভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো এক নতুন দেশ গড়ে তোলার এ সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি ছিল এ জাতির লড়াকু মনোভাব আর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি তাদের অগাধ আস্থা। তাই বৈরী আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিবেশ এবং প্রতিকূল প্রকৃতিকে মোকাবিলা করে শুরু হয় নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক অভাবনীয় অভিযাত্রা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের অনেক বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার কয়েক মাসের মাথায় প্রণয়ন করেন গণমুখী সংবিধান। আর ওই সংবিধানে উল্লিখিত রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে যে ধারার সামাজিক রূপান্তর প্রয়োজন ছিল তা মাথায় রেখে সামনে নিয়ে আসেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এতে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, যানবাহন, রাস্তাঘাট–এমনকি পরিবার পরিকল্পনা খাতেরও সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। প্রতিটি খাতেরই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং সমাধানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ দেশের মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাপূর্বকালে সংগ্রাম করেছেন, ঠিক তেমনি ভালোবাসা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছেন যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে। তাঁর রূপান্তরবাদী উন্নয়ন কৌশলের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল :

প্রথমত, তিনি জাতিকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জাতীয় সম্পদের কার্যকর সদ্ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর শাসনামলে।

দ্বিতীয়ত, অগ্রাধিকার খাতগুলোতে যুদ্ধের পরপর বিদেশি সাহায্য দরকার ছিল। তাই প্রাথমিকভাবে শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্যকে স্বাগত জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তবে ক্রমান্বয়ে এই নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা তাঁর লক্ষ্য ছিল।

তৃতীয়ত, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় খাতের উদ্যোগকে একমাত্র পথ হিসেবে বিবেচনা করেননি। বরং ব্যক্তি খাতকে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তোলার মধ্যেই সমাধান দেখেছেন। তাই স্বাধীনতার পরপর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থাকলেও ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছর থেকেই এই সীমা তিন কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধু দেশের অর্থনীতিকে ঠিক পথে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালে মাত্র ৯৩ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৭৫-এ দাঁড়ায় ২৭২ মার্কিন ডলারে। অথচ বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এই মাথাপিছু আয় কমে যেতে শুরু করে (১৯৭৬ সালে ১৩৮ মার্কিন ডলার এবং ১৯৭৭ সালে ১২৮ মার্কিন ডলার)। এ ছাড়া এর অনেক বছর পরে, ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ান ফিন্যানশিয়াল ক্রাইসিসের সময়ে প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ব্যক্তি খাতের বিকাশের যে নীতি নিয়েছিলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সেটিই সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে জাতি সত্যিই ছিটকে পড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারা থেকে। বহু বছর আর বহু সংগ্রামের পরে ১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আবার সঠিক পথে ফিরে আসে অর্থনীতি। তিনি রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতের ভারসাম্য রক্ষা করে মিশ্র অর্থনীতির এক নয়া ধারণার উন্মেষ ঘটান। ২০০১ সালে সে যাত্রায় ছন্দপতন ঘটলেও ২০০৮-এ আবার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় ফেরে বঙ্গবন্ধুকন্যার আওয়ামী লীগ। আর তারপর থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের এক অভাবনীয় যাত্রার মধ্য দিয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে রোল মডেল।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর দিকে তাকালেই এই বিস্ময়কর অগ্রযাত্রাটির স্বরূপ বোঝা যায়। ২০০৮-০৯-এ যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ, ২০১৮-১৯-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.১ শতাংশে। খুব শিগগিরই দুই অঙ্কের ঘরে গিয়ে ঠেকবে প্রবৃদ্ধির হার, আর এ ধারা অব্যাহত রাখলে আগামী এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার হবে দ্বিগুণ। তবে কেবল আকার বৃদ্ধিতেই এই অর্থনৈতিক সাফল্য সীমাবদ্ধ নয়। কারণ এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সকল স্তরের জনগণকে যুক্ত রাখা এবং একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এর সুফল পৌঁছে দেওয়াই বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বাধীন সরকারের মূল লক্ষ্য। তাই দেখা যাচ্ছে, গত এক দশকে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার অর্ধেকের মতো কমিয়ে আনা হয়েছে (বর্তমানে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য হার যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ১১ শতাংশ)।

সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় অর্জন রয়েছে গত এক দশকে। রাষ্ট্রীয় খাতে মেগাপ্রকল্প গ্রহণসহ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিপুল বিনিয়োগ ঘটেছে গেল দশকজুড়েই। রুগ্‌ণ একটি বেসরকারি খাতকে বর্তমান সরকার রূপ দিয়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতির এক যোগ্য অংশীদার হিসেবে। গত এক দশকে বেসরকারি বিনিয়োগ তিন গুণ বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন টাকায়।

প্রবাসী আয়ও এখন দেশের অর্থনৈতিক শক্তির একটি অন্যতম স্তম্ভ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ছিল ৭,৯১৫ মিলিয়ন ডলার। ১০ বছরে তা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে ১৬,৪২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬,১৪৯ মিলিয়ন ডলার, যা ৫ গুণ ছাড়িয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হয়েছে ৩২,২৩৬ মিলিয়ন ডলার। যেকোনো বড়ো ধরনের দুর্যোগ আমরা এই বিশাল রিজার্ভ দিয়ে সামলে উঠতে পারার ক্ষমতা রাখি। পাশাপাশি পদ্মা সেতুর মতো বড়ো বড়ো অবকাঠামো নির্মাণের সাহসও দেখাতে পারছি এ কারণেই।

রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়েছি ঈর্ষণীয় সাফল্য। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১৪,১১১ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র ১০ বছরেই তা আড়াই গুণ ছাড়িয়ে ৩৫,৩৫৫ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটকথা, বাংলাদেশের অর্থনীতি গত এক দশকে এমনভাবে এগিয়েছে, যার সুফল পৌঁছে গেছে সকল স্তরের মানুষের কাছে এবং এই অগ্রগতি টেকসইও হয়েছে আগের তুলনায় কয়েক গুণ।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকেই নয়, সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ দেখিয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। মাতৃমৃত্যুর হার ২০০৮ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৩.৪৮ জন। ২০১৮ সালে কমে তা দাঁড়িয়েছে ১.৬৯ জনে। ২০০৮ সালে প্রতি হাজারে ৪১ জন নবজাতক মারা যেত। গত ১০ বছরে তা অর্ধেক কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২ জনে। এ সব কিছুই আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। ২০০৮ সালে যেখানে আমাদের গড় আয়ু ছিল ৬৬.৮, এখন তা ৭৩ বছরে এসে ঠেকেছে।

কাজেই বলা যায়, বঙ্গবন্ধুকন্যার কাছে দেশের মানুষ যেমনটা প্রত্যাশা করেছিল, তিনি তার চেয়েও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছেন সামষ্টিক অর্থনীতিকে। কারণ মিশ্র অর্থনীতির যে নয়া ধারণার উন্মেষ ও বাস্তব প্রয়োগ তিনি ঘটিয়েছেন, সেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধির দিকে যেমন মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তেমনি জোর দেওয়া হয়েছে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখার দিকে। একইভাবে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণেও পিছপা হননি তিনি। সর্বোপরি এ সময়ে সরকার নিজের সক্ষমতা যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি অন্য অংশীজনদের সাথে সমন্বিত কার্যকর কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করেছে।

বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু জাতীয় সামষ্টিক লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে

এখনো পাড়ি দিতে হবে অনেক বন্ধুর পথ। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ, জ্বালানি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার মতো চ্যালেঞ্জগুলো তো রয়েছেই। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জও যুক্ত হচ্ছে এ তালিকায়। যেমন–সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে করোনা প্যানডেমিক মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। এটি কেবল গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকিই নয়, বরং এর কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও হুমকির মুখে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার সময়কার কথা। সে সময় বাংলাদেশ সফলভাবে মন্দা মোকাবিলা করতে পেরেছিল ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বজায় রাখার মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ওই একই কৌশল এবারও বাংলাদেশকে বাঁচাবে। বিশেষ করে কৃষি খাতকে চাঙ্গা করা, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং আইসিটিনির্ভর কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলেই মনে হয়।

তবে সময়টা খুবই অস্বাভাবিক। তাই আমাদের অস্বাভাবিক নীতি ও উদ্যোগ নিতেই হবে। 'আউট অভ বক্স' আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা দিয়ে খুদে উদ্যোক্তাসহ সকল অনানুষ্ঠানিক উদ্যোক্তা, কৃষক, শ্রমিক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নীতি সমর্থন দিতে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার যে দ্বিধা করবে না, তা আরো স্পষ্ট করে বলার সময় এসে গেছে। নিশ্চয়ই তারা তা বলবে এবং করবে। একই সঙ্গে সমাজকেও সচেষ্ট ও সচেতন থাকতে হবে। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৭)

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

যে বাংলাদেশ আমরা চেয়েছিলাম

ড. মোহাম্মদ হাননান

এ দেশের মানুষ কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিল, কেমন একটা দেশের জন্য এ দেশের জনগণ বুক খুলে কামানের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, শহিদরা কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা জানার জন্য আমাদের যেতে হবে আরো ৪৫ বছর পেছনে। বাংলাদেশ তখন মাত্র স্বাধীন হয়েছে। এ নতুন দেশটির কীভাবে উন্নতি হতে পারে, তা বিবেচনা করতে বিশ্বব্যাংকের দুই অর্থনীতিবিদ জাস্ট ফাল্যান্ড (Just Faaland) এবং জে আর পারকিনসন (J R Parkinson) ঢাকা এলেন। সব কিছু দেখে তাঁরা একটি রিপোর্ট তৈরি করলেন (রিপোর্টটি পরে ১৯৭৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *Bangladesh : The Test Case of Development* নামে)।

রিপোর্টে বিশ্বব্যাংকের দুই অর্থনীতিবিদ লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ হলো উন্নয়নের প্রশ্নে পৃথিবীর কঠিনতম সমস্যা।' এখানেই তাঁরা থামেননি। বললেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন যদি সম্ভব হয়, তাহলে দুনিয়ার সকল দেশেই উন্নয়ন ঘটবে।' এ দুই অর্থনীতিবিদের টিপ্পনী শেষ হয় এভাবে, 'যদি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়ও, তাহলেও ২০০ বছর সময় লাগবে।'

কোথায় ছিলাম আমরা! আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করতে কারো মুখে বাধত না। এই টেস্ট কেসের (Test case) পরে এলো Basket case (তলাবিহীন ঝুড়ি)-এর গল্প। যদিও Basket case-এর অর্থ ঠিক তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ হয়, তখন যেসব আহত সৈনিক অন্যের কাঁধে চড়ে হাঁটত, তাদের বলা হতো Basket case। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান' চিহ্নিত করতে বলা হতো Basket case। ১৯৭১ সালে Basket case-এর অর্থ প্রয়োগ হলো 'ব্যর্থ দেশ' অর্থে। আর কথাটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারও বলেননি। বলেছিলেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট উরাল অ্যালেকিসন জনসন। জনসন ধারণা করেছিলেন, 'পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামক যে নতুন দেশটি জন্মলাভ করতে যাচ্ছে, তা হবে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র।' তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশ নামক নতুন একটি স্বাধীন দেশের আবির্ভাবকে সুনজরে দেখেনি। ফলে তাদের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ রকম একটি সিদ্ধান্ত তারা দিতেই পারে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) এমন কোনো অবকাঠামো গড়েই ওঠেনি, যা দিয়ে একটি দেশ স্বাধীনভাবে চলতে পারে।

কিন্তু ১৯৭২-১৯৭৫ এবং ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সরকারকে ঘায়েল ও অপদস্থ করতে Basket case শব্দকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে তারা, যারা এ বাংলাদেশ চায়নি, যারা বাংলাদেশের জন্মকে ঠেকিয়ে রাখতে পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। জাতি হিসেবে যে এটা

অসম্মানের তাও তারা চিন্তা করেনি, শুধু বঙ্গবন্ধুকে কোণঠাসা করে রাখতেই এই অপপ্রচার দীর্ঘদিন চালানো হয়েছে।

কী ছিল আমাদের! ছিল বন্যা, ছিল খরা, ছিল দুর্ভিক্ষ। প্রতিবছর মঙ্গায় উত্তরবঙ্গের মানুষ না খেয়ে মারা যেত। যখন খাদ্যের প্রয়োজন তখন বিদেশি রাষ্ট্র থেকে চাল আসত জাহাজে করে, সাগরে সে চালের জাহাজ ডুবিয়ে দিত, যাতে দুর্ভিক্ষ দীর্ঘায়িত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারেই বেড়ে গেল, সিনথেটিকের জন্য পাট আর বিশ্বে চলছে না, আইন-শৃঙ্খলা মানতে চাচ্ছে না কেউ, প্রতিহিংসা আর পীড়নের যেন প্রতিযোগিতা চলছিল। উদ্দেশ্য একটাই, বঙ্গবন্ধু সরকারকে অস্থিতিশীল করা। শত্রুরা এ পটভূমিটা তৈরি করতে সফল হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর মনে হয়েছিল আমরা যে বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, সেখান থেকে অনেক দূরে আমরা চলে যাচ্ছি।

এর পরের কাহিনি কী! ১৯৯৬ সাল থেকে আবার যাত্রা শুরু। ২১ বছর পর জাতি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মাঝখানে আবার খানিকটা ছেদ। ২০০৯ থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়েই চলেছে। উন্নয়নে 'বাংলাদেশ মডেল' এখন এক আলোচিত এজেন্ডা।

সেই বিশ্বব্যাংক! বিশ্বব্যাংকের ২০১৫ সালের দেশভিত্তিক জাতীয় আয়ের প্রতিবেদনে বলা হলো, '২০১৪ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৮০ ডলার।' যেসব দেশের মাথাপিছু আয় এক হাজার ৩৬ থেকে চার হাজার ৮৫ ডলার পর্যন্ত, সেসব দেশ বিশ্বব্যাংকের হিসেবে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে এর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল নিম্ন আয়ের দেশ। বর্তমান সরকারের রূপকল্পে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার রয়েছে। তার আগেই বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়ে গেছে, ফলে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে–এ ধাপটি বাংলাদেশের কাজটিকে সহজ করে দিয়েছে।

Test Case, Basket case-Gi ci Gevi Showcase! ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। ১৭ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যবিমোচন দিবস পালন উপলক্ষে সাফল্য অর্জনকরী বাংলাদেশকে 'শোকেস' হিসেবে পরিচয় করে দিতে এসে তিনি বললেন, 'বাংলাদেশের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।'

আমরা এ কথাটিই শুনতে চেয়েছিলাম। আমরা এ বাংলাদেশই চেয়েছিলাম। আমাদের সম্পর্কে যে অপবাদ দেওয়া হতো সেখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে চেয়েছিলাম। আমাদের দেশের তারুণ্য অদম্য এক শক্তি, যা বিশ্বে তুলনারহিত। ১৯৭১ সালে মাত্র ৯ মাসে তারা হিংস্র এক শক্তিকে পরাভূত করে বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল। সেই তারুণ্য এবং যুবশক্তি বাংলাদেশকে পাল্টে দিচ্ছে। সেটা এমন

যে, কোনো থিওরি বা তত্ত্বেও মেলানো যাচ্ছে না। আমরা এমন একটা বাংলাদেশই চেয়েছিলাম, যার অফুরন্ত শক্তি বিশ্বকে অবাক করে দেবে।

'মঙ্গা' শব্দটি অভিধান থেকে মুছে যাবে, এ আশঙ্কায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ। আমরা এমন একটা বাংলাদেশই চেয়েছিলাম, যেখানে ক্ষুধায় কেউ মারা যাবে না। বাংলাদেশ এখন বিদেশে চাল রপ্তানি করছে। বাংলাদেশকে সাহায্য দিতে এখন আর প্যারিসে কনসোর্টিয়ামের বৈঠক বসে না। এমন একটা বাংলাদেশই ছিল আমাদের কাম্য।

খরস্রোতা পদ্মা নদীর ওপর একা একা নিজের তহবিল দিয়ে একটা সেতু নির্মাণ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে যে বাংলাদেশ, আমরা সে রকম একটি দেশই চেয়েছিলাম।

গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে, এমন খবরের বাংলাদেশের জন্যই আমরা যুগ যুগ অপেক্ষা করেছি। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ওয়েবসাইটে বিশ্বব্যাংকের যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, 'গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে সহজে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের ৩৫ লাখ পরিবার তাদের ঘরের চাল বা ছাদ থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছে। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পল্লি এলাকায় ৩৭ লাখ লোক নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ পেয়েছে।'

কল্পনার বাইরে বিস্তার ঘটেছে নারীশিক্ষার। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, নারী শিক্ষার্থীরাই তুলনামূলক ভালো করে চলেছে পরীক্ষাগুলোতে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নারীরাই রয়েছে অগ্রগামী। পোশাকশিল্পে রয়েছে ৪০ লাখ কর্মজীবী, যার মধ্যে প্রায় ৩২ লাখ হচ্ছে বস্ত্রকন্যা। এ এক অসাধারণ সংবাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য। এমন বাংলাদেশই তো আমরা চেয়েছিলাম।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন লিখেছেন, "যাকে কিছুদিন আগেও 'আবর্জনার ঝুড়ি' হিসেবে দেখা হতো, সেই বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য এবং অন্যান্য অনেক রূপান্তরের সম্ভাবনার পেছনে নারীদের কর্মোদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দুই দশকের মধ্যে বাংলাদেশে মোট জন্মহার ৬.১ থেকে ২.৯-তে নেমে যাওয়ার ঘটনাটি (যা সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে দ্রুততম হ্রাস) নারীদের নীরব ভূমিকার গতিশীল ক্ষমতা ও তারই ফল হিসেবে লিঙ্গ সমতার অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুপরিণতির বহু উদাহরণের মধ্যে একটি।" [*তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ২৩৬-২৩৭]।

একজন নোবেল বিজয়ী যেমন বাংলাদেশকে নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, তেমন বাংলাদেশই আমরা চেয়েছিলাম। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে, আরো এগিয়ে যাবে–সেটাই আমাদের প্রত্যাশার বাংলাদেশ। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৭)

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার তাৎপর্য এবং গণহত্যার স্বীকৃতি

মফিদুল হক

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক আনন্দ-বেদনার কাব্য, যেখানে মিলেমিশে আছে হৃদয়-মথিত শোক এবং প্রতিরোধের দৃঢ়চিত্ত উত্থান, জীবন-উৎসর্গ করে জীবন জয় করবার আখ্যান। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বর্ণনাকালে কারো কারো তাই মনে পড়ে চার্লস ডিকেন্সের সেই উক্তি, ফরাসি বিপ্লবকালীন দুই নগরীর কাহিনির সূচনাবাক্য, 'সে ছিল আমাদের চরম দুঃসময়, সে ছিল আমাদের পরম সুসময়।' বাঙালি ১৬ ডিসেম্বরের মহান বিজয়ে উপনীত হয়েছিল রক্ত-হিম করা বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস পেরিয়ে। প্রতিরোধ দীপ্ত স্বাধীনতা দিবস আবির্ভূত হয় ২৫ মার্চের তামসিক কালরাত্রি শেষে– চারদিকে যখন হত্যালীলা ও মৃত্যুর আহাজারি, সেই রক্তলাল প্রহরে ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা।

এমনি রক্তস্নাত অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্যসাধারণ নেতৃত্বে ভাষাভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জাতিচেতনায় সংহত বাঙালি প্রতিষ্ঠা করল জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সব দিক দিয়েই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই তাৎপর্য যে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা গেছে কিংবা স্বীকৃত হয়েছে, তা বলা যাবে না। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক চিন্তার ভিত্তিতে, যা ধর্ম-পরিচয় মুখ্য করে মুছে ফেলতে চেয়েছিল জাতি-পরিচয়। ধর্মের বিস্তারে সমবেত হয় বহু ভাষাভাষী, বহু সংস্কৃতি, বহু জাতিসত্তার মানুষ, জাতিসত্তার সঙ্গে ধর্মসত্তার এ ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ নেই, বিরোধ হতে পারে না। কিন্তু বিভাজনের চিন্তাপ্রসূত সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পাকিস্তান রাষ্ট্রে বয়ে আনে বিকৃতি, গোড়াতেই অস্বীকার করা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষার অধিকার, অচিরে যা রূপ নেয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকারহীনতায়। ধর্মের দোহাই তুলে রাষ্ট্রীয় অন্যায় জায়েজ করার চেষ্টা বিভ্রান্ত করতে পারে অনেককে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই অসারতা ও অভ্যন্তরীণ অসংগতি সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অবস্থানের বিপরীতে তিনি দাঁড়ালেন অসাম্প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক জাতিচেতনার ভিত্তিভূমে, মূলত যা সাংস্কৃতিক এবং সম্প্রসারিত হয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকারের দাবিতে ক্রমান্বয়ে হয় সংহত। সেই সাথে তিনি নিবিড় দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপনিবেশিক চারিত্র্য, পশ্চিমাংশ যেখানে কার্যত পূর্ব বাংলাকে পরিণত করেছে পদানত ও অধিকৃত ভূখণ্ডে।

পাকিস্তান একক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলেও ভৌগোলিক বাস্তবতায় তা মোটেই একক ছিল না, সাংস্কৃতিকভাবে ছিল বৈচিত্র্যময়, ফলে রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিকভাবেও তার একক হয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের পূর্বাংশে বাঙালির স্বশাসন নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তুলে ধরেছিলেন ৬ দফা দাবিনামা, জেল-জুলুম-পীড়নের মুখেও যে প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। ৬ দফার পক্ষে ১৯৭০ সালের অভূতপূর্ব নির্বাচনি রায় বাঙালির একতা প্রকাশ করে জাতীয় অধিকারের দাবিকে জোগায় ন্যায্যতা এবং গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক বৈধতা। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের প্রয়াস বঙ্গবন্ধু সংহত করলেন জনশক্তি দ্বারা, নির্বাচনি গণরায়ে পুষ্ট হয়ে আন্দোলনকে এমন স্তরে উন্নীত করলেন যে একে বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ কারো রইল না। অন্যদিকে তেমন সুযোগও তিনি প্রতিপক্ষকে দিতে চাননি, যারা সমরশক্তির ওপর নির্ভর করে চেয়েছিল জনশক্তির বিনাশ ঘটাতে। এমনি পরিস্থিতিতে সশস্ত্র ক্ষমতায় মত্ত পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র যে আঘাত হানল ২৫ মার্চ রাতে, তা শুরু থেকেই জেনোসাইড বা জাতিধ্বংসের প্রচেষ্টার রূপ নিয়েছিল। এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর যে স্বাধীনতা ঘোষণা, তা রূপ নিয়েছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের, উপনিবেশিকতা মোচনের যে আন্দোলন জাতিসংঘ ও জাতিসমূহ দ্বারা ছিল স্বীকৃত। একদিকে জেনোসাইড এবং অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন–এই দুই বাস্তবতা মিলে গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বাংলাদেশ সংগ্রামের এই দুই মাত্রা, বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নিরিখে পাকিস্তানি উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকটি সচরাচর বিশেষ তলিয়ে দেখা হয় না। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হার্বার্ট ফেইথের কথা উল্লেখ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি বাংলাদেশ সমর্থক সমিতির সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন এবং ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটি অভ সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় এক ভাষণে বলেছিলেন, 'বস্তুত বাংলাদেশ আন্দোলন সকল বিচারে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন কেবল একটি দিক ছাড়া, কোনো ইউরোপীয় (উপনিবেশিক) শক্তির বিরুদ্ধে এটি পরিচালিত নয়। সচরাচর আমরা উপনিবেশবাদ-বিরোধিতা বলতে বুঝি শ্বেতাঙ্গদের শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে তামাটে জনগণের লড়াই। কিন্তু কোরীয় জাতীয়তাবাদ, যা ছিল জাপানিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত, সেটাও ছিল উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশ আন্দোলনকেও আমরা কেন এমনি কাঠামোর আওতায় বিচার করব না?'

সমকালে দাঁড়িয়েও বাংলাদেশ আন্দোলনকে বড়ো পটভূমিকায় বিচারে সমর্থ হয়েছিলেন অধ্যাপক হারবার্ট ফেইথ। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন তাঁর কাছে মনে হয়েছিল পূর্ব বাংলার সেই বসন্ত, যা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল ১৯৬৮ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময়। অসহযোগ আন্দোলনকে 'বাংলার প্রাগ-স্প্রিং' হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, 'এ ছিল তীব্র আবেগ, দৃঢ় অঙ্গীকার এবং ঐক্যে প্রত্যয়ী হওয়ার

কাল, যখন জনমানসপটে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জন্মগ্রহণ করে।' এর পরপরই আসে ২৫ মার্চ, অধ্যাপকের মতে যা ছিল, 'আরেকটি সেন্ট বার্থোলেমিউয়ের রাত্রি তবে আরো ব্যাপকভাবে সংঘটিত।' মধ্যযুগে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছিল মুক্তচিন্তার মানুষদের, আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক সহিংসতা নিয়ে তেমনি রাত নেমে এসেছিল বাংলার বুকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ।

২৫ মার্চ যে নিষ্ঠুর গণহত্যার সূচনা তা অব্যাহত ছিল ৯ মাসজুড়ে দেশের সকল জনপদ ও জনবসতিতে। এই গণহত্যার শনাক্তকরণ আমরা দেখি নৃশংসতা সংঘটনের শুরু থেকেই। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় আর্চার ব্লাডকে, ঢাকাস্থ মার্কিন যে কনসাল নৃশংসতার ধরন দেখে একে 'জেনোসাইড' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, ২৮ মার্চ হোয়াইট হাউসে প্রেরিত গোপন বার্তার শিরোনাম দিয়েছিলেন 'বেছে বেছে গণহত্যা' বা সিলেকটিভ জেনোসাইড। ৩১ মার্চ ভারতীয় লোকসভায় গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা বন্ধে বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন জানানো হয়। এপ্রিলের গোড়ায় আগরতলায় সমবেত বাংলাদেশের ৩৫ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে প্রেরিত বার্তায় গণহত্যা রোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। ৪ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত পত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি সহিংসতা বন্ধ করে সংকটের রাজনৈতিক সুরাহা করার ডাক দেন।

তবে এসব ছিল ব্যতিক্রম। পশ্চিমী পরাশক্তি, বিশেষভাবে মার্কিন প্রশাসন, নিক্সন-কিসিঞ্জার চক্র চেয়েছিল গণহত্যার সত্যরূপ ধামাচাপা দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়াকে তুষ্ট রাখতে। তাঁদের নেতৃত্বে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা হয়েছিল প্রবলভাবে অস্বীকৃত। কিন্তু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের জন্য সেটা হওয়ার উপায় ছিল না। যে চরম হিংস্রভাবে পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতিগোষ্ঠী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তা গণহত্যার উগ্র হিংসাত্মক রূপ রূঢ়ভাবে প্রকাশ করে। সাংবাদিকরা বিভিন্নভাবে এসব সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং সত্যনিষ্ঠভাবে তা পরিবেশনে সচেষ্ট হন। ফলে মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক দুই মাধ্যমেই বাংলাদেশে গণহত্যার বার্তা নানাভাবে প্রকাশ পায়।

কিন্তু গণমাধ্যমের বড়ো সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর সময়নির্ভরতা, সমকালের বাইরে তার দৃষ্টি বিশেষ পৌঁছায় না। স্বাধীনতারপর গণমাধ্যমের মনোযোগ হারায় বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কিংবা গণহত্যার শিকার জাতি হিসেবে বিচারের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে গণমাধ্যমে বিশেষ আলোচনা দেখা যায় না। গণহত্যার জন্য দায়ী পাকিস্তানি সেনা সদস্য কিংবা তাদের এদেশীয় সহযোগীদের বিচারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কোনো উদ্যোগ তো ছিলই না, বরং গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ ছিল প্রবল। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সংঘাতের অবসানে যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় নিয়ে অনেক দেশ ও সংগঠন সোচ্চার হলেও

জেনোসাইড কনভেনশন অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যাকারীদের বিচারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কেউ সরব হয়নি। বিশ্বসম্প্রদায়ের এই ব্যর্থতার মুখে বাংলাদেশ নিঃসঙ্গ ও এককভাবে হলেও বিচারের পথে অগ্রসর হয়, ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় যুগান্তকারী আইন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট। তবে আন্তর্জাতিক বিরুদ্ধতার মুখে বিচার আয়োজনে অগ্রগতি বিশেষ অর্জিত হয় না। তদুপরি অচিরে ঘটে যায় জাতির মহাবিপর্যয়, ১৯৭৫ সালের আগস্টে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পাল্টে দেয় দৃশ্যপট, শুরু হয় উল্টোপথে দেশের হাঁটা, মুখ থুবড়ে পড়ে বিচারের প্রয়াস।

শত বিপর্যয় সত্ত্বেও দেশের মানুষ, বিশেষত গণহত্যার শিকার পরিবার ও ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমর্থকরা বিচারের দাবি ও গণহত্যার স্মৃতি কখনো মুছে যেতে দেয়নি। এরই উজ্জ্বল উদাহরণ জাহানারা ইমাম প্রণীত '*একাত্তরের দিনগুলি*' গ্রন্থ, যা আলোড়িত করেছিল বিপুলসংখ্যক মানুষকে, বিশেষত নতুন প্রজন্মের সদস্যদের। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বেই আবার সংগঠিত হয় একাত্তরের ঘাতক-দালালদের প্রতীকী বিচারার্থে গণ-আদালত। স্মৃতি সংরক্ষণ এবং ন্যায় ও সত্য-প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ে বড়ো অর্জন ঘটে ২০০৮ সালের নির্বাচনে, যেখানে যুদ্ধাপরাধের বিচার ছিল বড়ো প্রশ্ন। বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গঠন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত, ১৯৭৩ সালের আইন ছিল যে বিচারের ভিত্তিমূল। এরপর থেকে সুষ্ঠু আইনি প্রক্রিয়ায় একের পর এক বিচার সম্পন্ন হয়ে রায় কার্যকর হচ্ছে। অন্যদিকে আমরা জানি, গণহত্যার অভিযোগ কখনো তামাদি হয়ে যায় না।

গণহত্যাকারীরা যেন পার পেতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে বিশ্বসমাজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কোনো সহজ কাজ নয় এবং অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠা পায় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। বাংলাদেশের সাথে সাথে বিশ্বজুড়েও ঘটছে পালাবদল, সেই পটভূমিকায় বাংলাদেশে গণহত্যা নতুনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সংশ্লিষ্টজনের, বিস্মৃতি থেকে আবার জেগে উঠছে একাত্তরের গণহত্যা, যে পরিবর্তনময়তার অসাধারণ প্রকাশ সাম্প্রতিক কতক গবেষণাগ্রন্থ, যার মধ্যে রয়েছে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যারি জে বাস প্রণীত '*দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম : নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড এ ফরগোটেন জেনোসাইড*'। বিস্মৃত গণহত্যা সম্পর্কে যখন অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন সেটা ভুলে থাকার উপায় আর থাকে না। সে রকম কাজের প্রতিফলন দেখি আরো কতক বইয়ে, বিগত তিন-চার বছরে যা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রীনাথ রাঘবনের '*১৯৭১ : অ্যা গ্লোবাল হিস্টোরি অভ ক্রিয়েশন অভ বাংলাদেশ*', সলিল ত্রিপাঠির '*দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অ্যান্ড ইটস ইউনিক লেগাসি*' এবং নয়নিকা মুখার্জির '*দ্য স্পেকটারাল উওন্ড*', একাত্তরে নারী-নির্যাতন বিষয়ক সংবেদনশীল গবেষণাগ্রন্থ।

মুক্তিযুদ্ধের পর নির্যাতিত নারীদের সহায়তায় বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ, বিশেষভাবে 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে তাঁদের বরণ করাকে নয়নিকা মুখার্জি 'ইতিহাসে নজিরবিহীন' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো লক্ষ করেছেন যে অনেক পরে ১৯৯৪ সালে বসনিয়ার মুসলিম সমিতির ইমাম সংঘাতকালে নির্যাতিত নারীদের যোদ্ধা বা সৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের মতো বসনিয়ার এই অবস্থানও রয়ে গেছে বিশ্বসমাজের দৃষ্টির বাইরে। এ ক্ষেত্রে আরো একটি দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, যা নয়নিকা মুখার্জিসহ আরো অনেকের, তাঁদের সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা সত্ত্বেও রয়ে গেছে স্বীকৃতির বাইরে। সেটা ১৯৭৩ সালের আইনে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে 'ধর্ষণ'-এর অন্তর্ভুক্তি। বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ করি, ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশনে ধর্ষণের অপরাধের কোনো উল্লেখ ছিল না। এই স্বীকৃতি প্রথম প্রদত্ত হয় ১৯৭৩ সালে গৃহীত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে।

গণহত্যার বিচারে বাংলাদেশের ভূমিকা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলের ক্রমবর্ধমান মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এর প্রকাশ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর অ্যাডাম জোন্সের উক্তি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদত্ত এক ভাষণে ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে তিনি বলেছেন, "জেনোসাইডের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদি বিধিবদ্ধ প্রয়াস,– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলস্বরূপ নুরেমবার্গের বিচারের পর প্রথম প্রধান উদ্যোগ এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'জেনোসাইড' শব্দবন্ধ এখানে লাভ করে কেন্দ্রীয় ও প্রধান ভূমিকা।"

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অভিযুক্ত পক্ষ, ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠী, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অপপ্রচার চালিয়েছে, নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করেছে। তাতে কিছু মানুষ কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হলেও ন্যায়বিচার-সাধন ও সত্য-উদ্ভাসনে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমে আরো বেশি করে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে কতক নতুন মাত্রাও যোগ করেছে। এসব বিষয়ে আরো পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ ও আন্তর্জাতিক মহলে সেসব মেলে ধরার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশাপাশি গণহত্যা অস্বীকারের মতো মহল এবং মানুষও রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিসরে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের ভেতরেও। ফলে বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত গণহত্যার ইতিহাস, এর পেছনের মতাদর্শ এবং গণহত্যাকারীদের বিচারানুষ্ঠানে দেশের সংগ্রাম সেসব বাস্তবচিত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আরো বিস্তারিত ও গভীরভাবে মেলে ধরা জরুরি। এমন পটভূমিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারবহ আরেক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন ২৫ মার্চ ঘিরে।

১১ মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতভাবে ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে নিয়েছে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বাংলাদেশের গণহত্যা

বিশ্বসমাজের কাছে মেলে ধরে ইতিহাসে এর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ এখন জরুরি। এই পথে অগ্রসর হতে সরকার এবং দেশের মানুষের মিলিত তৎপরতা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এমনি প্রয়াসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, যা আজকের হানাহানি জর্জরিত বিশ্ব-পটভূমিকায় সভ্যতাকে দিতে পারবে সংকট থেকে মুক্তি, দেখাবে সম্প্রীতির পথ, যে পথনির্দেশিকা আমরা পাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, যার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবল জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনক নন, সংঘাতের বিপরীতে শান্তি-সম্প্রীতি-মিলনের মধ্য দিয়ে উন্নততর মানবসভ্যতা নির্মাণের পথরেখাও তিনি প্রদর্শন করেছেন।

বাংলার জয় তাই মানবতার জয়। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বার ২০২০)

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক।

বঙ্গবন্ধু বিজয়ের জন্যই প্রস্তুত করেছিলেন

অজয় দাশগুপ্ত

খ্যাতিমান সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় 'ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থে 'ইন্দ্রপাত' নিবন্ধে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখেছেন–১৯৭৪ সালে মহান একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানের পর জানতে চাই–'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এলো?' চটচলদি উত্তর এলো–'সেই ১৯৪৭ সালে'।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন– '১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিনে তিনি ছিলেন কলিকাতা মহানগরীতে। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অন্যায়ভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে খাজা নাজিউদ্দিনকে ওই দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই ঘোষণা দিলেন ঢাকা হবে পূর্ব বাংলার রাজধানী। এ ঘোষণার ফলে কলিকাতার ওপর আমাদের আর কোনো দাবি রইল না। অথচ তখনও ব্রিটিশ সরকার ঠিক করে নাই– কলিকাতা পাকিস্তানে আসবে না, না হিন্দুস্থানে থাকবে। কলিকাতা হিন্দুস্থানে পড়লেও শিয়ালদহ (যশোর ও খুলনা থেকে বনগা-বারাসাত-রানাঘাট-কৃষ্ণনগর-বশিরহাট-২৪ পরগনার বিস্তৃত ভূখণ্ডসহ) পর্যন্ত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা ছিল। যে কলিকাতা পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলিকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম। কলিকাতা পাকিস্তানে থাকলে পাকিস্তানের রাজধানী কলিকাতায় করতে বাধ্য হতো।' [পৃষ্ঠা ৭৬-৭৮]

বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন মাত্র ২৬ বছর। পড়াশোনা অব্যাহত রেখেই ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন সক্রিয়ভাবে। বিখ্যাত ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রসংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকবলিত এলাকায় লঙ্গরখানা পরিচালনা করেছেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন–'আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয় সংশোধন করে নেই'। [পৃষ্ঠা-৮০]

বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবনেই ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছেন। পাকিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট মহল পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে কোণঠাসা করে রাখতে মনস্থির করে ফেলেছে। করাচি-লাহোর হবে তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র। কলিকাতা মহানগর বা তার সংলগ্ন এলাকা না পেলেও পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে জনসংখ্যায় এগিয়ে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমেই দখল নিয়েছিল ভারতবর্ষের বাংলা ভূখণ্ড। কারণ অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। বঙ্গবন্ধু এ ভূখণ্ডে নতুন করে বঞ্চনা-অবহেলা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত এলে তিনি বুঝতে পারেন–সামনে

আরো বিপদ। তিনি তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন–বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জনমত গঠন, এ দাবির সপক্ষে আন্দোলন ক্রমে জোরদার এবং উপযুক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন ছিল এরই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমরা বলে থাকি–'ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার মহান সংগ্রাম'। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই কালপর্বে ছাত্রলীগ ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য হাসিলে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হাতিয়ার। ছাত্রলীগের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর। বঙ্গবন্ধু সভাপতির ভাষণে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ছাত্রলীগকর্মীদের পাঠচক্র ও বিতর্ক সমিতি গঠন এবং নিরক্ষরতা দূর করায় সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি তোলেন–প্রাপ্তবয়স্ক সকলকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্রসজ্জিত করতে হবে। বিদেশি হামলা হলে যেন পূর্ব বাংলার মানুষ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। পাকিস্তান সরকার এ দাবি মানে নাই। তারা দুই যুগ আমাদের প্রায় উপনিবেশে পরিণত করে রাখে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন। পাকিস্তানি শাসকরা এ ভূখণ্ডকে পদানত করে রাখতে চেয়েছিল সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সুপরিকল্পিত ও পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপের কারণে বীর বাঙালি যথাসময়ে অস্ত্র তুলে নিতে পারে এবং শত্রুবাহিনীকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

বাংলাদেশের জনগণ কেবল যথাসময়ে অস্ত্র তুলে নেয়নি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা শুরুর দুই সপ্তাহ যেতে না যেতে মৃত্যু উপত্যকায় অবস্থান করেও বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। এই সরকার দ্রুততম সময়ে লাখ লাখ ছাত্র-তরুণকে গেরিলা ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে রণাঙ্গনে প্রেরণের পাশাপাশি ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি শরণার্থীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এ সরকার নিজস্ব কলাকুশলী দিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা, উন্নয়নের আর্থসামাজিক রূপরেখা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা সেল গঠন এবং পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ে বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় কূটনৈতিক অভিযানসহ বহুবিধ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে পারে।

বঙ্গবন্ধু মহান বিজয়ের জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুত করেছিলেন বলেই বাংলাদেশ শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশ ভূখণ্ড ছেড়ে স্বভূমে ফিরে যায়। স্বাধীনতার জন্য বাঙালিরা প্রস্তুত নয়–এ প্রশ্ন তুলে যারা 'বাস্কেট কেস' বা 'বটমলেস বাস্কেট' হিসেবে বাংলাদেশকে উপহাস করেছিল, তারা অবাক বিস্ময়ে দেখে–অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির প্রাথমিক পুনর্গঠন শেষ হয়েছে; জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করে প্রণীত হয়েছে সংবিধান। শিক্ষা ও

জ্বালানি নীতি, সমুদ্র আইন–এসব প্রণয়নেও বেশি সময় লাগেনি। স্বাধীনতার চার বছর পূর্ণ না হতেই বঙ্গবন্ধু ডাক দেন দ্বিতীয় বিপ্লবের। মূল লক্ষ্য–উপনিবেশিক আমলের জঞ্জাল দুর্নীতি-অনিয়ম নির্মূল এবং স্বনির্ভরতা অর্জন। স্বনির্ভরতা যে কল্পিত নয়, আমাদের ভেতরেই এর রসদ রয়েছে, সেটা বলেন যুক্তরাষ্ট্রে। জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের পর ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু সাধারণ পরিষদে ভাষণ প্রদানের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখার পরপরই যান ওয়াশিংটন, সে সময়ের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে আলোচনার জন্য। তার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এবং বিশ্বব্যাংকের দুই সিনিয়র অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশকে তাচ্ছিল্য করে বাস্কেট কেস হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তাঁদের বিবেচনায় 'বাংলাদেশ যদি উন্নতি করতে পারে, তাহলে বিশ্বের যেকোনো দেশ উন্নতি করতে পারবে।' এর সহজ ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে–'এই ছেলে যদি এসএসসি পাস করে তাহলে কলাগাছও পাস করবে।'

বঙ্গবন্ধু হেনরি কিসিঞ্জার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদদের বাংলাদেশ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যের মোক্ষম জবাব প্রদানের জন্য ওয়াশিংটনকেই বেছে নেন। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে লিখেছেন–'ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, কেউ কেউ বাংলাদেশকে International Basket Case বলে উপহাস করেন। কিন্তু বাংলাদেশ Basket Case নয়। ২০০ বছর ধরে বাংলাদেশকে লুট করা হয়েছে। বাংলাদেশের সম্পদেই শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে লন্ডন, ডান্ডি, ম্যানচেস্টার, করাচি, ইসলামাবাদের।... আজও বাংলাদেশে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে। একদিন আমরা দেখাব বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।'

দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' ও জাতির পিতার আদর্শ কেবল নয়, তাঁর নাম উচ্চারণও নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে–এ স্লোগান বাস্তবেই মূর্ত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের বিপুল সমর্থন ধন্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বগুণে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের গ্লানিমুক্ত হয়ে মধ্যম আয়ের দেশের সারিতে উঠে পড়েছে, উন্নত বিশ্বের সারিতে স্থান করে নেওয়ার স্বপ্ন পূরণে ফেলছে দৃপ্ত পদক্ষেপ। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বহু বছর কালভার্ট-মাটির রাস্তা নির্মাণের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নেও বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল দেশটি এখন বিশ্বব্যাংকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অনন্য অবকাঠামো প্রকল্প পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারে, ১০ লাখের বেশি বিপন্ন রোহিঙ্গাকে বছরের পর বছর আশ্রয় ও খাদ্য প্রদানের পাশাপাশি একটি অংশকে ভাসানচরে স্থানান্তরে স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রদর্শন করতে পারে।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও বিজয়ের জন্য বাংলাদেশকে যেমন প্রস্তুত করেছিলেন, তেমনি মহৎ লক্ষ্য অর্জনে ত্যাগ স্বীকারেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে কোটি কোটি মানুষ 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা' করেছিল। তবে কেবল জনগণকে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত করা নয়, তিনি বিশ্বাস করতেন 'আপনি আচরি ধর্মে'। পাকিস্তানের অস্তিত্বের দুই যুগের অর্ধেকের বেশি সময় তাঁর কেটেছে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে, তাঁর দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে অস্ত্র হাতে লড়েছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে দুঃসহ গৃহবন্দিত্বের জীবনেও ছিলেন অদম্য।

১৯৫২ সালের ১৪ জুন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন–'Please don't think for me. I have born to suffer'. [গোয়েন্দা প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯]

বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের জনগণের জন্য এ দুঃখ-কষ্ট তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন হাসিমুখে। তাঁর এ ত্যাগ বৃথা যায়নি, বাঙালির ত্যাগ বৃথা যায়নি। বিশ্বের বুকে এক গর্বিত দেশের নাম বাংলাদেশ– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত চলার পথে উজ্জ্বল আলোর মশাল ধরে আছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মহৎ লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবই। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২)

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক।

অপার মহিমার বিজয় দিবস ষোলো ডিসেম্বর

শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী

৫১টি বিজয় দিবস দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। জীবনের এক অনন্য আনন্দানুভূতিতে আমরা নিমগ্ন হয়ে যাই এদিনে। মনে পড়ে যায় প্রথম বিজয়ের দিনটিকে। কী অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয়! কত কাঙ্ক্ষিত ছিল ওই দিন! আজও তা শিহরণ জাগায়। জেনারেল মানেকশর অমোঘ আহ্বান, 'হাতিয়ার ফেলে দাও। আমরা তোমাদের সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছি। পালাবার কোনো পথ নেই।'

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও অন্যান্য বেতার থেকে শুনছি। আমাদের প্রত্যাশা আকাশ সমান উচ্চতায় উঠে গেছে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা কখন আত্মসমর্পণ হবে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল। হঠাৎ চারদিকে 'জয় বাংলা' ধ্বনি ঝংকার দিয়ে উঠল। সমস্বরে সুতীব্র চিৎকার ও আনন্দধ্বনি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। প্রতিটি বাড়ির ছাদে উড়তে শুরু করল বাংলাদেশের পতাকা। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। ছুটে বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখি অলিগলি ছাপিয়ে মহাসড়কের এপাশ থেকে ওপাশ জুড়ে গণমানুষের দীর্ঘ মিছিল চলছে। সকলের হাতে পতাকা। মুখে স্লোগান। আজ আর ঘরে কেউ নেই। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বের হয়ে পড়েছে। বিকেলে সারেন্ডার। নিজের চোখে দেখতে হবে মহারণের এই দুর্লভ শেষ অঙ্কটি। হতে হবে ইতিহাসের সাক্ষী। আপন দৃষ্টিতে অবলোকন করতে হবে হামার্দ বর্বর রক্তপিপাসু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ। ৯ মাস ওরা বাঙালির রক্তে হাত রাঙিয়েছে। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে বাঙালির বক্ষ বিদীর্ণ করেছে যে অস্ত্র দিয়ে, সেই অস্ত্র আজ ওরা বীর বাঙালির পায়ের কাছে মাথা নত করে জামা দিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। যারা নৃশংস পাকসেনাদের অত্যাচার ভোগ করেছেন, পালিয়ে থেকেছেন তাঁরা আজ সগৌরবে নির্ভয়ে ওদের দিকে চরম ঘৃণাভরে ছুড়ে দিচ্ছেন পায়ের স্যান্ডেল, জুতা। থুতু ফেলছেন ওদের দুরপনেয় কলঙ্কিত মুখে।

বিকেল ৫টা ১ মিনিট। রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পন্ন হলো। রেসকোর্স ময়দানের ভেতর ও চারপাশের কোথাও তিলধারণের ঠাঁই নেই। জনতার কণ্ঠ চড়েছে সপ্তম স্বরে। যেমন হচ্ছে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান, তেমনি হচ্ছে পরাজিত শত্রুদের প্রতি গালগাল। মানুষ মনের সুখে গালি দিয়ে ৯ মাসের নিপীড়নের শোধ নিচ্ছে। পাকি খুনিদের অপরাধ সীমাহীন। তাই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে চারপাশের ভুক্তভোগী জনতা। যতটুকু পারছে বলে বলে মনের ঝাল মেটাচ্ছে।

তবু সব আনন্দ ছাপিয়ে সকলের মনের গহিনে ছিল এক অসীম শূন্যতা। কোথায় আছেন আমাদের প্রাণপুরুষ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ তাঁরই তো এখানে থাকার কথা ছিল; কিন্তু তিনি নেই। পাকিস্তানের কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দীর্ঘ ৯ মাস ধরে বন্দি। তিনি কেমন আছেন, আদৌ বেঁচে আছেন কি না, জানবার কোনো উপায় নেই। পরে জানা গেছে বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকেই। যখন আমরা বিজয়ের আনন্দে উদ্বাহু উদ্বেল হয়ে মহানন্দে মগ্ন তখন তিনি ফাঁসির আসামি হয়ে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালির কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। সেলের পাশে তাঁর কবর খোঁড়া হয়েছে। তাঁকে নিয়ে দেখানো হয় কবরটি। তিনি মাথা নত করেননি। অকুতোভয়ে নিজের নীতিতে ছিলেন অটল, অবিচল। শত্রুদের জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের সাথে আপস করে আমার বাংলার মানুষকে অপমান করব না। আমার দেশ স্বাধীন। আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ সেই মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ো।

এই বিজয়ের দিনে আমাদের মনে রাখতে হবে বাঙালির মুক্তির জন্য, দেশকে সকল শোষণ-বঞ্চনা থেকে পরিত্রাণের জন্য টুঙ্গিপাড়ার জলে-কাদায় বেড়ে ওঠা এক মাটির মানুষ কী অসাধারণ শক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা লৌহসম প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিজের জন্মভূমি এবং জাতিকে শত্রুমুক্ত করতে আজীবন লড়াই করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তির সকল বাধা ও চক্রান্ত রুখে দিয়ে জয় করে এনেছেন স্বাধীনতা। অসহায়-চিরবঞ্চিত দেশবাসীকে দিয়েছেন একটি সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র। আজ আমাদের আরো মনে রাখতে হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তাঁরই রক্তমাংসে গড়া নিজ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পিতার আদর্শে দেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উন্নয়নশীল বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশের সোপানে পা রাখতে চলেছে।

আমাদের ভুললে চলবে না বঙ্গবন্ধুর হাতে জন্ম নেওয়া এই দেশ তাঁর নীতি ও আদর্শ ছাড়া চলবে না। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনকালে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে এ দেশ তখন 'আইয়ামে জাহেলিয়া' যুগের মতো অন্ধকারাছন্ন দেশে পরিণত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ধ্বংস থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শতভাগ অনুসরণ করে। এই বিজয়ের দিনে আনন্দ-উল্লাস যেমন থাকেবে, তেমনি থাকতে হবে দেশবাসীর ইস্পাত কঠিন দৃঢ় প্রত্যয় যেন বঙ্গবন্ধুর ভাবাদর্শের সৈনিকরাই বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় থাকেন। কারণ তাঁরাই জাতির পিতার নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবেন না। তাঁদেরই হাতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা সফল হবে, স্বার্থক হবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শহীদজায়া।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর মানবসেবার সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথচলা

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর শুভলগ্নে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এই মহান নেতার দূরদর্শিতা, মানবপ্রেম, মেধা ও মননের। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী দিকনির্দেশনার জন্যই নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত বাঙালিরা ১৯৭১ সালে শক্তিশালী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। তাই তাঁর প্রচণ্ড মমত্ববোধ ও ভালোবাসা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মানবতার কল্যাণে এমন একটি সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার দ্বারা আন্তর্জাতিক দরবারে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের যোগদান ও অবদান আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আন্তর্জাতিক পরিসরেও আমাদের শান্তিরক্ষা মিশনগুলো পরিচিতি ও সুখ্যাতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত আছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সব সময়ই প্রতিটি দুর্যোগে দেশ ও বিদেশে নিজেদের মানবিকতা, দক্ষতা, নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১৯৯০ সালে অপারেশন কুয়েত পুনর্গঠন (ওকেপি), ২০০৪ সালে অপারেশন সার্ক বন্ধন (শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের সুনামি), ২০০৮ সালে মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় নারগিস, ২০১০ সালে হাইতির ভূমিকম্প ইত্যাদি। তা ছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ যেমন : ইউনিমগ, আনগোম্যাপ, আনট্যাগ, মিনারসো, ইউনিকম, ইউএনজিসিআই, ইউনামিক, আনপ্রোফর, আনট্যাক, ইউনোসোম, অনুমোজ, ইউনোমগ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রাখেন।

১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর শনিবার দুপুর ২টার ঠিক পরেই শুরু হয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। তা ছাড়া এই যুদ্ধ ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, রমজান যুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও পরিচিত। ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। নিপীড়িত মানবতার জন্য বঙ্গবন্ধু সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন এবং তাঁদেরকে সহায়তা করতে সচেষ্ট ছিলেন বলে তিনি আরবদের ন্যায়সংগত এই যুদ্ধে আরব দেশসমূহকে সমর্থন জানান। তিনি শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সেখানে সামরিক চিকিৎসক

দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে তখন পর্যন্ত অনেক আরব দেশ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেনি, তদুপরি মানবিক দিক বিবেচনা করে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল সাহসী ও সুদূরপ্রসারী। উল্লেখ্য, ওই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে খুবই অল্পসংখ্যক মুসলিম দেশ ক্ষমতাশীল আমেরিকা, ইউরোপ ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই ধরনের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ও উপসচিব মোহাম্মদ জমিরকে ডেকে শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণের বিষয়ে প্রশাসনিক সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও টিমের সাথে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেনাপ্রধান ব্রিগেডিয়ার কে এম সফিউল্লাহ ও ডাইরেক্টর মেডিক্যাল সার্ভিস কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদকে ডেকে বঙ্গবন্ধু বলেন যে মধ্যপ্রাচ্যে আরব ও মুসলমান দেশগুলো আজ বিশাল বিপদের সম্মুখীন, এই সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক কর্তব্য। যদিও আমাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে তবু অত্যাচারিত ভাইদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। কর্নেল খুরশিদ বঙ্গবন্ধুর কথায় আবেগতাড়িত হলেন। উল্লেখ্য, কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন ও তাঁর আসামি নম্বর ছিল ৩৪। মামলা চলাকালীন জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। সেই সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু খুরশিদ উদ্দিনকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি খুরশিদের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরে বললেন : খুরশিদ, তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এই দুরূহ কাজে পাঠাচ্ছি। খুরশিদ উদ্দিন তখন বঙ্গবন্ধুকে স্যালুট দিয়ে বললেন : স্যার, আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও আপনার প্রদত্ত এই মিশন সফলভাবে বাস্তবায়ন করব। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু সেনা সদরের ৭ জন অফিসার ও ২১ জন সৈনিককে এই কাজের জন্য নিয়োজিত করলেন এবং দ্রুত প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। মিশনে যাওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ২৮ জনের দলকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ করে তাঁদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বললেন, আপনাদের সফল কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করছে অত্যাচারিত মানুষের কল্যাণ এবং বাংলাদেশের সম্মান ও ভবিষ্যতের অনেক সিদ্ধান্ত। জাতির পিতার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সঠিক হয়েছিল। মেডিক্যাল দলের সাথে মিসর ও সিরিয়ার জন্য ৪ টন চা-পাতা প্রেরণ করা হয়।

১৯৭৩ সালের ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দলটি প্রথম কোনো বৈদেশিক অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে। দলে ছিলেন কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ও উপসচিব মোহাম্মদ জমির, মেজর আমির আলী, মেজর শফিউল ইসলাম, ক্যাপ্টেন শাহজাহান, ক্যাপ্টেন নুর হোসেন, ক্যাপ্টেন রেজাউল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মফিদুল ইসলাম প্রমুখ। ১৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে বোয়িং ৭০৭ বিমানে সিরিয়া যাত্রা করে বাংলাদেশ দল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দলটির প্রথমে বাগদাদে অবতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে ইসরায়েলিদের বিমান আক্রমণ হচ্ছিল। তাই ঢাকা থেকে উড্ডয়নের পর দুবাই থেকে জ্বালানি নিয়ে বিমানটি সিরিয়ার উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। দামেস্ক ও বৈরুত বিমানবন্দরেও ইসরায়েলি আক্রমণের কারণে অবতরণ করা সম্ভব হয়নি বলে ব্রিটিশ পাইলট ক্যাপ্টেন ম্যাকিনটশ বিমানটি নিয়ে ককেশাস পর্বত, মাল্টা দ্বীপ, ইসরায়েল আর সিরিয়া পেরিয়ে লিবিয়ায় অবতরণের অনুমতি না থাকলেও পাইলট ঝঙঝ সিগন্যাল দিয়ে বিমানটিকে রাতে লিবিয়ার বেনগাজিতেই অবতরণ করালেন। কেননা মাত্র ৩০ মিনিট চলতে পারে এই পরিমাণ জ্বালানি ছিল বিমানে। বাংলাদেশ সেনাদল বহনকারী বিমানটির লিবিয়ায় অবতরণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল। কিন্তু ঘটনার গম্ভীরতা অবগত হওয়ার পর লিবিয়া কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ দলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। লিবিয়া কর্তৃপক্ষের সহায়তায় দলটি পরদিন ২০ অক্টোবর দুপুরে মিডলইস্ট এয়ারলাইনসের বিমানে করে বৈরুতে যাত্রা করে বৈরুত বিমানবন্দরে পৌঁছার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দলকে অভ্যর্থনা জানান। রাত ১০টায় নির্ধারিত বাসে করে দলটি লেবানন-সিরিয়া বর্ডার চেকপোস্ট পেরিয়ে দামেস্কের দিকে যাত্রা করে এবং ভোরে দামেস্ক নগরীর কাছে পৌঁছে। তখন চারদিকে ছিল যুদ্ধ অবস্থা। নগরীতে প্রবেশের কিছুক্ষণ পরই সাইরেন বেজে ওঠে এবং ইসরায়েলের ৫-৬টি যুদ্ধবিমান দামেস্কে আক্রমণ চালায়। সেদিন ২১ অক্টোবর সিরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. মাদনি আল খিয়ামি বাংলাদেশ দলকে দামেস্কে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানান।

সিরিয়ার ৯ ডিভিশনের পেছনে দামেস্ক থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে দারুসসালামে বাংলাদেশ দলকে মোতায়েন করা হয়, যেখানে দ্বিতল একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ দল অস্ত্রোপচার সুবিধাসহ একটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করে। বাংলাদেশ দল ২২ নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। এই হাসপাতালে ৩০ দিনে কয়েক হাজার সেনা সদস্য, মুজাহিদ, আহত গ্রামবাসীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা নিরলসভাবে যুদ্ধাহতদের সেবা করেছেন। সিরিয়ার রণাঙ্গনে বাংলাদেশ দল অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে বলে দলটি সিরিয়ায় বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। আরব বিশ্বের বেশ কিছু সংবাদপত্রে বাংলাদেশ দলের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করা হয়। যুদ্ধ শেষে দামেস্কের উমায়েদ মসজিদের (Great Mosque of Damascus নামেও পরিচিত) গ্র্যান্ড মুফতি খুতবার সময় বাংলাদেশিদের এই অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই অভিযানের তাৎপর্য ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

বাংলাদেশ কনটিনজেন্ট যুদ্ধের ময়দান থেকে ২২ নভেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে আসে। ২৪ নভেম্বর সিরিয়ার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বৈরুত বিমানবন্দরে বাংলাদেশ দলকে আন্তরিক বিদায় জানান। আরবদের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন ও দৃঢ় অবস্থান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৩ সালের শেষে বাংলাদেশ আরবদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম

হয় এবং তাদের সাথে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। তারপর ১৯৭৩ সালের শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ১৫টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের সমর্থন ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মিসরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত বাংলাদেশকে এক রেজিমেন্ট ট্যাংক উপহার দেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, ক্ষণজন্মা নেতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক পরিকল্পনা, সময়োপযোগী সাহসী সিদ্ধান্ত ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সম্মানজনক অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ অদ্যাবধি জাতিসংঘের অধীনে ৫৪টি শান্তিরক্ষা মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে মোট ১,৭৫,০৮৯ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ৬,৪১৩ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করার এই যাত্রা শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে মাত্র ২৮ জন শান্তিরক্ষীর দ্বারা। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২০)

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ

ইমদাদুল হক মিলন

সবুজ মাঠ ভেঙে দৌড়াচ্ছে এক কিশোর। হাতে লম্বা সরু বাঁশের মাথায় বাঁধা বাংলাদেশের পতাকা। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে পতাকা। দৌড়ের তালে পতপত করে উড়ছে। গভীর আনন্দ-উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে কিশোর। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

এই ঘটনা ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের। বিক্রমপুরের এক গ্রামের মাঠ। বাংলাদেশের বহু অঞ্চল ১৬ তারিখের আগেই শত্রুমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি মিলিটারিরা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেদম মার খেয়েছে। মরে ভূত হয়েছে হাজার হাজার। আহত হয়েছে প্রচুর। যারা বেঁচে গেছে তারা কোনো রকমে পালিয়ে গেছে ঢাকায়। রাজাকার, আলবদর, আলশামসদেরও একই অবস্থা। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েছে অনেকে, অনেকে গাঢাকা দিয়েছে। যারা ধরা পড়েছে তারা টের পাচ্ছে ৯ মাসে যে অত্যাচার বাংলার মানুষের ওপর করেছে তার মাসুল কীভাবে দিতে হয়।

যে মাঠে দৌড়াচ্ছিল কিশোর সেই এলাকা শত্রুমুক্ত। সূর্য অস্ত যাচ্ছে মাঠের ওপারে। একটা মাত্র রাত। তারপর আসছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যে রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, যেখান থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' সেই মাঠেই আত্মসমর্পণ করবে নিয়াজি বাহিনী। সেই মাঠেই জন্ম নেবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আগামীকাল বাংলার আকাশে উঠবে স্বাধীনতার সূর্য। সেই আনন্দক্ষণে ৯ মাসে ঘটে যাওয়া কত বেদনার কথা মনে পড়বে স্বজন হারানো বাঙালির। কত নৃশংসতার ঘটনা মনে পড়বে! কত ত্যাগ, নারীর সম্ভ্রম আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো এই বাংলা, সেই সব কথা মনে পড়বে।

২৫ মার্চের রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পাকিস্তানিরা শুরু করেছিল গণহত্যা। ঢাকা শহরকে চার ভাগে ভাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই রাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকার ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলের ছাত্রদের একত্র করল। জগন্নাথ হলের সামনে ছাত্রদের দিয়ে বিশাল গর্ত করাল। তাদের সবাইকে হত্যা করে ওই গর্তে মাটিচাপা দিল। ইউনিভার্সিটির টিচারদের মারল, সাধারণ কর্মচারীদের মারল। আশপাশের বস্তিগুলোতে আগুন দিল, শহিদ মিনার গুঁড়িয়ে দিল। ঢাকা শহরের চারদিক হয়ে উঠল দোজখ। শুধু আগুন আর আগুন। শুধু গুলির শব্দ, কামানের শব্দ।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাঙালি পুলিশরা প্রতিরোধ গড়েছিল। প্রচুর বাঙালি পুলিশ হত্যা করল ওরা। ইপিআর জোয়ানদেরও একই অবস্থা। সদরঘাট টার্মিনালে রাতের

লঞ্চে চড়ার আশায় যারা বসেছিল তাদের সবাইকে মেরেছে। রাস্তায় শুধু লাশ আর লাশ। পিচের কালো রাস্তা রক্তে লাল। জগন্নাথ কলেজের গেটের কাছে লাশের স্তূপ। নারায়ণগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে লাশ। পরদিন সকাল পর্যন্ত আগুন জ্বলেছে কোথাও কোথাও।

২৭ মার্চ দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল। সেই ফাঁকে ঢাকার মানুষ বুড়িগঙ্গা পার হয়ে জিঞ্জিরা, কেরানীগঞ্জ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। এপ্রিলের ২ তারিখে ফজরের সময় জন্তুরা ওপারে গিয়ে আক্রমণ চালাল ঘুমন্ত মানুষের ওপর। হাজার হাজার মানুষ মেরে ফেলল। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে কত যে বধ্যভূমি! ঢাকার রায়েরবাজারে, মিরপুরে। ৯টা মাসজুড়ে মানুষ মেরে ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে রায়েরবাজারে ফেলা হতো, মিরপুরে ফেলা হতো। বিহারিরা যোগ দিয়েছিল পাকিস্তানিদের সঙ্গে। এক যুবককে বাঁশে গেঁথে নিয়ে এসেছে নবাবপুরে। মায়ের কোল থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে আকাশে ছুড়ে দিয়েছে। তলোয়ার কিংবা বর্শা উঁচিয়ে ধরেছে সেই শিশুর দিকে। শিশুটি গেঁথে গেছে তলোয়ারে, বর্শায়।

চুকনগরের কথা বলি। চুকনগর হচ্ছে খুলনার ডুমুরিয়া থানায়। ওদিক দিয়ে ভারতে ঢুকে যাওয়া সহজ। প্রাণ বাঁচাতে মানুষ তখন বর্ডার পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছিল। প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে চলে গিয়েছিল ভারতে।

মে মাসের ২০ তারিখ। বহু মানুষ চুকনগরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাজারের ভেতর দিয়ে ভারতে ঢুকে যাবে। বর্ডার খুলে দিয়েছে ভারত সরকার। খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা গেল সেখানে। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা। চার ঘণ্টায় ২০ হাজার লোককে মারল। চুকনগর বাজার হয়ে গেল মৃত্যুপুরী। পাশের নদীটির পানি লাল। হাজার হাজার লাশের মধ্যে পড়ে আছে রক্তে ভেসে যাওয়া মৃত মা। কোলের শিশুটি অবুঝ। সে বেঁচে আছে। মায়ের বুকের দুধ পান করার চেষ্টা করছে...।

প্রতিদিন নানা বয়সি মেয়েদের ধরে আনা হতো রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। বিবস্ত্র করে আটকে রাখা হতো। উপর্যুপরি তাদের ওপর চলত নির্যাতন। মেয়েদের আর্তনাদে কাঁপতে থাকত আকাশ-বাতাস। মেয়েদের বিবস্ত্র শরীর সিলিংয়ের সঙ্গে টাঙানো হতো। মাথা নিচের দিকে, পা ওপরের দিকে। ওই অবস্থায় মারা গেছে কত মেয়ে!

যুবতীর নাম ভাগীরথী। বয়স আঠারো-উনিশ। পিরোজপুরের বাঘমারা কদমতলা গ্রামে বাড়ি। মে মাসের এক বিকেলে ট্রাকভর্তি মিলিটারি গেল সেই গ্রামে। পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিল, যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। ভাগীরথীকে নিয়ে এলো ক্যাম্পে, তারপর পাশবিক অত্যাচার চালাল। দিনের পর দিন চলল এই নির্যাতন। ভাগীরথী একটা সময়ে জন্তুদের আস্থা অর্জন করলেন, ভালো রান্নার হাত, তাদের রান্না করে খাওয়াতেন। ভেতরে তাঁর আগুন জ্বলছে। প্রতিশোধ নেবেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলেন। তাঁদের গ্রামে জন্তুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ৪৫ জনের মধ্যে ৪০ জনকেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম করালেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন ভাগীরথী। তবে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন। ভাগীরথীকে

ওরা পাশাপাশি দুটি জিপের সঙ্গে বিবস্ত্র করে বাঁধল। দুই জিপে দুই পা, দুই হাত। দুই জিপ দুই দিকে চালিয়ে দিল। ভাগীরথী কাগজের মতো ছিঁড়ে গেল...।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হাজার হাজার বাঙালিকে ধরে এনে হত্যা করা হতো। পাহাড়তলী হয়ে হাটহাজারীতে যায় ট্রেন। ট্রেন থেকে নামিয়ে জবাই করা হতো বাঙালিদের। ওই এক জায়গায়ই হত্যা করা হয়েছিল ১০ হাজারেরও বেশি বাঙালি। রমজান মাসের ২০ তারিখে ফয়'স লেক এলাকায় শত শত গলাকাটা মানুষের লাশ পড়েছিল। লেকের উল্টো দিকের পাহাড়ের তলায় শুধু যুবতী মেয়েদের লাশ। তারা প্রায় প্রত্যেকেই গর্ভবতী। ১০৮২টা লাশ ছিল সেখানে। এ রকম হাজার হাজার নৃশংস ঘটনা একাত্তরের ৯ মাসজুড়ে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই তাঁর কথামতো ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছিল বাঙালিরা। ২৫ মার্চের পর থেকেই বাঙালি জাতি শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধ। ধীরে ধীরে সেই যুদ্ধ রূপ নিল গণযুদ্ধে। পাকিস্তানি পা-চাটার দল ছাড়া প্রত্যেক বাঙালি হয়ে উঠল যোদ্ধা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যার যা কিছু আছে, বঙ্গবন্ধুর কথামতো তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে লাগল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া দখল করেছিল। ৩০ মার্চ ভোর ৪টায় বাঙালি বীর সৈনিকরা, পুলিশ ও আনসার আর ছাত্র-জনতা মিলে কুষ্টিয়ার প্রতিটি মিলিটারি ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। বাঙালি সৈনিক, পুলিশ ও আনসারের সঙ্গে লাঠি-বল্লম নিয়ে যুক্ত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সেদিন বিকেলের মধ্যে পাকিস্তানিদের সব ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। বাকি ছিল শুধু কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের ঘাঁটিটি। দুই দিন এভাবে যুদ্ধ চলার পর ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে শুরু করল পাকিস্তানি মিলিটারিরা। এলাকার সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তা কেটে রেখেছিলেন। রাস্তার কাটা অংশে চাটাই ফেলে তার ওপর আলকাতরা এমনভাবে মাখিয়ে রেখেছিলেন, দেখে বোঝার উপায় নেই কাটা রাস্তা। পাকিস্তানিদের ট্রাক আর জিপ সেই সব কাটা রাস্তায় পড়ে উল্টে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা গুলির পর গুলি চালিয়ে পাকিস্তানিদের মারতে লাগলেন। যারা এই আক্রমণ থেকে বাঁচল তারা ছড়িয়ে গেল চারপাশের গ্রামে। একজন পাকিস্তানি সৈনিকও সেখান থেকে জীবিত ফিরতে পারেনি। সাধারণ মানুষই তাদের মেরেছিল।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ আর সৈন্য ফেনীর ওপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানিদের। মুক্তিযোদ্ধারা এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের প্রতিরোধে চুরমার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। ডিসেম্বরের ৬ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধারা ফেনী বিলোনিয়া মুক্ত করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই যুদ্ধের কৌশল এখন পৃথিবীর বিভিন্ন সামরিক কলেজে পড়ানো হয়।

আমাদের সাত বীরশ্রেষ্ঠ তাঁদের জীবনের বিনিময়ে বিশাল অবদান রেখে গেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতায়। কত বীরত্বের ঘটনা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে। বাংলার দামাল ছেলেরা আর সর্বস্তরের মানুষ যে যাঁর জায়গা থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কিছু দেশদ্রোহী ছাড়া বাংলার প্রত্যেক মানুষ তখন মুক্তিযোদ্ধা।

পাকিস্তানিদের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই ঘটছে না প্রমাণ করার জন্য পৃথিবীর বড়ো বড়ো দেশের সাংবাদিকদের ডেকে আনা হয়েছে। ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে রাখা হয়েছে তাঁদের। পরদিন সকালবেলা শান্তিপূর্ণ(!) ঢাকা শহর দেখাতে নেওয়া হবে। বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা গ্রেনেডে গ্রেনেডে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দেয়াল ধসিয়ে দিলেন। মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল এই ঘটনা। বিশ্ব জেনে গেল কী ঘটছে পূর্ব পাকিস্তানে! এভাবে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

আগস্ট মাসের ৯ তারিখ। টাঙ্গাইল এলাকার ধলেশ্বরী নদীর তীরে পাকিস্তানিদের সাতটা জাহাজ এসে নোঙর করল। জাহাজগুলো অস্ত্রবোঝাই। বগুড়ার ফুলছড়ি ঘাটে খালাস করা হবে। সেখান থেকে রংপুর আর সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধারা মেজর হাবিবের নেতৃত্বে এই জাহাজগুলো দখল করেছিলেন। ফলে বিপুল অস্ত্র এসেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আরেক বিশাল অভিযানের নাম 'অপারেশন জ্যাকপট'। কর্ণফুলীর জেটিতে অস্ত্রবোঝাই বড়ো বড়ো জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্য আগস্টে আমাদের ৬০ জন নৌ কমান্ডো তিনটি দলে ভাগ হয়ে, রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে সাঁতরে সেই সব জাহাজের কাছে পৌঁছালেন। ডুব দিয়ে দিয়ে জাহাজের গায়ে লিম্পেট মাইন লাগিয়ে দিলেন। তারপর যে রকম নিঃশব্দে এসেছিলেন সে রকম নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। রাত ১টা ৪০ মিনিটে শুরু হলো বিস্ফোরণ। একের পর এক বিস্ফোরণ। পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য নিয়ে আসা অস্ত্রবোঝাই বিশাল বিশাল জাহাজ একটার পর একটা কর্ণফুলীতে ডুবতে লাগল। এভাবেই এলো আমাদের স্বাধীনতা।

১৬ ডিসেম্বরের দুই দিন আগে জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য কুটিল পাকিস্তানিরা রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় শেষ আঘাত হানল। বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য হত্যা করল বহু বুদ্ধিজীবীকে। তারপর ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে মাথা নিচু করে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করল। স্বাধীন হলো প্রিয় বাংলাদেশ।

সেই চূড়ান্ত আনন্দের ক্ষণে বাঙালি জাতির একটিই অপেক্ষা, আমাদের প্রিয় নেতা কবে ফিরে আসবেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে? বাংলার আকাশ অপেক্ষা করতে লাগল বঙ্গবন্ধুর জন্য, বাংলার মাটি অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে। মুহূর্তে আলোয় আলোয় ভরে গেল বাংলাদেশ। স্তব্ধ হয়ে থাকা নদী বইতে লাগল নিজের ছন্দে। পাখিরা গান ধরল। ফুলেরা ফুটে উঠল। ফসলের মাঠ পূর্ণ হলো। স্বাধীন দেশের মায়াবী হাওয়া বইতে লাগল। আর বাংলাদেশের হৃদয়ে বেজে উঠল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০০৯)

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মানুষের ওপর কাপুরুষের মতো আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার তাৎক্ষণিক কোনো সুযোগ কারো ছিল না। ঢাকার রাজারবাগে পুলিশ ও পিলখানায় ইপিআর বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে, যেহেতু তাদের হাতে কিছু অস্ত্র ছিল, কিন্তু একটি সুসজ্জিত এবং সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই পাল্টা আক্রমণ বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ২৫ মার্চ রাতের ঘটনায় একদিকে ছিল একটি সশস্ত্র, বর্বর বাহিনী; অন্যদিকে নিরস্ত্র মানুষ, যারা প্রতিদিনের মতো দিনের কাজ শেষে ঘুমাতে গিয়েছিল। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেই ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানি উপনিবেশী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রামের কেন্দ্রভূমি, একাত্তরের মার্চের শুরু থেকেই যার শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমেছে স্বাধীনতার পক্ষে, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উড়িয়েছে এর একটি ভবনের মাথায়, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি গুলিও ছোড়া হয়নি শত্রুর দিকে। বিষয়টি অবাক করার মতো হলেও এর অন্তর্নিহিত সত্যটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ : শুরু থেকে স্বাধীনতার জন্য বাঙালির সংগ্রাম ছিল অহিংস। ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম যে অহিংস ছিল, তা বাঙালি চরিত্রের একটি প্রধান গুণের শান্তিপ্রিয়তাকে তুলে ধরে। আমাদের আন্দোলন অহিংস ছিল বলে বিশ্বজুড়ে আমরা দ্রুত সমর্থন পেয়েছি, আমাদের প্রতি নৈতিক সহমর্মিতা দেখিয়েছেন বিশ্বের বরেণ্য অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন। কিন্তু একবার যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, তখন এই শান্তিপ্রিয় জাতিটিই অপ্রতিরোধ্য এবং অকুতোভয় হয়ে দেখা দিল। বাঙালির ভেতরে আগুন ও জল, স্ফুলিঙ্গ ও ফুলের এই সহাবস্থান পাকিস্তানিরা চিহ্নিত করতে পারেনি। পাকিস্তানের সমর নেতাদের থেকে নিয়ে রাজনীতিবিদরা আমাদের দেখতেন খুব নিচুদৃষ্টিতে। আমরা তাঁদের কাছে ছিলাম প্রজার অবস্থানে, আমাদের কাছে থেকে বশ্যতা ছাড়া কিছুই তাঁরা প্রত্যাশা করেননি। এই বশ্যতা তাঁরা পেয়েছেন তাঁদের বশংবদ এবং স্তাবক কিছু ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ এবং আমলার কাছ থেকে। একাত্তরের ৯ মাস রাজাকার-আলবদর বাহিনীর লোকজন পাকিস্তানিদের প্রভু জ্ঞান করে তাদের সামন্তবাদী মনোবৃত্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছে, তাতে পাকিস্তানিরা সন্তুষ্ট থেকেছে; কিন্তু তারা শুরু থেকেই জানত, এই দেশের সচেতন মানুষ, ছাত্র-শ্রমিক এবং কৃষকরা স্বাধীনচেতা। এদের দমিয়ে রাখাটা ছিল তাদের প্রধান করণীয়। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত গণতন্ত্র চলেছে পাকিস্তানে এবং তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা একসময় পূর্ব বাংলার হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্ভাবনায় ভীত পাকিস্তানিরা সামরিক শাসনের মাধ্যমে সেনাপতিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে এবং ১৯৫৮ সালের পর দেশটির পাকিস্তানিরা ভেবেছে, ক্ষমতা এখন চিরস্থায়ীভাবে থাকবে ইসলামাবাদে, বাঙালিরা থাকবে উনজন হয়ে, আর তারা নিজেরা থাকবে প্রভুর অবস্থানে।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬ দফা ঘোষণা করলে পাকিস্তানিদের আস্থায় চিড় ধরে। এবার সমরপতিদের সঙ্গে মাঠে নামেন জুলফিকার আলী- ভুট্টোর মতো কিছু রাজনীতিবিদ। কিন্তু দীর্ঘদেহী, উঁচুশির শেখ মুজিব অটল লক্ষ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। তাঁর সহযাত্রী ছিল সকল বাঙালি। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়, বিচার অথবা বিচারের নামে প্রহসন হয়, কিন্তু তিনি বেরিয়ে আসেন কারাগার থেকে। পাকিস্তানিদের পক্ষে নির্বাচন দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না।

ইতিহাসের একটি বড়ো পরিহাসকে মূর্ত করে এক ভিন্ন সমরপতির পৌরহিত্যে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয় হয়। শেখ মুজিব তত দিন মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু নামেই প্রিয়। ওই এক নামেই তাঁকে সবাই ডাকে। যখন ওই সমরপতি তাঁর সেনাবাহিনী ও ভুট্টোর মতো কিছু রাজনীতিবিদের সলা-পরামর্শে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে নানা কূটকৌশল শুরু করলেন, একাত্তরের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই মহাকাব্যিক ভাষণে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার ঘোষণা জানিয়ে দিলেন সারা বিশ্বকে। জননেতা মওলানা ভাসানী, যিনি সারা জীবন নির্যাতিত কৃষক ও শ্রমিকের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, তিনি পাকিস্তানকে বললেন, বিদায়। এরপর সমরপতি ইয়াহিয়া খান লোক-দেখানো আলোচনায় বসলেন বটে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল সারা দেশে সেনা মোতায়েনের ও পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও সেনা আমদানির জন্য সময় বাগানো।

২৫ মার্চ ছিল অবধারিত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সে জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। তবে তারা হয়তো ভেবেছিল, প্রতিরোধ হবে। সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রতিরোধ হয়নি, কারণ বাঙালি এই নৃশংসতার জন্য তৈরি ছিল না। তা ছাড়া কখনো প্রথম আঘাতটি বাঙালি হানে না। রাজপথের সংগ্রামে দাবি আদায়েই অভ্যস্ত বাঙালি, অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নয়। কিন্তু ওই জল-আগুনের বিষয়টাও তো অবধারিত। আঘাত যখন এসেছে, প্রতি-আঘাত দিতে হবে। মাঝরাতে ছাত্রদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলি চালিয়েছে যে কাপুরুষরা, তাদের যোগ্য উত্তর দিতে হবে। রিকশায় ঘুমন্ত রিকশাচালক, ফুটপাতে শুয়ে থাকা ছিন্নমূল মানুষদের যারা পাখির মতো মেরেছে, তাদেরও মৃত্যুর স্বাদ পৌঁছে দিতে হবে–এ রকম প্রত্যয় থেকে জন্ম হলো সশস্ত্র প্রতিরোধের এবং তা সংহত হতেও সময় লাগেনি।

২৬ মার্চও ছিল অবধারিত। ২৫ মার্চ কালরাতের মৃত্যু বিভীষিকা নিশ্চিতভাবেই জন্ম দিল মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনার ও প্রত্যয়ের, স্বাধীনতার এবং মুক্তির। ২৬ মার্চ তাই ভয়ানক এক পরাধীনতার মধ্যে থেকেও আমরা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছি, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি, দেশের জন্য যুদ্ধে গিয়েছি। ২৬ মার্চ যে অর্থে স্বাধীনতা দিবস, তার তাৎপর্যটি অনেক বড়ো। একটি জাতি যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে তার চিন্তা যেখানে স্বাধীন, তার সংস্কৃতি পরাভূত হওয়ার নয় এবং জাতি হিসেবে তারা মাথা উঁচু রাখতেই শুধু জানে, অতএব তার ভূখণ্ডে শত্রুর পদচারণ আর চলতে পারে না–সেই

দিন বা মুহূর্ত থেকেই সম্ভবত সে স্বাধীন। যখন দেশের প্রতিটি মানুষ এ রকম একটি প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে, দেশ এখন শত্রুর দখলদারিত্বে থাকলেও একদিন তার অবসান ঘটবেই, সেদিনই সেই অবসান এক প্রতীকী অর্থে ঘটে যায়, রাস্তবে সে জন্য কিছুটা সময় লাগলেও।

২৬ মার্চ আমাদের জন্য সার্বিক একটি উদযাপনের দিন। অনেক কিছুর সঙ্গে আমরা উদযাপন করব আমাদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে, গণমুক্তির প্রত্যয়কে, বাঙালি চরিত্রের আগুন ও বারুদকে এবং বাঙালির শান্তিপ্রিয়তাকে। একই সঙ্গে আমরা উদযাপন করব গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে গিয়েছিল আওয়ামী লীগ। না গেলেও হয়তো চলত, কারণ তত দিনে স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের যুক্তিগুলো প্রবল হয়েছে, সকল বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে–বস্তুত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবিও শক্তিশালী হয়েছে এবং এর ফলে সশস্ত্র একটি যুদ্ধে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না আমাদের জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পথ বেছে নিয়েছে এবং মানুষ তাকে স্বাগত জানিয়েছে। মানুষ তাদের ইচ্ছাটি খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচনের রায়ের মধ্য দিয়ে। বাঙালি যে প্রথমে গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক একটি সমাধান চেয়েছে তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার-সংকটের, নির্বাচনটি তা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক পথটিতে যখন পাথরের দেয়াল তুলে দিল পাকিস্তানিরা এবং ২৫ মার্চ রাতে সেই দেয়ালের নিচে চাপা দিতে চাইল বাঙালিদের, তখন সশস্ত্র সংগ্রামে যেতে হয়েছে বাঙালিদের এবং সেখানেও তারা জয়যুক্ত হয়েছে। অতএব ২৬ মার্চ আমরা উদযাপন করব বর্বর অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিবেকের অস্ত্রের বিজয়কে, বাঙালির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামী চেতনাকে। এবং এই উদযাপন শুধু এক দিনের নয়, প্রতিদিনের হতে হবে। তা না হলে আমাদের চেতনা ও ইচ্ছাগুলোকে, আদর্শ এবং বিশ্বাসগুলোকে আমরা ক্রমাগত নবায়ন করতে পারব না। অথচ প্রতিনিয়ত যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগুলোর কাছে ফিরে না যাই, জাতি হিসেবে আমরা আর প্রত্যয়ী থাকতে পারব না, দুর্বল হয়ে পড়ব।

২। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পর আরেক স্বাধীনতা দিবসের সূর্যোদয় হয়েছে, কিন্তু কত কিছুর পরিবর্তন হয়েছে এই চার দশকে। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ ছিল বিষণ্ন, বিপন্ন একটি দিন, মানুষ তখনো ভীতসন্ত্রস্ত; সকলেই ছুটছে আশ্রয়ের জন্য। একটা অনিশ্চয়তা আর বিপদের ভাব ছিল সর্বত্র। কিন্তু তারপরও মানুষ তার মনের গভীরে শুনেছে স্বাধীনতার ডাক; জেনেছে এই পরাধীনতার দিন শেষ হবে। কারো পক্ষে নিশ্চয়ই জানা সম্ভব ছিল না, বছরটি পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই স্বাধীন হবে দেশ। অনেকেই ভেবেছে, ভিয়েতনামের মতো দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছি আমরা। মানুষ সেই সম্ভাবনাকেও স্বাগত জানিয়েছে। যুদ্ধে যখন নেমেছি, জয়ী হবোই; সুড়ঙ্গের ভেতরে যখন ঢুকেছি, যত দীর্ঘই হোক সুড়ঙ্গটি, একদিন তার শেষ মাথায় আলো দেখবই–এ রকম বিশ্বাস জন্মেছে মানুষের মনে। কিন্তু স্বাধীনতারপর

বেশিদিন গেল না, দেশটিকে নিয়ে একাত্তরের পরাজিত শত্রুদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। তারপর ঘটতে থাকল একে একে নানা ঘটনা। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট পরিবারের প্রায় সকলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন, দেশে সামরিক শাসন এলো, স্বৈরশাসন এলো, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার গণতন্ত্রের মুখও আমরা দেখতে পেলাম। কিন্তু নতুন গণতন্ত্রের গায়ের পোশাকটা গণতন্ত্রের হলেও দেহ এবং মনটা রয়ে গেল স্বৈরতন্ত্রের। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে আমরা যা বুঝি, তার কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। একসময় একাত্তরে পাকিস্তানের সহায়তাকারী, যুদ্ধাপরাধীরাও রাষ্ট্রক্ষমতায় বসল এবং এর ফলে যে নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম নিল, যে দুর্নীতি গ্রাস করল দেশটাকে, তার প্রভাবে অনেক অভাবনীয় ঘটনাও ঘটল–২০০৭ সালের নির্বাচনে একটি দলকে নির্বাচনে জেতানোর সকল রাষ্ট্রীয় আয়োজন সম্পন্ন হলো। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি যে পালাবদল ঘটল, তা এক কালো অধ্যায়ের আপাত-সমাপ্তি ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে প্রায় দুটি বছর জরুরি অবস্থার নিচে ঠেলে দিল দেশটিকে, যার ভালো-মন্দের খতিয়ান এখনো নেওয়া শুরু করতে পারিনি আমরা।

৩। জরুরি অবস্থার নিচে থেকেই একটি নির্বাচন পেল জাতি, যে নির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট এখন ক্ষমতায়। আড়াই মাসের কিছু বেশি হয়েছে এই সরকারের বয়স, কিন্তু এরই মধ্যে বিরাট হুমকি আসছে সরকারের সামনে। এগুলোর সফল মোকাবিলা না করতে পারলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, লুপ্তও হতে পারে। সরকারকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দিয়েছে দেশের প্রতিটি মানুষ–যারা ভোট দিয়েছে মহাজোটের পক্ষে, যারা ভোট দেয়নি, সবাই। সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নির্বাচনের আগে ও পরে, সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার যদি তার কথায় ও কাজে নিষ্ঠাবান থাকে, গণতন্ত্র সুদৃঢ় থাকবে, কারণ গণতন্ত্রের রক্ষক সাধারণ মানুষ। একই সঙ্গে গণতন্ত্র নামের যে মুদ্রার ওই পিঠে আছে বিরোধী দল, তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। বিরোধী দলকে যথাযথ সম্মান দিতে হবে সরকারকে–গণতন্ত্রে বিরোধী দল যত ক্ষুদ্রই হোক সংখ্যা বিচারে, ছায়া সরকারও বটে। সেই ভূমিকা তাকে পালন করতে সব রকমের সাহায্য দিতে হবে সরকারকে। আর জাতীয় যেকোনো দুর্যোগে বিরোধী দলকে আস্থায় নিতে হবে। তাহলেই সম্মিলিত একটি গণতান্ত্রিক শক্তি পূর্ণতা পাবে।

৪। স্বাধীনতা দিবসের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার অনেক মানে। একটি মানে হচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎ আমাকেই নির্মাণ করার সামর্থ্য ও সুযোগপ্রাপ্তি এবং তা কাজে লাগানোর উন্মুক্ত পরিবেশ। একমাত্র গণতন্ত্রই পারে সেই উন্মুক্ত পরিবেশ রচনা করতে।

স্বাধীনতা দিবসে গণতন্ত্রের জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা আরেকবার নবায়নের মাধ্যমে আমরা সেই কালরাত্রির শহিদদের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের অগণিত শহিদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধা জানাই। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৩)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

স্বাধীনতা এক গোলাপ ফোটানো দিন

রীতা রায় মিটু

জানুয়ারি মাস দিয়ে ইংরেজি বছর শুরু হলেও আমার কাছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডিসেম্বর মাসকে যেকোনো বছরের শুরু মনে হয়। কারণ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশের যত উৎসব, যত আনন্দ-বেদনার কাব্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজয় দিয়েই যেকোনো কিছু শুরু করতে চাই বলেই হয়তো ১৬ই ডিসেম্বর দিয়ে শুরু করি আমার নতুন বছর। আর তাই এক ১৬ই ডিসেম্বর থেকে শুরু করে পরের বছরের ১৬ই ডিসেম্বরে গিয়ে আমার বছর শেষ হয়। এটা একান্তই আমার কল্পনা, আমার অনুভূতি।

বিজয় দিয়ে চেতনা শুরু করার বীজ রোপিত হয়েছিল সেই পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে, যখন আমি ছিলাম নিতান্তই শিশু। ১৯৬৯-এর আন্দোলনের ঝাঁজ কিছু কিছু স্মৃতিতে হানা দেয় মূল রাস্তার পাশেই আমাদের বাড়ি ছিল বলে–হরতাল, মিছিল, কারফিউসহ '৬৯ থেকে '৭১-এর মার্চ পর্যন্ত অনেক ঘটনাই এলোমেলোভাবে মনের ভেতর এখনো ঘুরপাক খায়। এ এমনই এক উত্তাল সময় ছিল যে রাস্তার কুকুররাও মনে হয় টের পেত পরিস্থিতি, তাই বোধ হয় ওরা একেক সময় একেক সুরে আর্তনাদ করে বেড়াত। কুকুর-বিড়ালের ডাক শুনে নাকি লক্ষণ-অলক্ষণ বিচার করা যায়। তা একসময় সেই কুকুরের ডাকও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানিদের অত্যাচারে।

মানুষ স্বভাবগত দিক থেকেই স্বাধীনতাকামী। পৃথিবীর সকল দেশেরই নিজস্ব ইতিহাস আছে, আর কিছু দেশের আছে অর্জিত ইতিহাস। অর্জিত ইতিহাসের প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশের নাম মনে হয় সবার ওপরে। আমাদের আছে স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাস, আছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আছে স্বাধীন দেশ সৃষ্টির ইতিহাস, আছে স্বাধীন দেশের রূপকারকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যার ইতিহাস, আছে স্বাধীন দেশেই ধারাবাহিকভাবেই সেনাশাসনের ইতিহাস আবার সেনাশাসনের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের ইতিহাস। সেই ইতিহাস ঘেঁটেঘুটে দেখলে দেখা যায়, বাঙালি চলে আবেগতাড়িত হয়ে। বাঙালি জাতির এই জাতিগত আবেগকে কাজে লাগিয়ে বেশির ভাগ সময় সুফল অর্জিত হয়েছে, দেশ ইংরেজ শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে শুধু মুক্তিই পায়নি, একেবারে একটি আস্ত স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশকে পেয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৪১ বছর আগে। ৪১ বছরে দেশ হিসেবে, জাতি হিসেবে আমাদের কোথায় থাকার কথা ছিল, আর আমরা কোথায় আছি, তা ভেবে দেখলে মনটা আশা-নিরাশায় ভরে যায়। একটি স্বাধীন দেশ পেতে গেলে কত ত্যাগ-তিতিক্ষা, কত রক্তপাত, কত সন্তান বিসর্জন, কত অশ্রু বিসর্জন দিতে হয়, তা কি শুধু ইতিহাসের পাতা পড়লেই জানা হয়ে যায়? ইতিহাসের পাতায় থাকে শুধু ঘটনার বর্ণনা, মানুষের হৃদয়ের ক্রন্দন তো লেখা থাকে না। হৃদয়ের ক্রন্দন অনুভব করার বিষয়। পরিতাপের

বিষয় যে এখনো আমরা 'জাতির পিতা' দ্বন্দ্বে ভুগি, 'স্বাধীনতার ঘোষক' দ্বন্দ্বে ভুগি, 'দেশ বিক্রি হয়ে যাওয়া'র ভয়ে ভুগি, 'ভারত জুজুর' ভয়ে ভুগি, রাজনৈতিক নেতাদের (দুই নেত্রীর) মন-কষাকষিতে, মতপার্থক্যের অনিশ্চয়তায় ভুগি, দুর্নীতির করালগ্রাসে আতঙ্কিত থাকি, কলুষিত ছাত্ররাজনীতির পরিণতি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

কিন্তু যেহেতু আমি বিজয় দিয়েই আমার ভাবনাকে পরিচালিত করি, তাই হতাশার পাশাপাশি আশাটাকেই আমি বড়ো করে দেখি। আমি জাতির পিতার হত্যাতে যেমন মুষড়ে পড়েছিলাম, তেমনি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দেখে আন্দোলিত হই। এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তারপরও তারা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, বাগবিতণ্ডার মধ্যে না গিয়ে কীভাবে নিজের দেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই প্রজন্মের তরুণরাই পেরেছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে, এই প্রজন্মের তরুণরাই পেরেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দলের মর্যাদা দিতে, এই প্রজন্মের তরুণরাই পেরেছে বিশ্বের সাত সেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবনকে প্রতিযোগিতায় প্রথম সারি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। আমার নিজের সন্তানরাসহ বাংলাদেশের আরো মেধাবী ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ কায়িক পরিশ্রম করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, কেউ তাদের মেধা কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছে, কেউ-বা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর গবেষণাকেন্দ্রে নিজের মেধাকে আরো বিকশিত করার চেষ্টায় ব্রতী আছে।

আর দেশে থেকে যারা সারাটাক্ষণ শত বৈরিতার মাঝেও নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভালোভাবে বেঁচে থাকার, তাদের কথা ভাবলেই মন ভালো হয়ে যায়। মনে আশা জাগে, দেশেও এখন কত উন্নতি হয়েছে, তা বোঝা যায় ফেসবুকে গেলে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কত বেশি সচেতন, তা তাদের মন্তব্য পড়ে বোঝা যায়। মন্তব্যের ভেতর থাকে তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। সবার কথা বলি না, ভালো-মন্দ মিলিয়ে মানুষ, আমি ভালোটাই সামনে রাখি, মন্দটাকে এড়িয়ে চলি। অনেক সমালোচনা শুনি দেশ সম্পর্কে, এখন আর আগের মতো ভয় পাই না। জানি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। ভালো লাগে যখন বুঝি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক এগিয়েছে, নকল হয় না, পাসের হার বেড়েছে, যুবকরা নিজেরাই কর্মসংস্থান করে নিচ্ছে। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কৃষিকাজে, পোল্ট্রি ব্যবসায় মনোযোগী হচ্ছে। এভাবেই তো দেশ আগায়, আমরাও এগিয়ে যাব। হয়তো আরো অনেক বাধা-বিপত্তি আসবে, কিন্তু এই প্রজন্ম অনেক বুদ্ধিমান, এরা আবেগেও আছে, বাস্তবতায়ও আছে। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, শত মতপার্থক্য থাকার পরেও ২৬শে মার্চ বা ১৬ই ডিসেম্বরে যখন দেখি ফেসবুক নামের ওয়েবসাইটটি 'লাল-সবুজের' পতাকায় ভরে যায়। চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু পড়ে এই একটি জায়গাতে সবাইকে এক বিন্দুতে দাঁড়াতে দেখে। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৩)

লেখক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক।

মুজিববর্ষে বিজয় দিবসের স্বপ্ন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

যারা ১৯৭১-কে নিজের চোখে দেখেছে তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত কোনটি–তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা বলবে সেটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। আমার মনে হয়, যারা ১৯৭১ সালকে নিজের চোখে দেখেছে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ। কারণ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়ে এই দেশের সাধারণ মানুষ যে নিজের জীবন বিপন্ন করে কত বড়ো আত্মত্যাগ করতে পারে, দেশকে কত তীব্রভাবে ভালোবেসে কত অবহেলায় নিজের প্রাণটি বিলিয়ে দিতে পারে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, এই দেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জনটি তারা কীভাবে ছিনিয়ে আনতে পারে সেটি নিজের চোখে দেখেছে, তারা যদি সৌভাগ্যবান না হয়, তাহলে কারা সৌভাগ্যবান হবে? আবার অন্যভাবে দেখলে তারা এক ধরনের দুর্ভাগা মানুষ হতে পারত, কারণ তাদেরকে নিজের চোখে পৃথিবীর নৃশংসতম একটি গণহত্যা দেখতে হয়েছে, পাকিস্তানি মিলিটারি এবং তাদের পদলেহী অনুচররা যে কত নৃশংস হতে পারে, সেটি দেখে তারা যদি পুরো মানব জাতির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে সেটি হয়নি, সময়ের কোমল পরশে, বিভীষিকার স্মৃতি আনন্দের স্মৃতি দিয়ে ঢাকা পড়েছে, দুঃখের তীব্রতা কমে সহনসীমায় এসেছে, মানুষ নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যারা ১৯৭১ দেখেছে তারা যে শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থেকেছে তা নয়, তারা একই সাথে মানবতার এমন একটি রূপ দেখেছে, যেটি সারা জীবনে কখনোই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। এই দেশে যে মানুষগুলো সেই সময়টুকুর ভেতর দিয়ে এসেছে তাদের ভেতরে একটি মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দুঃসময়টি নিজের চোখে দেখেছে বলে তারা এখন যেকোনো পরিস্থিতিতে অবিচল থাকতে পারে, ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে, আশাবাদী হতে পারে। তাই আমি মনে করি, আমাদের প্রজন্ম হচ্ছে একটি অতি সৌভাগ্যবান প্রজন্ম।

প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর পরেও আমার ১৯৭১-এর বিজয় দিবসের কাছাকাছি দিনগুলোর কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ডিসেম্বরের শুরু থেকে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে আমরা সবাই বুঝতে শুরু করেছি যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পাল্টে গেছে, এটি শেষ হতে যাচ্ছে, তবে কত রক্তপাত হয়ে এটি শেষ হবে, সেটি কেউ তখনো জানে না। বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবিমানের ডগ ফাইট দেখা যায়। অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট গানের গুলির সুবিন্যস্ত আলোতে রাতের আকাশ আলোকিত, কর্কশ শব্দে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত। মিলিটারি কনভয় যাচ্ছে, সেখানে নিষ্ঠুর চেহারার পাকিস্তানি মিলিটারি পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। যারা ঢাকা শহরের প্রান্ত সীমানায় আছে তারা

দেখছে পিচ করা রাস্তায় দাগ কেটে কেটে ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে ট্যাংক যাচ্ছে। কামানের গর্জন, নিরবচ্ছিন্নভাবে শেলিং হচ্ছে। বিবিসিতে বলছে, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর শত শত যুদ্ধবিমান নিয়ে বঙ্গোপসাগর দিয়ে বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে। স্থানীয় রেডিও খুললেই শোনা যাচ্ছে পাকিস্তানি মিলিটারিকে আত্মসমর্পণ করার জন্য ক্রমাগত বলা হচ্ছে 'হাতিয়ার ঢাল দো'; মানে অস্ত্র সমর্পণ করো! আকাশ থেকে লিফলেট ফেলা হচ্ছে সেখানে আত্মসমর্পণের অবিরাম আহ্বান। আমরা টের পাচ্ছি যুদ্ধ মানে শুধু গোলাগুলি নয়, যুদ্ধ হচ্ছে একই সাথে প্রচণ্ড মানসিক চাপ! তখনো আমরা জানি না জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন আলবদর বাহিনীরা নিশ্চিত পরাজয়ের আভাস পেয়ে এই দেশের সোনার সন্তানদের একজন একজন করে ধরে নিয়ে হত্যা করতে শুরু করেছে।

ডিসেম্বর মাস, প্রচণ্ড শীত, যেখানে আশ্রয় নিয়েছি সেখানে বেশ কিছু অবোধ শিশু, তাদের নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা বাংকারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা, কী হবে, কেমন করে হবে–আমরা কিছুই জানি না। তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম তীক্ষ্ণ গলায় একজন গলা ফাটিয়ে কোথা থেকে জানি চিৎকার করে উঠল, জয় বাংলা!

এক মুহূর্তে সকল অনিশ্চয়তা কোথায় উড়ে গেল, সকল দুর্ভাবনা মুছে গেল। কেউ বলে দেয়নি; কিন্তু বুঝে গেলাম যে দিনটির জন্য এত দিন অপেক্ষা করে আছি, বনের পশুর মতো দেশের আনাচে-কানাচে ছুটে বেরিয়েছি সেই দিনের অবসান হয়েছে। যে দেশটির জন্য আমার কত আপনজন বুকের রক্ত দিয়েছে, সেই দেশটি আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে, কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রথম সেই খবরটি পাওয়ার পর আমাদের সবার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।

আমার এখনো বিশ্বাস হয় না, এই দেশে সেই জয় বাংলা স্লোগানটি কত দীর্ঘকাল নির্বাসিত ছিল।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল। সেই বিজয় দিবসটিতে আমরা সবাই নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেশটি শত্রুমুক্ত হলেও বঙ্গবন্ধু তখনো পাকিস্তানের কারাগারে, ১৯৭২ সালের জানুয়ারির ১০ তারিখ তিনি ফিরে এলেন, আমাদের কী আনন্দ! তিনি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কাজে হাত দিলেন। দেশে তখন লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়িহীন মানুষ, বাবা হারানো পরিবার, ছেলে হারানো মা, নির্যাতিতা মেয়ে, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র দেশের মানুষ। তাদের অনেকের ঘর নেই, বাড়ি নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই, মুখে দেওয়ার খাবার নেই। দেশে রাস্তাঘাট নেই, যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে বলে সেতু নেই। মিলিটারি ক্যাম্প করে ছিল বলে স্কুল নেই, কলেজ নেই বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে বলে; বই নেই-খাতা নেই, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তবু এই দেশের মানুষের বুকে বিশাল প্রত্যাশা। নিশ্চয়ই এই দেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে, যত শোষণ ছিল, বঞ্চনা ছিল সেগুলো দূর হবে। এই দেশে অন্যায় থাকবে না, অধর্ম থাকবে না। শুধু থাকবে সকল ধর্মের সকল বর্ণের সকল মানুষের জন্য বুকভরা ভালোবাসা।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সেই দেশ গড়ে তোলার সময় দেওয়া হলো না। সাড়ে তিন বছরের ভেতর আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ ভোরবেলায় পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম একটি হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো এই অভাগা দেশের মাটি, সেই মুহূর্তে আধুনিক বাংলাদেশটি পথ হারিয়ে আশাহীন-স্বপ্নহীন ধর্মান্ধতার অন্ধকার কানাগলিতে হারিয়ে গেল। যে যুদ্ধাপরাধীদের তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য জেলখানায় রাখা হয়েছিল তারা ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পিলপিল করে সেখান থেকে বের হয়ে এলো। এই দেশটি হয়ে গেল যুদ্ধাপরাধীদের অভয়ারণ্য।

তারপর অনেক কিছু হয়েছে, সেই ইতিহাস কালিমাময়। একসময় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবার তার সেই হারানো পথ খুঁজে পেয়েছে। এই দেশে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করে দেশকে গ্লানিমুক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশটিকে তার হারিয়ে যাওয়া আত্মসম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিশু-কিশোরেরা আবার বঙ্গবন্ধুর কথা জানতে পারছে, তারা আবার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অহংকার করতে শিখেছে। দেশটির অর্থনৈতিক সক্ষমতা লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, কার দুঃসাহস আছে এখন এই দেশটিকে তলাবিহীন বাস্কেট বলবে?

কিন্তু আমাদের ১৯৭১-এর স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে? আমরা সবাই জানি, সত্যিকারের স্বপ্ন হয় আকাশছোঁয়া। তাই সেই স্বপ্ন কখনোই পূরণ হওয়ার নয়, আমরা সারা জীবন শুধু সেই স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাই। কিন্তু যদি কখনো দেখি আমরা চোখে সেই স্বপ্ন নেই, তখন দুর্ভাবনা হয়।

আমাদের সামনে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ, প্রকৃতি নিয়ে চ্যালেঞ্জ, পরিবেশ নিয়ে চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা নিয়ে চ্যালেঞ্জ, স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চ্যালেঞ্জ; কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক দেশ তৈরির চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধুর আজীবন স্বপ্ন ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আমরা সেই বাংলাদেশ এখনো পাইনি। বাংলাদেশে এখনো আমাদের ধর্মান্ধ মৌলবাদীগোষ্ঠীর আস্ফালন শুনতে হয়।

মুজিববর্ষের এই বিজয় দিবসে আমাদের স্বপ্ন হোক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের একটি সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২০)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক।

২৬ মার্চ : বাঙালির স্বাধীনতা, বাঙালির বন্ধনমুক্তির দিন

অনুপম সেন

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কয়েকটি দিন অসীম ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান থাকবে বাঙালির প্রেরণার উৎস হয়ে। এই দিনগুলো হলো ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর। বাঙালির সর্বকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে ২৬ মার্চ বাঙালির স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা'ই পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

বাঙালি জাতিসত্তা কয়েক হাজার বছর ধরেই গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক, মঙ্গোলয়েড, ককেশীয় ইত্যাদি বর্ণের মিলনে। এই জাতিসত্তা এই উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বাঙালি জাতি হিসেবে একসময় পরিচিতি লাভ করে। তার জন্মভূমিও পরিচিতি পায় বঙ্গভূমি হিসেবে। এই বাঙালি জাতিসত্তারই মুখের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপের প্রাথমিক রূপ পেয়েছিল আজ থেকে হাজার বছর আগে বৌদ্ধ চর্যা ও দোঁহা পদে। এই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজা, বাদশাহ, সুলতান, নবাব কখনো স্বাধীন, কখনো পরাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন। সেই রাজত্বে সাধারণ বাঙালি সব সময় প্রজাই ছিল। কখনো স্বাধীন নাগরিক হয়নি। বাঙালি প্রথম স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে এই ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড় থেকে বন্ধনমুক্তি ঘটলেও বাঙালি দেখল তাকে আরো নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক শোষণে আবদ্ধ করা হয়েছে। এই উপলব্ধি সামান্য কিছু মানুষের তখনই এসেছিল, যখন তারা দেখল পাকিস্তানের ৫৫ শতাংশ জনগণ বাঙালি হলেও তার রাজধানী, কেন্দ্রীয় প্রশাসন, সব কিছুরই কেন্দ্রস্থল হলো পশ্চিম পাকিস্তান। আরো রূঢ় আঘাত হিসেবে তারা দেখল তাদের মুখের ভাষার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহের হোসেন, ড. এনামুল হক প্রমুখ বাঙালি অধ্যাপক ও পণ্ডিতরা; সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে। এই প্রতিবাদে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই সময়ের তরুণ ছাত্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রতিবাদটি উত্থিত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যখন 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় হরতাল ঘোষণা করে। তাঁরা প্রায় ৭০-৭৫ জন ছাত্র হরতালের দিন গ্রেপ্তার হন। যেহেতু সেই সময় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সংসদের অধিবেশন চলছিল, তাই প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এক ধরনের আপসের মাধ্যমে 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদের' শীর্ষনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সঙ্গীসহ কারাগার থেকে ১৫ মার্চ মুক্তি দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদদের রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন পূর্ণতা পায়।

বাঙালির এই রাজনৈতিক পরাধীনতা প্রবলভাবে মূর্ত হয় যখন ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও তা দুই মাসের বেশি স্থায়ী হলো না। ১৯৫৬ সালে দীর্ঘ ৯ বছর পরে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু এই সংবিধানের ভিত্তিতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিন সপ্তাহ পরে তাঁর কাছ থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান। এই সামরিক শাসনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পরিকল্পিত শাসন ও শোষণ আরো নিষ্ঠুর রূপ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব নেতা কারারুদ্ধ হন; এর মধ্যে প্রথমেই গ্রেফতার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আইয়ুব খানের শাসনের ব্যাপ্তি ছিল দীর্ঘ এক দশকের বেশি (১৯৫৮-১৯৬৯ সালের মার্চ)। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ (কতিপয় সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ব্যতিরেকে) পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক শাসন ও আমলাতন্ত্র আরোপিত এই ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই সংগঠিত হতে শুরু করেছিল; ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠন করা হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণই দুঃসহ হয়নি, অর্থনৈতিক শোষণও চরম রূপ নিয়েছিল। পাকিস্তানের বার্ষিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬০ ভাগ, কোনো কোনো বছর প্রায় ৭০ ভাগ আয় করেছে পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু এই আয়ের ফলভোগী হয়নি বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান। তা পাচার হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক গড় আমদানি পাকিস্তানের গড় আমদানির ৩০ শতাংশে সীমিত থাকত। এই দুই দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যে যে বিপুল ঘাটতি হতো, তা পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দিয়েই মেটানো হতো। পূর্ব পাকিস্তানের এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে বিপুলভাবে শিল্পসমৃদ্ধ করা হয়েছিল; বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রাস্তাঘাট বিনির্মাণের মাধ্যমে তার ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়।

স্মর্তব্য, ১৯৪৯-৫০ সালে যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, যা ১৯৬৯-৭০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ২২৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৩১৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায়। মাথাপিছু উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২১ টাকা এবং ৫৪৬ টাকায়। বর্তমান মুদ্রার মূল্যমানে এই অর্থ সামান্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বিরাট। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের আয় ও সম্পদ নানাভাবে, নানাপথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করার মাধ্যমে। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগেও ছিল বিশাল বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রাক-পরিকল্পনা ও তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বে, অর্থাৎ ১৯৫০-৭০–এই ২০ বছরে পাকিস্তানে সরকারি-বেসরকারি খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৪৩৪০ কোটি টাকা, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১১৫৩৪ কোটি টাকা।

পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ওপর আরোপিত বঞ্চনা আরো স্পষ্ট হয়, যখন আমরা দেখি, পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রথম ২৩ বছরে যে বিশাল প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা হয়, সেখানে বাঙালির বা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অবস্থান বা অস্তিত্ব ছিল অতি নগণ্য। পাকিস্তানের সব বাহিনীরই হেডকোয়ার্টার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীতে জেনারেল, লে. জেনারেল, মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল, লে. কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি অফিসারদের প্রায় ৯৫ শতাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। বাঙালি অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মাত্র একজন ব্রিগেডিয়ার, একজন কর্নেল, একজন লে. কর্নেল, সামান্য কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেন। একইভাবে বৈষম্যদুষ্ট ছিল নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীও। কেবলমাত্র সামরিক আমলাতন্ত্রই নয়, কেন্দ্রীয় বেসামরিক আমলাতন্ত্রও ছিল সম্পূর্ণভাবে বৈষম্যদুষ্ট।

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর এই অমানবিক ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। এই ৬ দফায় দুটি রাষ্ট্রের অবয়ব পরিস্ফুট হয়েছিল, দুটি পৃথক অর্থনীতির রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দুটি পৃথক হিসেবের, যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার বন্ধ করা যায়। প্রাদেশিক সরকারগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও দেওয়া হয়। ব্যবস্থা রাখা হয় প্রাদেশিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের। কেন্দ্রের শাসন সীমাবদ্ধ করা হয় দেশরক্ষায় ও বৈদেশিক নীতিতে।

যেহেতু ৬ দফার মধ্যে, আগেই উল্লেখ করেছি, দুটি রাষ্ট্রের অবয়ব মূর্ত করা হয়েছিল তাই কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারা তা মেনে নেয়ওনি। ৬ দফা দাবি উত্থাপনের পর আইয়ুব খান বলেছিলেন, শেখ মুজিব যদি যুক্তির ভাষা না বোঝেন, অর্থাৎ ৬ দফা প্রত্যাহার না করেন তাহলে তাঁকে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করেই বোঝানো হবে।

বঙ্গবন্ধু যেহেতু বাঙালির বন্ধনমুক্তির অধিকার কোনো পর্যায়েই বিসর্জন দিতে রাজি হননি, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পদের বিনিময়েও নয়, সেই কারণে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও রাজনীতিবিদরা সামরিক অস্ত্রের ভাষাই প্রয়োগ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে। ৯ মাস নিঃশেষে প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার বেদিমূলে ৩০ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করে বাঙালি এক মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে তার হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম 'প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র', যেই রাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো ঘোষণা করা হয় 'রাষ্ট্রের মালিক জনগণ'। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সাংবিধানিক এই ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিকে তার হাজার বছরের ইতিহাসে তার প্রথম প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অভিষিক্ত করেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন পাকিস্তানের কারান্তরাল থেকে। কিন্তু যে দেশ তিনি পেলেন, সে দেশ ছিল সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত ও রিক্ত। ঔপনিবেশিক বন্ধনমুক্ত দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার

জন্য বঙ্গবন্ধু অনেক ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে দুটি উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথমত, ১০ মাসের মধ্যে দেশকে সুদৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করানোর জন্য একটি অসাধারণ সংবিধান প্রণয়ন। দ্বিতীয়ত, দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য অবিলম্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। ভুললে চলবে না, বঙ্গবন্ধু ঔপনিবেশিক শোষণরিক্ত যে বাংলাদেশ পেয়েছিলেন তার ৬০ শতাংশ জনগণ ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। উপরন্তু দেশের কোনো শিল্পভিত্তি ছিল না, কেবলমাত্র পাটশিল্প ছাড়া। এ ছাড়া দেশের প্রধান জীবিকা কৃষি হলেও সেই কৃষিকে এমনভাবে অবহেলা করা হয়েছিল যে, পঞ্চাশের দশকের শেষে দেশের বার্ষিক খাদ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন। বঙ্গবন্ধু তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষিকে, যাতে দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করা যায়। এর পরেই গুরুত্ব দিলেন শিল্প উৎপাদনকে, গুরুত্ব দিলেন শিক্ষাকে। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল তা তাঁর শাসনামল সমাপ্তির সাত বছর পরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধুর আরম্ভ করা বিশাল অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ আজও যেকোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিস্মিত করবে। এমনকি তিনি ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করার পথেও এগিয়েছিলেন, ছিটমহল বিনিময় চুক্তি ও সীমান্ত চুক্তি করেছিলেন। তাঁর শাসনামল বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়, বাঙালির আজ যে উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা তার ভিত্তিভূমি তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন, যদিও সে সময়ের বিশ্ব ছিল অর্থনৈতিকভাবে এক বৈরী বিশ্ব। স্মর্তব্য, এই সময়ে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে জ্বালানি তেলের দাম হয়েছিল গগণচুম্বী। এত সব বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের আলোক রেখাটি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের মধ্যভাগেই। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। '৭৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই তাঁর উদ্যোগের ফলে কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছিল; কিন্তু তার আগেই পরাজিত পাকিস্তানি শত্রুর এজেন্টরা এক বিশাল চক্রান্তের মাধ্যমে তাঁকে সপরিবার নিহত করে দেশকে আবার কয়েক দশক পিছিয়ে নেয় সবক্ষেত্রে।

প্রায় দীর্ঘ আড়াই দশক পরে তাঁর কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসীন হয়ে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে, সর্বজনের আহার ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করতে, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ করতে যে প্রচেষ্টা শুরু করেছেন, তা গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অসাধারণ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই বঙ্গবন্ধু ১০ লক্ষ জনতার সামনে ৭ মার্চের ভাষণে, বিশ্ব ইতিহাসের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ভাষণের শেষ বাক্যে ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০)

লেখক : বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

বিজয় দিবস

আনিসুজ্জামান

১৬ই ডিসেম্বর সেই রক্তে রাঙানো দিন, যেদিন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিজয়ের মহানন্দ সেদিন আমরা পুরোপুরি আস্বাদন করতে পারিনি দুই কারণে–নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার এ দেশীয় দোসরদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, বিশেষত বুদ্ধিজীবী হত্যা, দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বন্দিত্ব। এক মাসের মধ্যেই অবশ্য বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমিতে–শহিদেরা ফিরে আসেননি।

বড়ো মূল্য না দিয়ে বড়ো কিছু অর্জন করা যায় না–এ কথা আমরা বহুবার শুনেছি। ২৫ শে মার্চের কালরাতে যখন নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বরতম আক্রমণ শুরু হলো, তখনই আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। ১৯৭১-এর দিনগুলি স্মরণ করুন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে বলে সন্তানের যাত্রাপথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন জননী। নিজের জীবন বিপন্ন করেও সহযোদ্ধার লাশ নিরাপদ স্থানে টেনে এনেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। প্রাণ গেছে, সম্ভ্রম গেছে, সম্পদ গেছে–তবু সংকল্পে অটল ছিল এ দেশের মানুষ। তাই অপরিচিতজনকে ভাই বলে ঠাঁই দিয়েছে ঘরে। যথাসাধ্য করেছে তার স্বপ্নের দেশকে বাস্তবের ঘেরাটোপের মধ্যে পেতে।

বাঙালির এই সংকল্প এবং সংগ্রাম সেদিন সারা পৃথিবীর মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। যেসব দেশের সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল কিংবা বজায় রেখেছিল অনৈতিক নিরপেক্ষতা, সেসব দেশের জনসাধারণও এগিয়ে এসেছিল এই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে। প্রবাসী বাঙালিদের প্রচারাভিযান, বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যস্বীকার–এ সব কিছুই ছিল তার মূলে।

প্রায় এক কোটি লোক শরণার্থী হয়েছিল ভারতে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। সেখানে ঘাঁটি গেড়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। সেখানে গড়ে উঠেছিল ভারত ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড, সেখান থেকেই পাওয়া গিয়েছিল আমাদের রাষ্ট্রের প্রথম স্বীকৃতি। আর এ সব কিছুই সম্ভবপর হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে।

মুক্তিযুদ্ধকে যাঁরা ১৯৭১ সালের ৯ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখেন, তাঁরা একদেশদর্শিতার পরিচয় দেন। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস থেকে যুদ্ধদিনের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের ধীরে ধীরে নিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশস্বরূপই তাই ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রামকে দেখতে হবে।

১৯৭১ থেকে আজ আমরা চলে এসেছি ৩৮ বছর দূরে। তাই বলে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছে বিগত দিনের ইতিহাসমাত্র নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের মধ্যে নিত্যপ্রবহমান–শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও। পরবর্তীকালে যেসব বিকার আমাদের পদে পদে বিড়ম্বিত করেছে, আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের ১৯৭১-এর কাছেই যেতে হবে।

কিন্তু এর একটা অন্যদিকও আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন আছে, তেমনি আছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি। অন্তরে চেতনা ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। সেদিনকার নতুন জাতিগঠনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পুরোপুরি সফল হবে না। ১৬ই ডিসেম্বরে আমরা শত্রুমুক্ত স্বদেশ পেয়েছি, কিন্তু এই ৩৮ বছরেও আমরা নিজেদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে বাস্তবলোকে পাইনি।

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের সেই ডাক দিচ্ছে। শহিদেরা, মুক্তিযোদ্ধারা যা করবার, তা করেছেন। তাঁরা এই বিজয় দিবস আমাদের উপহার দিয়েছেন। এখন বাকি কাজ আমাদের করতে হবে। যে চরম আত্মত্যাগ মানুষ করেছে ১৯৭১ সালে, তার মর্যাদা রাখতে হবে অসাম্প্রদায়িক, ন্যায়পরায়ণ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলে।

১৯৭১ সালের পরে ন্যায় ও আদর্শের জন্য আর আত্মাহুতি দেওয়ার কথা ছিল না মানুষের। অবস্থাবৈকল্যে মানুষ তাও দিয়েছে। তারা আত্মাহুতি দিয়েছে সুখী, সমৃদ্ধ, প্রাগসর বাংলাদেশের জন্য। তাদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, যেমন অপরিশোধ্য ঋণ মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের কাছে কিংবা তারও আগের ভাষা আন্দোলন কিংবা গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের কাছে। তাঁদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না–এ কথা আমরা বহুবার বলেছি। কবে আমরা বলতে পারব, তাঁদের রক্ত বৃথা যায়নি। ১৬ই ডিসেম্বরে একবার সত্যিই সে কথা বলতে পেরেছিলাম। এখন কাজ করে, দেশ গড়ে, দারিদ্র্য-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য দূর করে বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০৯)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস ও একজন শাহেদ আলী কসাই

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক)

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কাল্পনিক সাহিত্য রচিত হয়েছে; কিন্তু সঠিক ইতিহাস কম লেখা হয়েছে। অনেক অজানা ও অচেনা বীরদের যুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যাঁরা অত্যাচারিত জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে দেশমাতৃকার ডাকে উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টায় আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের কথা সময়ের পাটাতনে হারিয়ে গেছে। তাঁদের বীরত্বগাথা ও আত্মত্যাগ নিয়ে গবেষণার পরিধি এখনো সীমিত। তাঁরা নিজেরা জ্বলে আলোকিত করলেন ভবিষ্যৎকে এবং সেই আলোকেই জন্ম হলো স্বাধীন বাংলাদেশের। অস্তিত্বের লড়াইয়ে এই মানুষজন অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সভ্যতার দীপ্ত দুপুরে মধ্যযুগীয় অন্ধকার এই দেশটাকে গ্রাস করেছিল। সেদিন যাঁরা জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শাহেদ আলী কসাই।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস আন্দোলন ও সংগ্রামের মাস, দেশের বিভিন্ন এলাকায় নানা প্রকার ঘটনাপ্রবাহের মাস। এই মাসে রংপুরে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার অনেক ঘটনা কিংবদন্তি হয়ে আজও এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এই এলাকার অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষ যাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ১৯৭১ সালে, তাঁদের মধ্যে শাহেদ আলী কসাই অন্যতম। তাঁর বীরত্ব ও তাঁর পরিবারের করুণ পরিণতির কথা জাতির শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরপরই রংপুর অঞ্চলে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এই কমিটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

শাহেদ আলী ছিলেন রংপুর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত সম্মানীপুর গ্রামের খিজির উদ্দিনের জ্যেষ্ঠ সন্তান। গ্রামটি রংপুর সেনানিবাস থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান শাহেদ আলী স্থানীয় বড়োবাড়ী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে রংপুর শহরের মুনশিপাড়ায় কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন; কিন্তু পিতার অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। তাই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর তিনি কর্মজীবন শুরু করতে সচেষ্ট হন। নানা জায়গায় কাজের চেষ্টা করেও কোনো কাজ না পেয়ে পেটের দায়ে তিনি কসাইয়ের কাজ বেছে নেন। তিনি লালবাগহাটের একটি মাংসের দোকানে কসাইয়ের কাজ শুরু করেন।

শাহেদ আলী ছিলেন গ্রামের সবার প্রিয়পাত্র। গ্রামের যেকোনো মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে যেতেন তিনি। উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী শাহেদ আলী তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড মমত্ববোধ।

১৯৭১ সালে দেশের পরিস্থিতি শাহেদ আলীকে ভাবিয়ে তোলে। শাহেদ আলী তাঁর স্ত্রীদের বলতেন যে এই পাঞ্জাবিরা এ দেশে থাকলে বাঙালিদের ওপর পাঞ্জাবিরা অনেক বিপদ ডেকে আনবে। তারা আমাদের মানুষের মতো বাঁচতে দেবে না। তাঁর স্ত্রী আশরাফুন্নেসা ও কমলা সুন্দরী শাহেদ আলীর এসব কথা শুনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। যেহেতু তাঁদের গ্রামটি সেনানিবাসের কাছেই ছিল তাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র আর ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁদের কিছুটা ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে এই সেনাবাহিনী অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁরা শাহেদ আলীকে বলতেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে তারা গ্রামের সবাইকে হত্যা করবে। শাহেদ আলীকে সব সময় সাবধানে থাকতে বলতেন তাঁরা।

মার্চ মাসের প্রথম থেকেই যখন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলছিল এবং সেনানিবাসের ঠিকাদারদের সহযোগিতায় রংপুর সেনানিবাসে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যরা রংপুর সেনানিবাস থেকে আশপাশের গ্রামে গিয়ে জোরপূর্বক মানুষের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ও খেতের শাকসবজি ছিনিয়ে নিয়ে আসত। গ্রামবাসী পাকিস্তানি সৈন্যদের এই দুষ্কর্মে বাধা দিলে তাদের ওপর চালানো হতো অমানুষিক অত্যাচার।

গ্রামবাসীকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে শাহেদ আলী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ৭ মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ পরদিন ৮ মার্চ সকালে শাহেদ আলী গ্রামের বাজারে গিয়ে শোনেন। সেদিন থেকেই তিনি গ্রামের মানুষকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও বলপূর্বক খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেন এবং প্রস্তুত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাদের আরো বলেন যে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছেন যার যা আছে তা নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। তিনি তাঁর গরু জবাই করার বড়ো ছোরাটা দেখিয়ে বলতেন আমার এই ছোরা নিয়ে আমি প্রস্তুত, আপনারাও যার যা আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে গ্রামবাসী সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কোনো প্রকার খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করবে না এবং পূর্বের মতো বলপূর্বক খাদ্যসামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করবে।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ সকাল ১০টার দিকে রংপুর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবি অফিসার লে. আব্বাস কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে টহলে বের হয়। সম্মানীপুর গ্রামের হাজি জসিম উদ্দিন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে করতে গ্রামের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে থাকেন যে সেনানিবাস থেকে একদল মিলিটারি তাঁদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের উদ্দেশ্য বলপূর্বক গ্রাম থেকে খাদ্যসামগ্রী লুট করা। লে. আব্বাস ছিল ২৯ ক্যাভালরি রেজিমেন্টের

একজন অফিসার। ইতিপূর্বেও সে সেনানিবাসের আশপাশের গ্রাম থেকে বলপূর্বক খাদ্যসামগ্রী ছিনিয়ে আনত। খাদ্যসামগ্রী লুট করার এই ঘটনা তার জন্য নতুন ছিল না। লে. আব্বাস একটি জিপে করে সেনানিবাসের পশ্চিম গেট দিয়ে সম্মানীপুর ও দমোদরপুর গ্রামের দিকে রওনা দেয়। তার সঙ্গে ছিল একজন ড্রাইভার ও চারজন সশস্ত্র সৈন্য। গ্রামের দিকে তার এগিয়ে যাওয়ার খবরটি আশপাশের গ্রাম সম্মানীপুর, দমোদরপুর, বড়বাড়ী ও মনোহরপুরে ছড়িয়ে পড়ে।

হাজি জসিম উদ্দিনের কাছ থেকে খবর পেয়ে শাহেদ আলী তাঁর ছোরাটা নিয়ে দৌড়ে গ্রামবাসীকে একত্রিত করতে থাকেন। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন যে, আর অত্যাচার সহ্য করা হবে না। আমরা আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে দেব না। আশরাফুন্নেসা অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পেরে শাহেদ আলীকে যেতে বাধা দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে গ্রামের যে রাস্তাটি রংপুর সেনানিবাসের দিকে গেছে সেদিকে চলে যান শাহেদ আলী। পথে তিনি চিৎকার করে সবাইকে যার যা আছে তা নিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে অনুরোধ করতে থাকেন। খুব কম সময়ের মধ্যে সম্মানীপুর ও লাগোয়া দমোদরপুর গ্রামের শত শত মানুষ দা, খুন্তি, বল্লম, কোদাল, কুড়াল, লাঠিসোঁটা ইত্যাদি যার যা আছে তা নিয়ে প্রস্তুত হন পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিহত করার জন্য। শাহেদ আলীর সঙ্গে গ্রামের কয়েকজন তরুণ আবদুর রহিম, বাবুল, রফিক, হায়দার, জসিম ও গুলজার হাতে শাবল, লাঠিসোঁটা, কুড়াল, দা, বর্শা; অর্থাৎ যে যা সামনে পেয়েছেন তা নিয়েই দৌড়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে রওনা দেন।

তাঁরা দেখতে পান যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জিপটি দমোদরপুর গ্রামের দিকে ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে। কারণ রাস্তাটি ছিল কাঁচা ও বেশ ভাঙা। দমোদরপুর গ্রামে ঢোকার পথেই ছিল আবদুল হাকিমের বাড়ি। সেই বাড়ির পশ্চিম পাশে রংপুর সেনানিবাসে যাওয়ার রাস্তা। রাস্তার পাশে ছিল কিছু উঁচু জমি, যা ঝোপঝাড়ে পূর্ণ ছিল। সেই ঝোপের আড়ালে শাহেদ আলী, আবদুর রহিম এবং আরো প্রায় ১০ জন যুবক হাতে ছুরি, মাছ ধরার বর্শা, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন যেন পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁদের দেখতে না পায়। তাঁরা আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকেন পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য। শাহেদ আলী যুবকদের নির্দেশ দেন যে, প্রথমে তিনি সামনে উপবিষ্ট অফিসারকে আক্রমণ করবেন এবং তারপরই বাকিরা পেছনের সৈন্যদের আক্রমণ করবেন। আক্রমণ অতি দ্রুত করতে হবে যেন সৈন্যরা রাইফেল দিয়ে গুলি করার সুযোগ না পায়। সৈন্যসহ গাড়িটি ঢিবির কাছে পৌঁছাতেই শাহেদ আলী উঁচু ঝোপ থেকে বেরিয়ে দ্রুত জিপের বনেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মুহূর্তেই লে. আব্বাসকে ছোরা দিয়ে আঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য যুবকরা গাড়ির পেছন দিকে বসা সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই শাহেদ আলী ও যুবকরা সৈন্যদের হাত থেকে অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নেন। এই আকস্মিক আক্রমণে সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারপর তাঁরা পাকিস্তানি

সৈন্যদের আঘাত করতে থাকেন। সাথে সাথে সম্মানীপুর ও দমোদরপুর গ্রামের শত শত মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়। গ্রামবাসীর আক্রমণে লে. আব্বাস ও অন্য সৈন্যরা তখন মৃতপ্রায়। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী মনোহরপুর গ্রামের সৈনিক নুরুল ইসলাম যিনি ছুটিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন সেখানে উপস্থিত হন। অভিজ্ঞ নুরুল ইসলাম শাহেদ আলী ও গ্রামবাসীকে বলেন, যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনী দমোদরপুর ও সম্মানীপুর গ্রামের কাছে তাদের সৈন্যদের এমন অবস্থায় দেখতে পায় তাহলে তারা এই এলাকায় গণহত্যা চালাবে এবং গ্রামগুলোকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। তিনি গ্রামবাসীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জিপ ও আহত সৈন্যদের দূরে কোনো ফাঁকা জায়গায় ফেলে আসতে অনুরোধ করেন। গ্রামবাসীর অনুরোধে সৈনিক নুরুল ইসলাম আহতদের নিয়ে নিজে জিপ চালিয়ে দমোদরপুর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে ডাঙিরপাড় নামক স্থানের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় জিপটিসহ আহতদের ফেলে দিয়ে আসেন। মুক্তিযুদ্ধে শাহেদ আলীই হয়তো ছিলেন প্রথম গেরিলা যোদ্ধা ও নেতা, তাঁর সহযোদ্ধারা ছিলেন আদর্শ গেরিলা, যাঁরা কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়াই পাঁচজন শত্রু সৈন্যকে নিধন করতে সক্ষম হন।

লে. আব্বাসের ফেরত আসতে দেরি দেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি উদ্ধারকারী দল চারদিকে খুঁজতে থাকে এবং সন্ধ্যার পর তাদেরকে ডাঙিরপাড় থেকে শোচনীয় অবস্থায় উদ্ধার করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিল লে. আব্বাস। দলটি তাকে ও অন্য সৈন্যদের মুমূর্ষু অবস্থায় সেনানিবাসে নিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণেশপুর এলাকাকে ঘটনাস্থল মনে করে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে পরদিন গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়। তারপর তারা সেনানিবাসের পশ্চিম দিকের আদর্শ গ্রামটিও জ্বালিয়ে দেয়। এই গ্রামগুলো নির্বিচারে জ্বালিয়ে দেওয়ার পর সেনানিবাসের আশপাশের মানুষের প্রতিবাদ আরো বাড়তে থাকে।

সৈন্যদের ওপর গ্রামবাসীর আক্রমণের পর রংপুর সেনানিবাসে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি অফিসার সেনানিবাসের আশপাশের গ্রামে আক্রমণ করে ধূলিস্যাৎ করার মত পোষণ করে। কিন্তু অধিনায়কগণ তাদের আপাতত শান্ত থাকার জন্য বলে এবং ভবিষ্যতে এর প্রতিকার হবে বলে আশ্বাস দেয়। ২৪ মার্চ রাতে সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লে. আব্বাসের মৃত্যু হয়। এই খবরে সেনানিবাসে আরো উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং থমথমে ভাব বিরাজ করে। জানা যায়, ব্রিগেড সদর দপ্তরে দমোদরপুর ও আশপাশের গ্রামগুলো আক্রমণের একটা পরিকল্পনা করা হয়।

লে. আব্বাসকে আক্রমণকারী শাহেদ আলী এই ঘটনার পর তাঁর গ্রাম ত্যাগ করে কর্মস্থল লালবাগহাটে অবস্থান নেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, যেহেতু লালবাগহাট তাঁর গ্রাম থেকে বেশ দূরে তাই পাকিস্তান সেনাবাহিনী হয়তো সেখান থেকে তাঁকে ধরতে পারবে না। ২৫ মার্চের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী লে. আব্বাসের মৃত্যুর জন্য

দায়ী ব্যক্তিদের খোঁজ করতে শুরু করে। সম্মানীপুর গ্রামে আমজাদ নামের একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল, সে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চর হিসেবে কাজ করত। বেঁটে প্রকৃতির ছিল বলে এলাকার লোকেরা তাকে গাটিয়া আমজাদ বলে ডাকত। গাটিয়া আমজাদ পাকিস্তানি সৈন্যদের খবর দেয় যে শাহেদ আলী লালবাগহাটে আছে। গাটিয়া আমজাদ পাকিস্তানি সৈন্যদের গোপনে লালবাগহাটে নিয়ে যায় এবং শাহেদ আলীকে শনাক্ত করে। শাহেদ আলী তখন হাটে কসাইয়ের দোকানে ছিলেন। দুজন পাকিস্তানি সৈন্য হঠাৎ পেছন থেকে এসে শাহেদ আলীকে জাপটে ধরে। শক্তিশালী শাহেদ আলী মুহূর্তেই তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন; কিন্তু আরেকজন সৈনিক তাঁর মাথায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে ও অন্য একজন বেয়নেট দিয়ে তাঁর বাঁ চোখে আঘাত করে, এতে তাঁর চোখ বেরিয়ে আসে। পাকিস্তানি সৈন্যরা গুরুতর আহত শাহেদ আলীকে বেঁধে জিপের পেছনে উঠিয়ে তাঁকে মারতে মারতে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে শাহেদ আলীর পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনা জানতে পেরে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরদিন লালবাগহাট থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে লাহিড়ীর হাটের কাছে একটি কর্দমাক্ত স্থানে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর শরীরে ছিল বেশ কয়েকটি গুলি ও নির্যাতনের চিহ্ন। তাঁর চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল এবং মাথায় আঘাতের ফলে মগজ বের হয়ে গিয়েছিল। শাহেদ আলীর আত্মীয়-স্বজনরা পরে তাঁর মৃতদেহ সম্মানীপুর গ্রামে এনে তাঁর বাড়ির পেছনে কবর দেন।

দুই দিন পরে কিছু পাকিস্তানি সৈন্য তাদের এ দেশীয় সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে সম্মানীপুর গ্রামে উপস্থিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগীরা তাদেরকে শাহেদ আলীর বাড়ি চিনিয়ে দেয়। তারপরই শুরু হয় শাহেদ আলীর পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন। তারা শাহেদ আলীর প্রথম স্ত্রী আশরাফুন্নেসাকে মাথায় আঘাত করে, কিন্তু গ্রামবাসীর সহযোগিতায় তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় স্ত্রী কমলা সুন্দরীকে পাকিস্তানি সৈন্যরা চরম নির্যাতন করে। সেই নির্যাতনের করুণ চিত্র আজও সেই গ্রামের মানুষের মনে গাঁথা আছে। এই ঘটনার পর আশরাফুন্নেসা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন এবং নির্যাতনের পর কমলা সুন্দরী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাহেদ আলী ও তাঁর পরিবার কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁরা স্বাধীনতার পূর্বাভাস পেয়েছিলেন; কিন্তু স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। তাঁদের ছিল কল্পনাশক্তি ও প্রেরণাশক্তি। তাঁদের হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত; কিন্তু তাঁরা তাঁদের জীবনটাকে দিয়ে গেছেন সৃষ্টি ও মুক্তির জন্য। মমত্বই তাঁদের শ্রেষ্ঠ পাওনা। তাঁদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি বরং ফুলে ও ফসলে সহস্রধারায় বিকশিত হয়ে পল্লবিত হয়েছে। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৮)

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত।

২৬ শে মার্চ শুধু স্বাধীনতা দিবস নয়...

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

২৬ শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালে এই দিনে কোনো ঘোষণা না দিলেও আমরা স্বাধীন সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হতাম। এ কথার যথার্থতা খুঁজতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তব্যের কিয়দাংশে আবার ফিরে যেতে হয়। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আর যদি একটি গুলি চলে... আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল– প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে, তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি... মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব–ইনশাল্লাহ; এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এসব বিশ্লেষণ করেই বিদেশিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন। অবশ্য বাঙালিরা বুঝে নিয়েছিল এটাই স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সেভাবে তারা বুঝেশুনে কাজ করেছে। কার্যত ২৬ শে মার্চে ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না; সেদিন আদৌ ঘোষণা দিতে পারবেন বলে বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত ছিলেন না। ৭ই মার্চে তাঁর একটি উক্তিতে, অর্থাৎ 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি'তে এই আশঙ্কাটা প্রকাশিত হয়েছিল। স্মরণীয় যে তিনি বলেছিলেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে...'। ২৫ শে মার্চ রাতে একটি গুলি নয়, হাজার হাজার গুলিবর্ষণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিরা ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যার সূচনা করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি জাতিসত্তাকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করা। এই প্রেক্ষাপটে যার আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করার কথা ছিল তিনি (বঙ্গবন্ধু) তা ঘোষণা করলেন এবং বিশ্ববিবেক সেটাকে স্বীকৃতি দিল। কিন্তু আমরা এখনো এই সম্পর্কিত বিতর্ক থেকে মুক্ত হতে পারলাম না।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর এই বিতর্ক শুরু হয়ে মৃদুলয়ে প্রসারিত হয়েছে এবং বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামলে তা তীব্র গতি পেয়েছে। অবশ্য খালেদা জিয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষগণ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেছেন, –মোশতাক, সায়েম, জিয়াউর রহমান কিংবা এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাবস্থায় তাঁদের ভাষায় 'বহুদলীয়' গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তির বাক ও সংবাদপত্রের 'স্বাধীনতা' সত্ত্বেও এই বিতর্ককে তেমন উসকে দেওয়া হয়নি। এই বিতর্কে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সুশীলসমাজের একাংশকে আমরা হারজিতের প্রতিযোগিতায় দেখেছি, তাঁদের পাল্লা এদিক-সেদিক হলেও বিদেশি গণমাধ্যম, এমনকি সর্বশেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবমুক্ত গোপন দলিলেও দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুই ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। ৯ মাসের মতো দীর্ঘ পথপরিভ্রমণের পর

২০০৮ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর আরেকটি বিজয় অর্জিত হলো, তবে তা ১৬ই ডিসেম্বর হলে ইতিহাস যে পুনরাবৃত্তি ঘটায়, তা নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হতো।

আবারও মুক্তির সংগ্রাম চলছে যার চূড়ান্ত লক্ষ্য আগের মতোই, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। নেতৃত্ব ও চালকের আসনে শেখ হাসিনা। তবে সফলতার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে, অহেতুক বিতর্কের কবর দিয়ে দৃপ্তপায়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এটা সম্ভব না হলে জনগণের অর্থনৈতিক ও যেকোনো মুক্তি অনার্জিতই শুধু থেকে যাবে না, আমাদের অস্তিত্ব চরম সংকটে পড়বে।

এসব বিতর্কের অবসান বাঞ্ছনীয় হলেও আমাদের হারজিতের খেলাটা প্রলম্বিত হয়ে তা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। বিচার বিভাগ এখন স্বাধীন। অতএব সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর আমরা কোনো হারজিত নয় বরং জিত-জিত অবস্থানে চলে এসেছি। স্বাধীনতার ঘোষণাসহ অপরাপর মীমাংসিত ইস্যুগুলোকে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পুররায় দেওয়া গেলে গরিব- দুঃখী মানুষের অভাব-অভিযোগ, প্রত্যাশা অহেতুক বিতর্করূপী পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে যাবে না; তাদের মুখে হাসি ফোটাবার প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হবে।

আবারও বলছি, ২৬ শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমরা স্বাধীন হলাম তাই সেদিনটি আমাদের স্বাধীনতা দিবস–বিশ্বের স্বীকৃতিও সেদিনকে ধরে পাওয়া গেছে। সেদিন থেকে আমাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম মাটিতে পাকিস্তানি হানাদাররা জেঁকে রইল বলেই তাদের উৎখাতের জন্য আমাদের ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হলো। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমরা মুক্তির প্রথম সোপান অতিক্রম করে বিজয় লাভ করলাম। তাই ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস এবং তা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। আমাদের ৯ মাসের যুদ্ধটা যদি স্বাধীনতাযুদ্ধ হতো, তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত অর্জনটা হতো স্বাধীনতা এবং ১৬ই ডিসেম্বর হতো স্বাধীনতা দিবস। এই বিতর্কের অবসানও কাম্য।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর মুক্তিযুদ্ধের আরেক পর্ব শুরু হলো। এই পর্ব নিয়ন্ত্রণ, যে পর্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াই। এই পর্বে সমধিক গুরুত্ব অবসানে লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলার রূপায়ণ। তার জন্য কৌশল হিসেবে প্রথমে নেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির শাসন থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ, কিন্তু ত্বরিত, দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত অগ্রযাত্রার জন্য নেওয়া হয় সংসদীয় থেকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পুনঃপ্রবর্তন। এ ব্যবস্থা কার্যকর করার আগেই দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীগণ তাদের নিজেদের স্বার্থেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। তারপর থেকেই ইতিহাসের চাকাকে ঘোরাতে, অর্থাৎ পাকিস্তানীকরণ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে আজ বাংলাদেশে ভিক্ষুক দুষ্প্রাপ্য হয়ে যেত। গণমানুষের নেতার সে স্বপ্ন অপূর্ণ থাকলেও তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা পিতার স্বপ্নের

বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিবেদিত। তাঁর একটি দর্শন হচ্ছে দিনবদলের দর্শন এবং রূপকল্প ২০২১-এর মাঝে দেখছেন একটি মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ। তা অর্জনের অন্যতম কৌশল হচ্ছে শিক্ষা, অর্থব্যবস্থাসহ সকল ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, দক্ষতা আনয়ন এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটন। সেসব অর্জনের কৌশল হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। এটা বাস্তবায়ন করা গেলে ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন সার্থক হবে এবং বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পা রাখবে। তাতেও ক্ষুধা-দারিদ্র্য সম্পূর্ণ নির্মূল হবে না এবং এতে এক বিশাল অর্জন নিশ্চিত হবে। আবারও বলছি, অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অহেতুক বিতর্কের কবর দান। এবারের ২৬ শে মার্চকে মাইলস্টোন ধরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই ২৬ শে মার্চ শুধু আনুষ্ঠানিকতার দিন নয়, আত্মজিজ্ঞাসার দিন। মিথ্যাচারিতা, হীনম্মন্যতা ও পরশ্রীকাতরতা দিয়ে বিভেদ ও অনৈক্য জিইয়ে রেখে আর কতকাল বুভুক্ষ, নিরন্ন, শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান বঞ্চিত মানুষকে অবদমিত রাখা হবে, এই কথাটি এবারের ২৬ শে মার্চে পুনঃজিজ্ঞাসিত হলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত মুক্তির সৈকতটি দৃশ্যপটে প্রতিভাত হবে। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১০)

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদ।

সীমাহীন মূল্যে কেনা স্বাধীনতার বিজয়ঃ জানতে হবে, জানাতেও হবে নিরন্তর

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস পৃথিবীর আর সব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ এবং জাতিসমূহ থেকে নানা বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে আবশ্যকীয় পাঠ্য। এটি একটি রক্তাক্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা। এর শুরুর ইতিহাস দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি পরাধীনতার আমলকেও ছাড়িয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অন্তত ১০০ বছরের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। তবে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার রক্তাক্ত অধ্যায় আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের রাজনৈতিক সহায়ক শক্তিসমূহ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আমাদের উচ্চারণ করতে হয়েছিল, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন'... বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ট্যাংক, কামান, বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হত্যার উদ্দেশ্যে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠী অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই। পাকিস্তান যে পূর্ব বাংলার মানুষকে কোনোভাবেই সহ্য করতে রাজি ছিল না তার প্রমাণ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই তারা একের পর এক দিয়ে যাচ্ছিল। অথচ পূর্ব বাংলার জনগণ একদিন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র লাভের জন্য আন্দোলন করেছিল। সেই পাকিস্তানেই পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের মর্যাদাকর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হতে থাকে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দেশপ্রেম এবং আত্মমর্যাদার অধিকার অর্জনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন ছিল তা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বৃহত্তর জনগণ করতে শিখেছে।

৬ দফা প্রদান করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাকামী জনগণের সম্মুখে মুক্তির সনদ উপস্থাপন করেন। নিজে এবং সহকর্মীরাসহ সকলেই পাকিস্তানিদের রোষানলে পড়েন। জেলে যান, বছর বছর কারারুদ্ধ থাকেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ওঠার অপেক্ষায় ছিলেন। সেখান থেকেই মানুষ প্রিয় নেতাকে মুক্ত করার জন্য গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ভেঙে দেয় পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরব্যবস্থাকে। তখন সাধারণ নির্বাচন দিতে পাকিস্তান বাধ্য হয়। সেই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যে ম্যান্ডেট প্রদান করেছিল তাতে হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা বাঙালির দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামে বেড়ে ওঠা নেতা শেখ মুজিবের হাতে দিতে

হবে; নতুবা স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনমানসের এমন পরিবর্তনশীলতার সামান্যতম উপলব্ধি করতে পারেনি। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি জনগণের এই প্রস্তুতি ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে, যা ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে দ্রুততর হতে থাকে।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর স্বাধীনতার বাস্তবতা যেমন তৈরি হতে থাকে, তেমনি মানুষের মধ্যে মানসিকতাও দ্রুত বেগবান হতে থাকে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'–অনেকটাই তখন জানান দিয়ে গেল আমরা স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে এবার প্রয়োজনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেব। পাকিস্তানিরা মনে করেছিল অপারেশন সার্চলাইট নামিয়ে আমাদের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু পাকিস্তানিদের সেই কাল্পনিক হিসাব শুরু থেকেই ব্যর্থ হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর তাঁর ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী মানুষের কানে পৌঁছাতে দেরি হয়নি। মানুষ পাকিস্তানিদের প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখনো আমাদের প্রতিরোধের কোনো আয়োজনই ছিল না। কিন্তু প্রতিটি মানুষ বুক চিতিয়ে হাতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মুখে জয় বাংলার স্লোগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে নিরস্ত্র জনগণের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর সহযোগী রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বল্প সময়ের মধ্যেই একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে বৈধ উপায়ে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করার সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে থাকে। ১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ জাতির জীবনে উপস্থিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে একটি বৈধ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ছিল এক অন্যন্যসাধারণ ও বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের একটি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠনেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও প্রচারিত হয়। জনগণ এসব আয়োজনের খবর শুনে গ্রাম থেকে নদী, মাঠ, পাহাড়, সীমান্ত অতিক্রম করে ছুটে যায় স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্য। ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলায় এক অনাড়ম্বর অথচ তেজোদীপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করা হয় সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রিয় আবাসভূমি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত করার কথা।

বাংলাদেশ এক চরম অনিশ্চিত অবস্থা থেকে কীভাবে দেশপ্রেম, মেধা, মনন ও সৃজনশীল রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে একদিকে প্রস্তুতি গ্রহণ,

অন্যদিকে মানুষকে সম্পৃক্ত করা আন্তর্জাতিকভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া জাতির পক্ষে টানতে থাকে। এ এক চুম্বক আকর্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ সূচনা করেছিল, যার প্রতি ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ সমর্থন জানাতে থাকে। তবে সামরিক পাকিস্তানি শক্তির পক্ষে পৃথিবীর দুই পরাশক্তি এবং কিছু আরব রাষ্ট্র সমর্থন জানালেও পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও লড়াই করতে নেমে পড়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, লুটপাট, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা, পুল, কালভার্ট, ব্রিজ ধ্বংস করেও মানুষকে স্তব্ধ করতে পারেনি। এক শ্রেণির রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং পাকিস্তানি অনুগত বাহিনী সৃষ্টি করেও নিজেদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে পারেনি। দিন যত এগোচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধ তত সুসংগঠিত হচ্ছিল, তত শ্রেণি, পেশা ও বাহিনীর মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের যুক্ত করে রণাঙ্গনকে সুসজ্জিত করতে থাকে। কয় মাস আগেও যে কৃষকের হাতে ছিল লাঙল-জোয়াল আর চাষের গরু, তার হাতে এখন স্টেনগান, গ্রেনেড বোমা, যা সে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। যে শ্রমিক আগে কলকারখানায় কাজ করত, সেও একইভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। যে ছাত্রের হাতে বই-পুস্তক ছিল, তার হাতেও স্বাধীনতার অস্ত্র তখন শোভা পাচ্ছিল। যে শিক্ষক ক্লাসে পড়াতেন, তিনিও চলে গেলেন যুদ্ধে আর বিদেশে জনমত গঠনে।

যে শিল্পী দেশে কোনো প্রকারে শিল্পচর্চা করে জীবন কাটাতেন, তিনিও সীমান্ত পাড়ি দিয়ে গণসংগীত আর স্বাধীন বাংলা বেতারে মানুষকে উজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদেশে অবস্থানরত যে বাঙালি কর্মকর্তা মোটামুটি সুখেই ছিলেন, তিনিও দেশের স্বাধীনতার জন্য চাকরি ছেড়ে বিশ্বজনমত গঠনে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করলেন। যে সাংবাদিক একদা পত্রিকায় সংবাদ লিখতেন, তিনিও স্বাধীনতার পক্ষে দেশে-বিদেশে লেখালেখি শুরু করলেন। বিদেশিরাও যুক্ত হলেন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে কোথাও বা কনসার্ট আয়োজনে, কোথাও-বা জনমত ও অর্থ সংগ্রহে। বিদেশি প্রেস, মিডিয়া সর্বত্র তখন বাংলাদেশ এক স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার আর্তনাদ ব্যক্ত করছিল। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিল। এমনকি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কিংবা প্রবাসে অবস্থানরতরাও মুক্তিকামী বাঙালির পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি। বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে তখন ছোটো-বড়ো অসংখ্য উদ্যোগ এই বাংলাদেশকে ঘিরে চলেছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানিদের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, যুদ্ধ, আক্রমণ, সীমান্তের ওপারে আশ্রয়শিবিরে ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, স্বাধীনতায় নেতৃত্বদানকারী সরকারের নির্ঘুম রাত, নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা, ভারতের নানা গোষ্ঠী-পেশার মানুষের প্রসারিত হাত

বাংলাদেশের পক্ষে নানা বক্তৃতা-বিবৃতি, সাহায্য-সহযোগিতা এসব প্রতিদিন শক্তি সঞ্চয় করছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে। চরম অনিশ্চয়তা ধীরে ধীরে নিশ্চয়তার ভিত্তি তৈরি করতে থাকে।

পাকিস্তানিরা তখন কারাগারের অন্তরালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। এর বিরুদ্ধেও জনমত বিশ্বে উচ্চারিত হতে থাকে। পাকিস্তানে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ বাঙালি যে যেদিকে পারছিল পালিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। আবার অনেকে বন্দিত্ব জীবনে আটকে পড়ে গিয়েছিল। এ এক সীমাহীন বিচিত্র যন্ত্রণাদায়ক কষ্টকর মৃত্যুর মুখোমুখি দিনাতিপাত করার অভিজ্ঞতা। এর পরও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তখনো মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। বিশ্বের রাজনীতি বিভক্ত হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো প্রদান করে। বোঝা গেল, বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে আর বন্ধুহীন নয়। জাতিসংঘেও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপিত হতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী আরো সাহসী হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামেগঞ্জে তখন সুসংগঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ পাকিস্তানিদের হটিয়ে দিতে থাকে। নভেম্বরের ২১ তারিখে তিন বাহিনীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এই সেনাবাহিনীর চরিত্রেই ছিল মুক্তিযুদ্ধ। গঠিত সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনী গঠন করে। আর তাতেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মাথায় রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। ৩ ডিসেম্বর তারা ভারত আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সরকার ভারতের নিকট স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বৈধ উপায়ে প্রদানের দাবি করে। ৬ ডিসেম্বর ভারত এবং ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের যৌথ নেতৃত্বে পাকিস্তানিদের হটানোর জন্য প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যৌথ বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। চারদিক থেকে সব ঢাকা অভিমুখে পালাতে থাকে। পথে পথে প্রতিরোধের মুখে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। নিরস্ত্র জনতার মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কতটা অসহায় হয়ে পড়ে ছিল, সেটি সেই সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। পাকিস্তানিরা যখন লেজ গুটিয়ে আসতে থাকে তখন আলবদর, আলশামস বাহিনী ১০ তারিখ থেকে নতুন করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে থাকে। পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে এই অপশক্তি বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনে গুপ্তঘাতকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাতেও বাংলাদেশের বিজয় আর পাকিস্তানের পরাজয় ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। ১৬ই ডিসেম্বর বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য হয়। রচিত হয় বিজয় দিবস। ২৬ মার্চ যে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল অজানা এক গন্তব্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটল বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে তাই এক নয়, দুটি দিন ইতিহাসের গৌরবে স্থান করে নিল। এমনটি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে স্বাধীনতার সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার এই সংগ্রাম এক দীর্ঘ ঐতিহ্যমণ্ডিত উপাখ্যানে ভরপুর। এই ইতিহাস এখনো অনেকের কাছেই অজানা। অনেক লিখিত দলিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমাদের অজান্তেই এখনো রয়ে গেছে। দেশেও প্রতিটি ঘরে, গ্রামে, অঞ্চলে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সীমাহীন দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণা আর গৌরবময় ঘটনা অনেকেই তুলে ধরতে পারেননি। দীর্ঘদিন দেশের রাজনীতিতে মুখে স্বাধীনতার পক্ষের কথা বললেও অন্তরে স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজত্ব কায়েম ছিল। রাজনীতি, সমাজ ও জনমানসের এক হীনমনস্ক গোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয়ের ইতিহাসকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিল। কয়েকটি প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস পড়ে বা শুনে দেশকে ভুলভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখেছে। কিন্তু সময় এসেছে নতুন খবর শোনার। এ খবর নতুন নয়, একাত্তরেরই নানা ঘটনার খবর, যা এতদিন চাপা পড়েছিল। এখন দেশে দেশে, এখানে-সেখানে হাতে তুলে নিতে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে সেসব পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির নানা কথা ও ঘটনার বর্ণনা। নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে এই তথ্য-উপাত্তে আমরা যত বেশি তুলে ধরতে পারব, তত বেশি নতুন প্রজন্ম জাতীয় শৌর্য, বীর্য ও ঐতিহ্যে চেতনা ও প্রেরণার সঙ্গী হবে। ইতিহাস অতীতের মহৎকে ধারণ করেই বর্তমানকে ভবিষ্যতের পথে চলার শিক্ষা দেয়। স্বাধীনতার ইতিহাস বিজয়ের এই মাসে যে বিশাল সমৃদ্ধি নিয়ে আমাদের সম্মুখে অপেক্ষা করছে, আমাদের তরুণদের হাতে ও চেতনায় তার এই ঢালা তুলে দিতে হবে। তবেই এই মহান ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে থাকবে। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২)

লেখক : অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ।

২৬ মার্চ '৭১ : ২৩ বছরের সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি

আ ক ম মোজাম্মেল হক

যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, তিনি আর কেউ নন মহান নেতা, শিক্ষক, মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কথা তিনি ভাবতে শুরু করেন পাকিস্তান সৃষ্টিলগ্ন থেকেই। যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর হিসেবে এই পূর্ববঙ্গে চারণের বেশে তাঁর রাজনৈতিক গুরু গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে রেখেছেন অনন্য ভূমিকা, সেই পাকিস্তানই বাঙালির মায়ের ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। তখনই সেদিনের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব বুঝতে পারেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে কেবল ইংরেজ প্রভুর পরিবর্তে পাঞ্জাবি প্রভু এসেছে এবং ইংরেজ শোষকের পরিবর্তে পাঞ্জাবি শোষকরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। কিন্তু যে বাঙালিরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে তারা পরাধীনই রয়ে গেল।

মজার ব্যাপার হলো, যারা এখন পাকিস্তানি তারা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে অধিকাংশ ভোটই কংগ্রেসের পক্ষে দেয়, অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করে আর বাঙালিরা মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করে। দূরদর্শী এই নেতা ১৯৪৮ সালেই বুঝেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেকোনো মূল্যেই হোক বাঙালিকে শোষণমুক্ত করতে হবে এবং বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হবে। যেই চিন্তা সেই কাজে হাত দিয়ে প্রথমে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম দেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আন্দোলনের সময় রাজপথ থেকে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে যান এবং ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার সময় জেলখানা থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলখানা থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন। ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ও তরুণ নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর মদদে নারায়ণগঞ্জে আদমজী জুট মিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা বাধিয়ে '৯২(ক)' ধারা জারি করে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে এবং বঙ্গবন্ধুকে মন্ত্রীর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে যায়। ১৯৫৬-৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে বারবার পাকিস্তানিদের হুঁশিয়ার করেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালির ওপর নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বাঙালির ওপর শোষণ ও বৈষম্য বন্ধ না করলে বাঙালিরা আলাদাভাবে ভাবতে ও সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বলেও পাকিস্তান সংসদে উল্লেখ করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং আওয়ামী লীগের জয়লাভ করার সম্ভাবনা বুঝে পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীরা সামরিক শাসন জারি করে বাঙালিদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করার ব্যবস্থা করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখে।

১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধু জেল হতে বের হয়ে নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন শুরু করেন। ছাত্রলীগের মাধ্যমে স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস গঠন করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন এবং একই লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বাঙালির বাঁচার দাবি ৬ দফা দিয়ে বাঙালিকে প্রকারান্তরে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে গ্রেফতারের প্রায় ৩ বছর পর চিরতরে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে পাকিস্তানিরা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে মুক্ত করে ১০ লক্ষাধিক জনগণের সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। পাকিস্তানের তথাকথিত লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর পাক সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এলএফও) মেনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার শর্তে পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে যাওয়ার সম্মতি জানান।

আমরা ছাত্রলীগের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এলএফও মেনে নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলে বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে বলেন, 'এই নির্বাচন ক্ষমতায় যাওয়ার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনকে স্বাধীনতার পক্ষে রেফারেন্ডাম হিসেবে গণ্য করে কাজ করে যাও। জনসভায় সুস্পষ্টভাবে বলবে ৬ দফা না মেনে নিলে ১ দফার (অর্থাৎ স্বাধীনতা) আন্দোলন হবে। নির্বাচনকে জনমত গঠনের সর্বোত্তম সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। বাঙালির নেতা কে হবে তাও নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে। বাঙালিরা আমার পক্ষে রায় দিলে কীভাবে এলএফও লাথি মেরে বুড়িগঙ্গা পার করে সিন্ধু নদীতে ফেলে দিতে হবে, তা আমার জানা আছে। স্বাধীনতাই আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও। আমি বেঈমান হয়ে মরতে চাই না, দেশকে স্বাধীন করেই মাথা উঁচু করে বাঙালির ইজ্জত রক্ষা করতে চাই। এলএফও-এর মূল কথা ছিল নির্বাচনে প্রচারকালে আঞ্চলিকতা বা বৈষম্যের কথা বলা যাবে না এবং ১৮০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করতে হবে। ব্যর্থ হলে আপনাআপনি সংসদ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ

পাকসেনাদের ধারণা ছিল কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। ১৮০ দিনে সংবিধানও রচনা করতে পারবে না। তাহলে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে সামরিক শাসনকেই স্থায়ী করতে পারবে।

পাকিস্তানিদের জন্য বিধি হলো বাম। তাদের সমস্ত ধারণা ও গোপনীয় রিপোর্ট ভুল প্রমাণিত করে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে বাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন উপহার দিয়ে বাঙালি জাতির একক নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। জনগণের এই ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় রায়ই হলো মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনগণের অনুমোদন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে চাই। আমার এলাকার নেতা বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য মরহুম শামসুল হক এমএনএ এবং তৎকালীন মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম হাবিব উল্ল্যাহর সাথে ১৯৭১ সালর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে দুপুরের দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। সারাদিন বঙ্গবন্ধু লক্ষ লক্ষ বাঙালির উষ্ণ অভিনন্দনে ক্লান্ত। সে সময় ওই দুই নেতার সাথে আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে বঙ্গবন্ধু জানতে চান আমরা কিছু বলব কি না। জনাব শামসুল হক সাহেবের চোখের ইশারায় আমি বঙ্গবন্ধুকে জানাই যে ঢাকায় সমরাস্ত্রের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে জয়দেবপুরের সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত সমরাস্ত্র ঢাকায় নিয়ে আসার পরিকল্পনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি। এমতাবস্থায় আমরা কী করব? এ কথা শোনার পরই বঙ্গবন্ধু ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জে উঠলেন। খুব জোরে এক ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই একটা আহম্মক, এত দিন কী শিখেছিস? যেকোনো মূল্যে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ১৯ মার্চ, ১৯৭১ শুক্রবার ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবের নেতৃত্বে পাক হানাদার বাহিনী দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য জয়দেবপুর যায়। এই সংবাদ পাওয়ার পর জয়দেবপুরের (গাজীপুরের) হাজার হাজার বীর জনতা যার যা ছিল; যেমন–দেশি বন্দুক, ধনুক, ছেন, কতরা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে জমায়েত হয় এবং পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাক বাহিনী দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের সামনে রেখে পেছনে পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে রেখে জনতার ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। বাঙালি সৈন্যরা জনতার ওপর গুলি না করে ওপরের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে। আমার ওই তরুণ বয়সে সুযোগ হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব দেওয়ার। বঙ্গবন্ধুর একজন কর্মী হিসেবে এ ঘটনাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অহংকার। সেদিন সারা বাংলাদেশে স্লোগান ওঠে–

'জয়দেবপুরের পথ ধরো, সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করো', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বাঙালি জাতির ভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত। এ দেশের জনগণ '৭০ সালের নির্বাচনে সে অধিকার বঙ্গবন্ধুকে দেয়। তাই ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি ঘোষণা দেন–

'ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।'

এটিই স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ ঘোষণা। কারণ একমাত্র বঙ্গবন্ধুকেই জনগণ ম্যান্ডেট দেয় বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে যেকোনো ঘোষণা দেওয়ার। সেই অধিকার বলেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতাদের কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীল করেছে, ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু জাতিকে বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরের আন্দোলনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উদ্বুদ্ধ করেন, প্রস্তুত করেন। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সফলতার সাথে স্বাধীনতার স্পৃহা বাঙালি জাতির মধ্যে জাগ্রত করতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার স্পৃহা, মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল প্রেরণা। যুদ্ধের জন্য জাতিকে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন থেকেই প্রস্তুত করেন। ঘোষণা দেওয়া ছিল, খেলা শুরুর বাঁশি বাজানোর মতো যেটি বঙ্গবন্ধু একেবারে মোক্ষম সময় বুঝেই দেন। ফলে স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সহজেই আমাদের পক্ষে চলে আসে। নতুবা পাকিস্তানিরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করত, যেটি পাকিস্তানিরা সব সময় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। এখানেই বঙ্গবন্ধু অনন্য, অসাধারণ।

বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য পাকিস্তান আমলে ২৩ বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু যৌবনের শ্রেষ্ঠ ১৪ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। কোনো অপশক্তির কাছেই মাথানত করেননি বলে সম্মুখ সারির অনেক নেতাকেই পেছনে ফেলে বাঙালি জাতির একক নেতায় পরিণত হন।

তাই বলতে চাচ্ছি ২৩ বছরের সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিই ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬)

লেখক : সংসদ সদস্য ও মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বিজয় দিবসের ভাবনা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমার কাছে জানতে চায় আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্তটি কী ছিল? প্রশ্নের উত্তরটি দিতে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াই–তার কারণ এই নয় যে আমি সঠিক উত্তরটি জানি না। আমি থমকে দাঁড়াই কারণ প্রশ্নটি শোনার সাথে সাথে আমার মাথায় অসংখ্য স্মৃতি এসে ভিড় করে এবং আমি মুহূর্তের জন্য হলেও আনমনা হয়ে যাই। প্রশ্নের উত্তরটি নিয়ে আমার কিংবা আমার প্রজন্মের একজন মানুষের মনের ভেতরেও কোনো দ্বিধা নেই, আমরা সবাই জানি আমাদের সবার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময়, মুহূর্তটি ছিল উনিশ শ একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বর, আমাদের প্রথম বিজয় দিবস।

উনচল্লিশ বছর আগের কথা, তবুও আমার মনে হয় বুঝি এই সেদিনের ঘটনা। মনে আছে যাত্রাবাড়ীতে মাটির নিচে ট্রেঞ্চ কেটে একটা পরিবারের বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে কয়দিন থেকে বসে আছি। সামনের বড়ো রাস্তা দিয়ে কয়েকটা ট্যাংক আর তার সাথে পাকিস্তানি মিলিটারির বহর গিয়েছে। কাছাকাছি কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে তার শব্দে পুরো এলাকা সচকিত। আকাশে যুদ্ধবিমান, তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উদ্দেশে লিফলেট ফেলছে, 'এক্ষুণি আত্মসমর্পণ করো, না হলে মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের ধরে ফেলব', রাস্তায় জনমানব নেই, শুধু ইতস্তত কিছু মৃতদেহ পড়ে আছে।

ষোলই ডিসেম্বর হঠাৎ করে দৃশ্যপট পাল্টে গেল, ট্যাংকগুলো ঘড়ঘড় শব্দ করে ফিরে আসতে শুরু করল। ট্যাংকের সাথে ট্রাকবোঝাই যুদ্ধবিধ্বস্ত পাকিস্তান মিলিটারিরা ফিরে আসছে। তাদের সাথে পালিয়ে আসছে বিহারি পরিবার, রাজাকার, আলবদর। তাদের চোখে-মুখে প্রথমবার হঠাৎ করে অসহায় আতঙ্ক। সূর্য যখন ঢলে আসছে ঠিক তখন আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্তটির মুখোমুখি হলাম, আমি শুনলাম কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলল, জয় বাংলা।

ছোটো একটি স্লোগান। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেটি সব কিছু পাল্টে দিল। ৯ মাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতক, রাজাকার, আলবদরদের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, অসহায় আতঙ্ক অনিশ্চয়তা সব কিছু যেন এক ফুৎকারে উড়ে গেল। এক মুহূর্তে আমি একজন নতুন মানুষে পাল্টে গেলাম, আমি এখন হলাম স্বাধীন একটি দেশের স্বাধীন একজন মানুষ, যার মাথা উঁচু হয়ে যেন আকাশকে স্পর্শ করেছে। যুদ্ধের ৯ মাসে কত প্রিয়জনকে হারিয়েছি, তাদের স্মৃতি ভিড় করে এলো এবং চোখ থেকে অশ্রু মুছে আমি প্রথমবার আমার সদ্য জন্ম নেওয়া প্রিয় মাতৃভূমির জন্য তীব্র ভালোবাসা অনুভব করেছিলাম। আমাদের

প্রজন্মের মানুষগুলোর মতো সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই, আমরা আমাদের মাতৃভূমিটিকে জন্মাতে দেখেছি, আমরা যত তীব্রভাবে দেশকে ভালোবাসার আনন্দ পেয়েছি, নতুন প্রজন্ম কোনোদিন সেটা অনুভব করতে পারবে না, কোনো দিন সেটা কল্পনাও করতে পারবে না।

মুক্তিযুদ্ধের জন্য আমাদের প্রজন্মের ভেতর এক ধরনের তীব্র আবেগ রয়েছে, নতুন প্রজন্মের ভেতরে সেটি থাকার কথা ছিল না। পঁচাত্তরের পর পুরো দেশটিকে একটা অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা খুব ধীরে ধীরে সেখান থেকে বের হয়ে আসছি। মাতৃভূমির জন্য গভীর মমতা নিয়ে নূতন একটি প্রজন্ম বড়ো হয়ে আসছে। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি এই নূতন প্রজন্ম শুধু যে দেশকে ভালোবাসে তা নয়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকেও তারা অনুভব করতে পারে। তাই গত নির্বাচনে যখন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের অঙ্গীকার করা হয়েছিল তারা সাগ্রহে মহাজোটকে নির্বাচিত করে দেশ চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে। তারা এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বাসঘাতক-দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দেখার জন্য, গ্লানিমুক্ত মাতৃভূমিকে ফিরে পাওয়ার জন্য।

আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশের জন্য, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নতুন প্রজন্মই আমাদের সেই দেশটিকে উপহার দিতে পারবে। সেটি সম্ভব শুধুমাত্র একটি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক প্রজন্ম দিয়ে, তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটুকু জানে। কোনো কূটনৈতিক আলোচনার পর দলিল-দস্তাবেজ স্বাক্ষর করে এই দেশটির জন্ম হয়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পরাশক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সেনাবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে এই দেশটি মুক্ত হয়েছিল। সেই মুক্তিযুদ্ধটি একই সাথে গভীর আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস আর বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল এক অর্জনের ইতিহাস। যখন কেউ এই আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাসটুকু জানবে তখন সে যে শুধু এই দেশের জন্য গভীর মমতা অনুভব করবে তা নয়, এই দেশটির জন্য গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে। দেশ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণাটুকু তখন তাদেরকে বাইরে থেকে দিতে হবে না, তারা নিজে থেকেই সেটা অনুভব করবে।

প্রতিটি বিজয় দিবসে আমরা নতুন করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করি, আমাদের নতুন প্রজন্মকেও সেটা অনুভব করতে হবে। তাদেরকে জানতে হবে শুধু একাত্তরের ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসটিই মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ ইতিহাস নয়। সাতচল্লিশে দেশবিভাগের পরপরই সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে সেটা শুরু। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি জাতি তাদের আত্মপরিচয় পেতে শুরু করেছে, ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার আন্দোলন পুরো দেশকে একতাবদ্ধ করেছে। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের অবিশ্বাস্য নির্বাচন, পাকিস্তানিদের বিশ্বাসঘাতকতা আর তখন বঙ্গবন্ধুর সেই অসহযোগ আন্দোলন,

সেই সব স্মৃতি এখনো আমাদের মাঝে শিহরণের জন্ম দেয়। পাকিস্তানি মিলিটারির উদ্যত অস্ত্রকে উপেক্ষা করে সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটির কথা আমরা কেউ ভুলতে পারব?

এর সব কিছু নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। শুধু অতীতটুকু নিয়ে নয়–আমাদের ভবিষ্যৎটুকুও হবে এর অংশ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে আমরা যখন গ্লানিমুক্ত হতে পারব, দেশটিকে যখন স্বপ্নের দেশের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে পারব শুধু তখনই আমাদের ইতিহাস তার পূর্ণাঙ্গতা পাবে।

বিজয় দিবসে আমরা সেই স্বপ্নে দেখা মাতৃভূমির প্রতীক্ষায় আছি। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১০)

লেখক : শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক।

৪৫ বছরে বাংলাদেশ

মুনতাসীর মামুন

পূর্ণ হলো বাংলাদেশের ৪৫ বছর। ১৯৭১ সালে কি ভেবেছিলাম বাংলাদেশের ৪৫ বছর দেখে যেতে পারব? নিশ্চয়ই না। জানতাম দেশ স্বাধীন হবে; কিন্তু কবে হবে, তা তো জানা ছিল না। ৯ মাসের মধ্যে যে দেশ স্বাধীন হলো সেটা ভাগ্য মানি। ৯ মাসের রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে কোনো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে–

১. স্বাধীনতা ঘোষণা করে এত কম সময়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে কোনো দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাত্র ৯ মাসে আর কোনো দেশে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ হত্যা করা হয়নি।

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত কম সময়ে এক কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশ ত্যাগ করেনি।

৪. কোনো একটি দেশে ৯ মাসে এক কোটিরও বেশি মানুষ আশ্রয় নেয়নি।

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোনো দেশে বেসরকারি হিসাব মতে পাঁচ লাখেরও বেশি নারী নির্যাতিত হয়নি।

৬. স্বাধীনতা ঘোষণার দুই সপ্তাহের মধ্যে আর কোনো দেশে প্রবাসী সরকার গঠন সম্ভব হয়নি।

৭. আর কোনো দেশ স্বাধীনতা অর্জনে সারা বিশ্বের নাগরিক বা সিভিল সমাজ এত সমর্থন পায়নি।

আরেকটি বিশেষত্ব, স্বাধীনতাযুদ্ধকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছি। কারণ, নিছক ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেননি। তিনি চেয়েছিলেন, আমরাও চেয়েছিলাম সর্ব অর্থে মুক্তি–ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এই মুক্তিযুদ্ধে অল্প কিছু মানুষ ছাড়া প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়েছিল, যা এক বিরল ঘটনা। এটি ছিল সত্যিকার অর্থে জনযুদ্ধ। এ স্বাধীনতা অর্জনে ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণ যেভাবে সহায়তা করেছিল তাও ছিল অভূতপূর্ব।

যেদিন দেশ স্বাধীন হয় সেদিনটিকেই সাধারণত স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষণা করা হয়। ১৪ আগস্ট যেমন ছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ আর স্বাধীন যেদিন হলাম সেটি বিজয় দিবস। এটিও বৈশিষ্ট্যময়

এবং বিরল ঘটনা। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন যে জন্য সেই ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীন হয়েছে, এমন দেশের সংখ্যাও কিন্তু কম। বিজয় দিবস শুধু আমাদেরই আছে বোধহয়।

১৬ ডিসেম্বর কি হঠাৎ বিজয় দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল? এ ঘোষণা কি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত না পরিকল্পিত? এ রহস্যের সুরাহা এখন হবে কি না জানি না। তবে খানিকটা অনুমান করতে পারি। পাকিস্তানিরা ধর্মের নামে শোষণ করেছে। সে দেশে ২৫ বছর অবস্থান ছিল বঞ্চনাময় এবং লাঞ্ছনাময়। সব সময় এ কথাটাই বলা হয়েছে 'ভেতো বাঙালি'। কিন্তু এ দেশে শাসন বজায় রাখতে তারা ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ হত্যা করেছিল, ৫ লাখেরও বেশি নারীকে নির্যাতন করেছিল। তারপর ৯৩ হাজার 'বীর পাকিস্তানি' 'ভেতো বাঙালি'র সামনে হাঁটু গেড়ে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। এটি এমন বিজয়, এমন অর্জন যা সব সময়ই ঘটে না। বিজয় দিবস ঘোষণার পেছনে এই দৃষ্টিভঙ্গিটিই কাজ করেছিল। বাঙালির বিজয় ১৬ ডিসেম্বর। এই দিন এলেই স্মরণ করব ৩০ লক্ষ শহিদ ও নির্যাতিতদের। স্মরণ করব পাকিস্তানি কাপুরুষদের আত্মসমর্পণের কথা। এ বিজয় একই সঙ্গে আনন্দের। এ বিজয় একই সঙ্গে বেদনার। নিরস্ত্র মানুষকে যারা বধ করে তারা তো বিজয়ী হতে পারে না, বীর বলে পরিচিত হতে পারে না। প্রায় নিরস্ত্র বাঙালিরা সশস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছে। তারা বীর। এর কারণেই কি স্লোগান দেওয়া হয়নি 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।'

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। আমরাও সোনার বাংলা চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বয়সিদের নিশ্চয়ই মনে আছে ১৭ ডিসেম্বর [১৯৭১] আমরা কোন বাংলাদেশ পেয়েছিলাম। চারদিকে হাহাকার। প্রায় সবই বিধ্বস্ত। খাদ্যও নেই। ১৭ ডিসেম্বর থেকে পরাজিত শক্তিদের ষড়যন্ত্র। আন্তর্জাতিকও। কারণ মহাশক্তিগুলি চীন, আমেরিকা এবং মুসলিম দেশগুলি-তো বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। বঙ্গবন্ধু ওই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিন্তু অবকাঠামো থেকে শুরু করে উন্নয়ন–তার রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। এর সবচেয়ে বড়ো দলিল ১৯৭২ সালের সংবিধান। দেশকে যখন বঙ্গবন্ধু গুছিয়ে আনছেন, ফসল ওঠার মৌসুম আসছে, নিত্যপণ্যের দাম কমছে তখনই কিন্তু সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা দেশের ক্ষমতা দখল করেছিল।

১৯৭৫ সালের পরের ঘটনাবলি আমাদের জানা। যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারাই বঙ্গবন্ধুর নেওয়া কর্মসূচি থেকে সংবিধান–সব আস্তে আস্তে চিহ্নিত করে বাদ দিয়েছে। পাকিস্তানি মানস ফিরিয়ে আনাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল এ রকম–১৯৪৭ হচ্ছে ইতিহাসের মূল ধারা। ১৯৭১-৭৫ ব্যতিক্রম। ১৯৭৫-এর পর দেশ আবার সেই মূল ধারায়ই ফিরে গেল। এই চিন্তাটা ছিল বিজিতদের, বিজয়ীদের নয়। স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমতায় বসানো থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা–কোনো কিছু তারা বাদ দেয়নি। শুধু তা-ই নয়, বিএনপি-জামায়াত আমলে

গ্রেনেড হামলা করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে; কেননা তিনি বিজয়ী বাঙালিদের প্রতীক।

বঙ্গবন্ধু হত্যা থেকে গণতন্ত্রে ফিরে আসার সময়টুকু এক অর্থে বাংলাদেশের অন্ধকার যুগ। এ সময়টুকুতে আমাদের যা অর্জন ছিল ২৫ বছরে তা মুছে ফেলা হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী ও পাকিস্তানি মানসের অধিকারীরা দেশ শাসন করেছিল। শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়টুকু হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার সময়, অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার সময়।

আদর্শের সঙ্গে উন্নয়নের একটি সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্রম যদি বিচার করেন তাহলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধুর আমল এবং শেখ হাসিনার আমলে উন্নয়নের যে ধারা সেটি অন্য কোনো সময় দেখা যায়নি। এমনকি ১৯৫৪-১৯৫৬ সালের কথাও যদি ধরি, তাহলেও দেখবেন, এ অঞ্চলে ২৫ বছরে তুলনামূলকভাবে উন্নয়ন বেশি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ যদি সমমনাদের নিয়ে নেতৃত্বে থাকে তাহলে দেশের উন্নয়ন হয়।

৪৫ বছরে আজ যে বাংলাদেশ দেখছি, ভাবিনি তা দেখে যাব। আমাদের বাঙালিদের অনেক স্বপ্ন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কারণেই পূর্ণ হতে চলেছে। আমরা স্বাধীনতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধী এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার দেখে যেতে চেয়েছিলাম। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি তা সম্পন্ন করেছেন। বঙ্গবন্ধু এবং যৌবনে আমরা যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলাম তা পূরণেও সচেষ্ট তিনি। এই বিচারগুলি, বিশেষ করে মানবতাবিরোধী বিচার তাঁকে অমর করে রাখবে।

একই সঙ্গে তিনি বিপাকিস্তানীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছেন, যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর সম্পূর্ণ শাসনামলে আমরা দেখছি প্রবৃদ্ধি ৬ ভাগের নিচে নামেনি। সারা বিশ্ব এখন এতে বিস্মিত। অর্থনীতির প্রত্যেক সূচকে বাংলাদেশ যেন লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করছে। পোশাক, মাছ, মাংস, জুতা, আলু বিভিন্ন উৎপাদনে পৃথিবীর ১০টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিচ্ছে। আমরা যারা প্রায় পুরোটা জীবন সামরিক শাসনের অধীনে কাটিয়েছি তাদের জন্য এটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এ বিষয়টি প্রমাণ করে সামরিক শাসন উন্নয়নের অন্তরায়, দারিদ্র্যের প্রতিভূ। মিয়ানমার তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গত এক দশকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। বাঙালি চিরজীবন প্রায় অভুক্ত থেকেছে। গত ৪৫ বছরে জনসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে প্রায় ২০ ভাগ। আজ অভুক্ত বাঙালি প্রায় নেই, মঙ্গা নেই। খিদের বিষয়টি আমরা যেভাবে বুঝি নতুন প্রজন্মের পক্ষে সেভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধুর কারণে আমরা যে পাসপোর্ট পেয়েছি সে পাসপোর্টে আজ সারা বিশ্বময় বাঙালি ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালি এখন বিদেশে উপনিবেশ গড়ে তুলছে। শিক্ষা, খেলাধুলা, শিল্প, কৃষি সব ক্ষেত্রেই গত ৪৫ বছরে বাংলাদেশ এগিয়েছে। বিশ্বের

বিভিন্ন দেশে জঙ্গি-মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ সরকার কঠোরভাবে তা দমন করছে। জাতিসংঘের বেধে দেওয়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন কর্মসূচিতেও বাংলাদেশ এগিয়ে।

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তা থেকে নিচে নামার সম্ভাবনা কম, যদি না দেশে আবার বিএনপি-জামায়াতের অন্ধকার যুগ ফিরে আসে, রাজনীতি আদর্শ বিচ্যুত হয়। ৪৫ বছরে এই আশা, যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, আমরা তার পুরোটা দেখে যেতে না পারি, আমাদের উত্তরসূরিরা যেন তা দেখতে পায়। সে বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক, উন্নত। পাকিস্তানিমনাদের রাষ্ট্র নয়। সে রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণভাবে বাঙালিদের এবং প্রমাণ করবে বাঙালি বিজয়ী জাতি, বিজয়ীই থাকবে। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বার ২০১৬)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

২৬ মার্চ ১৯৭১ : আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপ

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশের জন্মদিবস। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় ছিল তারাও এখন স্তম্ভিত। এ দেশ এখন নতুন পৃথিবীর জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতারপর থেকে অদ্যাবধি আমাদের অর্জন সত্যিই আনন্দদায়ক। যদিও আমরা গণতন্ত্রসহ মৌলিক কিছু বিষয়ে স্থায়ী কাঠামো দাঁড় করাতে পারিনি। তারপরও আমরা আশাবাদী, আগামী দিনগুলোতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। তবে সমস্ত কিছুর ভিত্তি হতে হবে রাষ্ট্রপিতা শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের পথ ধরে।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে দেশবাসী বঙ্গবন্ধুকে ভোট দিয়ে তাঁর হাতে নিজেদের শাসন করার, তাদের পক্ষে কথা বলার ক্ষমতা অর্পণ করে। ১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তা এভাবে বিধৃত হয়েছে, '...এরূপ প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারের বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায়সংগত দাবি পূরণের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।'...

বস্তুত বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধতা ছিল জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের দৃষ্টিতে। আন্তর্জাতিক মহলে এর আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্যই গণপরিষদ গঠন ও আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণাকে অনুমোদন ও গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এর 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গ্রহণ ও বিপ্লবী সরকার গঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আইনি বৈধতা দেওয়া ও চলমান যুদ্ধকে একটি কমান্ড স্ট্রাকচারে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একক ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা নিজ কণ্ঠে প্রচার করেন এবং ২৭ মার্চ বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানও একই কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। একই সময়ে কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, ময়মনসিংহে মেজর এম সফিউল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর খালেদ মোশাররফ, চট্টগ্রামের সীমান্তে কর্মরত মেজর রফিক প্রমুখ সেনা কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধে শামিল হন। সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

৪ এপ্রিল ১৯৭১-এ হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে কর্নেল এম এ জি ওসমানী (অব.) ও লে. কর্নেল এম এ রব (অব.)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধরত পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধকে একক কমান্ডে নিয়ে আসতে

ওসমানী ও রবকে যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান করে মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আগরতলা ও কলকাতায় সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্বই সরকার গঠন ও যুদ্ধ পরিচালনায় একক কমান্ড গঠনে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সেনাবাহিনীর লোকদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করেন।

The Proclamation of Independence-কে আমাদের সংবিধানের অংশ করে নেওয়ায় (অনুচ্ছেদ ১৫০) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। অনুচ্ছেদ ১৫০-এর কোনো সংশোধনী না হওয়ায় বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে নিষ্পত্তিকৃত বলেই বিবেচিত। কিন্তু ইতিহাস তো শুধু আইন বা সংবিধান মেনে এগোয় না। ইতিহাসের নিজস্ব গতিময়তা আছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। ২৬ মার্চ পৌঁছতে বাঙালি যে পথপরিক্রমা করেছে, তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে ২৬ নভেম্বর তদানীন্তন হোটেল শাহবাগে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্যে বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লাখ লোক আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে, তা সম্পাদনের জন্য আমরা যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি তার জন্য প্রয়োজনবোধে আরো ১০ লাখ বাঙালি প্রাণ দেবে।'

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে এ দেশের নাম বাংলাদেশ'। ১৯৭১-এর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে তিনি বলেন, 'বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আরো রক্তদানের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকুন। ...আমিও আজ শহিদ বেদি থেকে বাংলার জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি, প্রস্তুত হও, দরকার হয় রক্ত দেব। ...আমরা স্বাধিকার চাই। ...আমি জানি না আবার কবে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং সারা বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি পরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন।' ২৮ ফেব্রুয়ারি '৭১ ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সভায় ঘোষণা করেন, 'জয় বাংলা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রতীক।'

মার্চজুড়ে অগণিত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে তিনি আন্দোলন ও সংগ্রামের কৌশল তুলে ধরেন। তিনি বললেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে..., রিকশা, ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম

কোর্ট, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি গর্ভনমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।' তিনি বললেন, 'এরপরে যদি বেতন না দেওয়া হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে দিকনির্দেশনা দিলেন সংগ্রামী মানুষের করণীয় সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা, করতে হবে।' তিনি আরো বললেন, (আসন্ন যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দিয়ে)– 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব।' (অর্থাৎ সেনানিবাসসমূহের সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দিতে হবে)।

একটি সর্বাত্মক যুদ্ধকৌশল সেদিন তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক পন্থায় অভ্যস্ত এক সংগ্রামী নেতা। সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে যাঁর অভিজ্ঞতা পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, হঠাৎ করে তিনি এমন বাস্তবতার সম্মুখীন হলেন যে দেশকে শত্রু মুক্ত করতে হলে সশস্ত্র যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই। গেরিলা যুদ্ধেরও রূপরেখা দিলেন তাঁর বক্তব্যে। ঘোষণা দিলেন, ...'আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার দেশের মুক্তি না হয়, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।' তিনি ঘোষণা দিলেন, 'পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।' 'যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।'

অসহযোগ আন্দোলনকে একটি সুনির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালনা করতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তাজউদ্দীন আহমদ নির্দেশাবলি জারি করতে থাকেন। তিনি সর্বমোট পঁয়ত্রিশটি নির্দেশ জারি করেছিলেন। এতে একটি প্যারালাল সরকার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ (নির্বাচনি রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে) স্বাধীনতা ঘোষণার নৈতিক ও আইনগত অধিকার অর্জন করেছিলেন।

২৬ মার্চ আকস্মিক কোনো দিবস বা ঘটনা নয়। ২৬ মার্চ হচ্ছে বাঙালির সযত্নে লালিত স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপ। ২৬ মার্চকে আলাদা করে বা ইতিহাসের ধারাবাহিকতার বাইরে রেখে বিবেচনা করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা এতে করে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে '৪৭-'৭১ পর্যন্ত এক ধারাবাহিক রাজনীতির ফসল, যার নেতৃত্বে ছিলেন রাজনীতিকরা আর কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাও অস্বীকার করা হয়। রাজনীতির বিপরীতে সমরতান্ত্রিকতাকে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানি দর্শনের আলোকে বাংলাদেশকে সাজাবার অপপ্রয়াস থেকেই উটকো বিতর্ক দাঁড় করিয়ে বিভ্রান্তির জাল বোনা হয়। সুতরাং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসকে আমাদের ইতিহাসের পরম্পরার আলোকে দেখতে হবে এবং তা হলেই আমরা এক উন্নত বাংলাদেশের পথে অগ্রসর হতে পারব। ❐

(প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৭)

লেখক : সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।

সুবর্ণজয়ন্তীর বিজয় উৎসব

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিনটি নিজের চোখে দেখার চেয়ে অভূতপূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা একজন মানুষের জীবনে ঘটতে পারে বলে আমার জানা নেই। সেই দিনটি ছিল অবিশ্বাস্য একটি আনন্দের দিন, কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি বিজয়ের সেই ক্ষণটিতে অনেকের চোখে ছিল অশ্রু। বিজয়ের মুহূর্তে এই দেশের লক্ষ কোটি মানুষের বুকে আনন্দের বান ডেকে গেলেও যে আপনজনদের হারিয়ে বিজয়ের এই মুহূর্তটিকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে তাদের কথা স্মরণ করে নিজের অজান্তেই তারা তাদের চোখ মুছেছে।

অর্ধশতাব্দী পরেও সেই দিনটির কথা থেকে আমরা এতটুকু বিস্মৃত হইনি। আমাদের যে প্রজন্ম সেই দিনটিকে নিজের চোখে দেখেছিল তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। সেই দিনটির তীব্র আনন্দে বুকে ধারণ করার সরাসরি অভিজ্ঞতাটুকু নিয়ে একদিন তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, তখন এ দেশের মানুষ হয়তো সেই অভিজ্ঞতাটুকুর কথা বইপত্রে পড়বে, কিন্তু তারা সেটি কোনোদিন অনুভব করতে পারবে না। পৃথিবীর নৃশংসতম দানবদের পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জনের সেই তীব্র আনন্দের কথা আসলে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

১৯৭১ সালের বিজয়ের পর যখন সাধারণ মানুষ প্রথমবার ঘর থেকে বের হয়েছিল তখন তারা জানত না যে তাদের সবার জন্য একটি গভীর বেদনা অপেক্ষা করছে। যুদ্ধের শেষ কয়টি দিন অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে কারো সাথে কারো যোগাযোগ নেই, আকাশে ভারতীয় যুদ্ধবিমান, সেখান থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য লিফলেট ছাড়া হচ্ছে, সেখানে লেখা, 'আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো, না হয় মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের ধরে ফেলবে'! বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীরাও তখন বসে নেই, যখন তারা বুঝতে পেরেছিল আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত তখন জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ এবং বদর বাহিনীর নেতৃত্বে দেশটিকে পঙ্গু করে রাখার জন্য আমাদের দেশের বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর সাংবাদিকদের ধরে নিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে। সেই হত্যার প্রক্রিয়াও ছিল অমানুষিক, যে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, তাঁর হৃৎপিণ্ড কেটে নিয়েছে, যে চোখের ডাক্তার তাঁর চোখ তুলে নিয়েছে! আমি এখনো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই যখন দেখি এই দেশের মূলধারার কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এই জামায়াতে ইসলামীর হাত ধরে রাজনীতি করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ অনুভব করে না!

'৭১ সালের সেই বিজয় দিবসে আমাদের ভেতর আরো একটি দুর্ভাবনা কাজ করছিল, সেটি ছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে, তিনি তখনো পাকিস্তানের কারাগারে। বিজয়ের পর সারা পৃথিবীর চাপে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

বঙ্গবন্ধু তাঁর দেশের মানুষের কাছে ফিরে এলেন '৭২ সালে জানুয়ারির ১০ তারিখে। মানুষের ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের সেই অনুপম দৃশ্যটি এভাবে পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা নেই।

দেশে তখন লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষ, পিতৃহারা পরিবার, সন্তানহারা মা, লাঞ্ছিতা নারী, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র জনগণ। তাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, পরনে কাপড় নেই, মুখে খাবার নেই। দেশে রাস্তাঘাট নেই, সেতু নেই, যানবাহন নেই, স্কুল নেই, কলেজ নেই, লেখাপড়ার বই নেই, খাতা নেই। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, শুধু মানুষের বুকে বিশাল একটা প্রত্যাশা। বঙ্গবন্ধু সেই দেশ পুনর্গঠনে হাত দিলেন। যে দেশটির তিনি জন্ম দিয়ে গেছেন সেই দেশটিকে গড়ে তোলার সময়টুকুও কিন্তু তাঁকে দেওয়া হলো না। সাড়ে তিন বছরের মাথায় আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ ভোরবেলা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম একটি হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। দুধের শিশু থেকে নববিবাহিতা বধূ কিংবা অন্তঃসত্ত্বা নারীটিও রক্ষা পেল না। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো এই অভাগা দেশের মাটি। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু সমার্থক তাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আসলে বাংলাদেশকেই হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে তোলা বাংলাদেশ তার পথ হারিয়ে বিভ্রান্তির কানাগলিতে হারিয়ে গেল।

বছর না ঘুরতেই যুদ্ধাপরাধীরা জেলখানা থেকে বের হয়ে এলো, দেশটি হয়ে গেল স্বাধীনতাবিরোধীদের অভয়ারণ্য। মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর নেমে এলো গভীর নৈরাশ্য, এক তীব্র বেদনাবোধ এবং অভিমান।

শেষ পর্যন্ত একদিন বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা দেশটির হাল ধরেছেন, যে দেশটি সামনে না এগিয়ে পেছনে ছুটে যাচ্ছিল তিনি সেই দেশকে আবার মূলধারায় ফিরিয়ে এনেছেন। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশটিকে গ্লানিমুক্ত করেছেন। বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে আবার আমরা মাথা উঁচু করে আমাদের বিজয় দিবস পালন করতে পারি।

কিন্তু সত্যিই কি আমাদের সব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে? যা কিছু অর্জন করার কথা তার সব কিছু কি অর্জিত হয়েছে?

অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে আমাদের দেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থানের সমস্যার সমাধান হতে শুরু করেছে। শিশু-কিশোরদের মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই মিলে চেষ্টা করে নিশ্চয়ই একদিন কোচিং সেন্টারে বন্দি আমাদের শিশু-কিশোরদের মুখস্থনির্ভর নিরানন্দ শিক্ষা থেকে মুক্তি দেবে। সত্যিকারের শিক্ষাবিদরা দায়িত্ব নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাবেন, এই দেশে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হবে। চিকিৎসা আর স্বাস্থ্যসেবাও হয়তো একদিন গড়ে তোলা সম্ভব। সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে জলবায়ুর ছোবল থেকেও হয়তো দেশকে একদিন রক্ষা করা হবে। ছোটো-বড়ো সব রাজনৈতিক দল যেদিন মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে বিশ্বাস করবে, সেদিন হয়তো এই দেশে আমরা সুস্থ গণতন্ত্র দেখব।

কিন্তু যত দিন আমাদের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জটির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত না হবে, তত দিন এত অর্জনের পরেও আমরা কিন্তু বড়ো গলায় আমাদের দেশকে নিয়ে অহংকার করতে পারব না। এই দেশে আমাদের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জটি কী, সেটি এখন আমরা সবাই জানি, সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প।

তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে এই দেশটির হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, সেটি কি সবাই অনুভব করতে পারছে?

গত পঞ্চাশ বছরের একটি বড়ো অংশ অন্ধকার জগতে থাকার পরেও শেষ পর্যন্ত আমাদের অনেক বড়ো বড়ো অর্জন হয়েছে, সেটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এই বিশাল অর্জন ম্লান হয়ে যাবে যদি এই দেশের একটি শিশুও শুধু ভিন্ন ধর্মের হওয়ার কারণে বুকের ভেতর চাপা ভয় নিয়ে রাত কাটায়। একটি দেশ কেমন চলছে, সেটি বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সেই দেশে যে সম্প্রদায় সংখ্যায় কম তাদের জিজ্ঞেস করা যে তারা কেমন আছে? তারা যদি বলে যে ভালো আছে তাহলে বুঝতে হবে দেশটি ভালো আছে, যদি তারা মনে করে ভালো নেই তাহলে বুঝতে হবে দেশটিও ভালো নেই। সেই সহজ হিসাবে আমরা বুঝতে পারি আমাদের প্রিয় দেশটি কিন্তু ভালো নেই–আমাদের স্মৃতিতে রামু, নাসিরনগর আর কুমিল্লার যে ঘটনা আছে সেগুলো আসলে মূল সমস্যার দৃশ্যমান অংশ, হিমশৈলের মতো দৃশ্যমান নয়; কিন্তু বিরাজমান একটি বিশাল সমস্যা আমাদের এই স্বপ্নকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ বিষবাষ্প।

পৃথিবীর সবাই এখন জানে একটি দেশের যত রকম সম্পদ থাকতে পারে তার মাঝে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হচ্ছে জনবৈচিত্র্য। পৃথিবীর দিকে তাকালেই আমরা সেটি দেখতে পাই। আমরা নিজেরাও জানি সবুজ গাছের পাতার মাঝে রঙিন ফুলটি কত সুন্দর। যদি গাছের পাতা, ফুল, কলি সবই বৈচিত্র্যহীন এক রঙের হতো তাহলে তার মাঝে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। সৌন্দর্যটা এসেছেই বৈচিত্র্য থেকে। আমাদের দেশের মানুষের জন্যও সেটি সত্যি। এই দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা মুসলমানদের সাথে সাথে যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, সাঁওতাল, গারো, পাহাড়ি, আদিবাসী এবং অন্যরাও না থাকে তাহলে আমরা আমাদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদটি থেকে বঞ্চিত হব। আমাদের অত্যন্ত বড়ো দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের জনবৈচিত্র্য খুব কম, কাজেই যেটুকু আছে সেটি আমাদের বুক আগলে রক্ষা করতে হবে–আমাদের নিজেদের স্বার্থেই!

সুবর্ণজয়ন্তীর এই বিজয় দিবসে আমরা দ্বিতীয় একটি বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে পারি যে বিজয়টি হবে সাম্প্রদায়িকতার ওপর বিজয়। অস্ত্র হাতে না হলেও মুক্তিযুদ্ধের মতোই আরো একটি যুদ্ধ করতে হবে নূতন এই বিজয় অর্জনের জন্য। এই যুদ্ধজয়ের পথটিও আমরা জানি–তার বিরুদ্ধে যুদ্ধটি হতে হবে বহুমুখী, বিচার, শাসন এবং আইন হবে সেই দৃশ্যমান যুদ্ধ এবং তার সাথে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধটি হবে শিক্ষা। সামাজিক নেটওয়ার্কে সাধারণ মানুষের মন্তব্য দেখে কারো বুঝতে বাকি থাকে না

যে দেশের বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর মন সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে কীভাবে কলুষিত হয়ে আছে। নূতন প্রজন্মকে সেই বিষবাষ্পে কলুষিত হতে দেওয়া যাবে না। নিজের ধর্মকে ভালোবাসতে শেখানোর আগেই তাকে শেখাতে হবে অন্য সকল ধর্মের জন্য সম্মানবোধ। একেবারে দুধের শিশুটি থেকে আমাদের শেখাতে হবে যে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল ভাষার মানুষের সাথে অন্য সকল মানুষের ভালোবাসা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য, সবচেয়ে বড়ো সম্পদ।

আমাদের অনেক বড়ো সৌভাগ্য এই দেশে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতার জন্ম হয়েছিল, যিনি আমাদের এই দেশটিকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক–এই দেশটি যদি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক না হয় তাহলে আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনেক বড়ো একটি অসম্মান করব।

সুবর্ণজয়ন্তীর বিজয় অর্জিত হতে হবে অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, এটি নিয়ে কারো মনে যেন কোনো দ্বিধা না থাকে। সেটি শুধু আমাদের সাফল্যের জন্য নয়–সেটি হতে হবে আমাদের সবার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২১)

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: মুক্তিযুদ্ধে সংবাদ-সাময়িকীপত্র

জাফর ওয়াজেদ

ফিরে যদি তাকাই পেছনে, পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ পানে, তবে দেখতে পাই–মৃত্যু, নৃশংসতা, নির্বিচারে গণহত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানি, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ঘরবাড়ি ছেড়ে স্বজন হারিয়ে কোটি মানুষের দেশত্যাগ, শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়। দেখতে পাই, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বলতম অর্জন-পর্ব 'মুক্তিযুদ্ধ'। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধরত ছাত্র, যুবা, কৃষক, শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, সেনা, পুলিশ, ইপিআর, আনসারসহ নানা পেশার মানুষকে। সাহসে, অঙ্গীকারে, বীরত্বে, আত্মদানে, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য বানিয়ে সম্মুখসমরে শত্রুহননে মত্ত হওয়ার এমন দিন বাঙালির ইতিহাসে আর কখনোই আসেনি। এটা অনস্বীকার্য যে বাঙালি জাতির ধারাবাহিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্মিলিত ফসল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল বাঙালির জাতিসত্তা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মানুসন্ধানের লড়াই। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর আত্মপরিচয় তুলে ধরার ভিত্তি বলা যায় মুক্তিযুদ্ধ। শিশুঘাতী, নারীঘাতী, বর্বরতম প্রতিরোধে এমন সম্মিলিত সংগ্রামের ইতিহাস, নিজের বুকের রক্তে এমন করে আগে কখনো লেখেনি জাতি বাঙালি।

পঞ্চাশ বছর আগে আরো দেখতে পাই, অহিংস গণঅসহযোগ আন্দোলন থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ; সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার রক্ত পতাকাত্তোলন। বিশ শতকের বিশ্ব রাজনীতিতে এমন ঘটনা অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় যেমন, তেমনই অভূতপূর্বও। এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। 'মুক্তিযুদ্ধ'–এই প্রপঞ্চটির মধ্যে এই ভূখণ্ডের মানুষের অনেক বোধ, সংগ্রাম, অর্জন, মৃত্যু, হাহাকার, অশ্রু, আর্তি এবং স্বপ্ন ভিড় করে আছে। মুক্তিযুদ্ধ মূলত একটি প্রত্যয়। ছিল যা বাঙালির জাতীয় জীবনের মোহনাকাল, বাঙালির মানুষ হয়ে ওঠার কাল। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে দেখা গেছে, বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ববোধের এবং সহমর্মী, সহকর্মী, সমব্যথী, সমচেতনার, সদাজাগ্রত থাকার সময়কাল। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের শুধু অসাধারণ ঘটনাই নয়, স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসের অসাধারণ ঘটনা। এই যুদ্ধে বাঙালি জনগণের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। সাধারণ বাঙালি সশস্ত্রভাবে পাকিস্তানি হানাদার ও দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধে মত্ত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জনগণের যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ। স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সে সময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই ছিল মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার পক্ষে। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর বিদ্রোহী সদস্য থেকে শুরু করে লাখ লাখ ছাত্র-তরুণ-যুবক-নারী-কৃষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক,

নার্স, প্রকৌশলী, সরকারি চাকরিজীবী, কলকারখানার শ্রমিক, ঘাটের মাঝি, মাঠের কৃষকসহ নাম না জানা বাঙালি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরে দখলদার হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। অনেকে ধরা পড়েন, তাঁরা আর ফিরে আসেননি। জল্লাদরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি। গণকবর আর বধ্যভূমিতে আকীর্ণ বাংলাদেশ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। সব যুদ্ধেরই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরোধিতা করাটাই স্বাভাবিক। আর এই বিরোধিতা যে কেবল ভূমিতে, আকাশে, জলপথে মারণাস্ত্র নিয়ে লড়াই, তা-ই শুধু নয়। বিরোধিতার চূড়ান্ত পরিণামে যে সংঘর্ষ তাতে যেমন সামরিক কৌশল ব্যবহার করা হয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যোগাযোগীয় কৌশলও ব্যবহৃত হয়। পুরাকাল থেকেই যোগাযোগ তথা গণমাধ্যম তাই যুদ্ধের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অনস্বীকার্য যে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রজন্মের চূড়ান্ত ঘটনা। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসর আলবদর, আলশামস, রাজাকার ও দালালরা পরাজিত হয়। হানাদাররা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মাত্র ৯ মাসের এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় সহযোগী দালাল ও চরেরা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করে। ধর্ষিত হন তিন লাখ নারী। গণমাধ্যম এসব খবর পরিবেশন করেছে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুদ্ধ ও সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক সব সময়ই সাংঘর্ষিক। যেকোনো যুদ্ধে, প্রাচীন হোক অথবা বর্তমানকালের হোক, যোগাযোগমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে স্বার্থ ভিন্নতার বিষয়টি বড়ো বাস্তবতা। সংবাদমাধ্যমের মূল কাজ সত্য প্রকাশ করা। ঘটনার অনুপুঙ্খ তথ্য পাঠযোগ্যভাবে সংবাদ ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। যুদ্ধে প্রধানত দুটি পক্ষ থাকে। সংবাদমাধ্যমের আদর্শিক অঙ্গীকারের জন্য দুটি পক্ষ সম্পর্কে, যুদ্ধযুদ্ধ ঘটনার দৈনন্দিন ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমের পেশাগত দায়বদ্ধতার অংশ। এমনকি জাতিগত, রাষ্ট্রগত কিংবা রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত কারণে যে পক্ষকে একটি সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে, সে ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু যুদ্ধকালে এ ব্যাপারটি ঘটে না। বরং সংবাদমাধ্যম হয়ে ওঠে সাবেক যুদ্ধভূমি। শুধু তা-ই নয়, কৌশলগত প্রয়োজনেই যুদ্ধমান সামরিক বাহিনী কিংবা সরকার সংবাদমাধ্যমকে সব তথ্য দেয় না। তথ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণে বাধা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমরনায়ক ডুইট আইফেন হাওয়ার গণমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর ভূমিকার এমন বৈপরীত্যের কথা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন সামরিক অভিযানের প্রথম কথা হলো গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য শত্রুকে দেওয়া যাবে না। সংবাদপত্র এবং সব প্রচারমাধ্যমের অপরিহার্য কাজ ব্যাপক বিস্তৃত প্রচার।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, জন্মকাল থেকেই সংবাদমাধ্যম যুদ্ধ-ঘটনার রিপোর্টিং করে আসছে। গত দুই-তিন শতকে যুদ্ধ রিপোর্টিংয়ের গতি এবং বোধগম্যতার ক্ষেত্রে নানা রকমের পরিবর্তন এসেছে। 'ওয়াটার লু'-এর যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রের খবর সাংবাদিককে সশরীরে সংবাদপত্র অফিসে বয়ে আনতে হতো। ক্রিসিয়া এবং গোটসবার্গ যুদ্ধের সময় টেলিগ্রাফের আবিষ্কার ঘটে গেছে। আর সংবাদপত্র অফিসে যুদ্ধ-সংবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এ সময় খবরের সহায়ক হিসেবে যুদ্ধের ছবি ব্যবহার শুরু হয়।

আরো অনেক পেছনে তাকাই যদি, দেখতে পাই–উনিশ শতকের শেষার্ধে ১৮৯০ সালে আমেরিকায় হলুদ সাংবাদিকতার জের হিসেবে স্প্যানিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য কিউবা আক্রমণ করে বসে।

সংবাদপত্রই ধ্বংস মৃত্যুর বিপরীতে যুদ্ধের একটা গৌরবোজ্জ্বল চেহারা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে এবং যুদ্ধ যে বেশ একটা রোমান্টিক ব্যাপার, তা-ও ফুটিয়ে তোলা হয়। যুদ্ধ যে একটা পুণ্যের কাজ, গৌরবের কাজ, নশ্বর পৃথিবীতে অপরিমেয় বীরত্ব বিবরণ তৈরি করার সুযোগ পৃথিবীর প্রায় সব মহাকাব্যেই এ কথা বলা হয়েছে। প্রধানত যুদ্ধস্পৃহা জাগিয়ে তোলার জন্য, যুদ্ধপতিদের সুখ দিয়ে কিংবা সম্মুখসমরে স্পর্ধা বাক্যবিনিময়কালে যুদ্ধের এমন মাহাত্ম্য বর্ণনা রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড ও ওডেসিতে চোখে পড়ে। কিন্তু সংবাদপত্র অথবা গণমাধ্যমের যুদ্ধ উসকানির পেছনে এসবের সঙ্গে আরো যে একটি ভয়ংকর বিষয় কাজ করে তা হলো মুনাফালিপ্সা এবং এই কাজটি দখলদার বাহিনী বা তার প্রতিপক্ষ বাহিনীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ফিরে যদি দেখি, দেখব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সাংবাদিকদের টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদ অফিসে পৌঁছাতে হতো। অবশ্য এ সময়কালে কেবল সংযোগ আরো বিস্তৃত হয়েছে। খবরের পাশাপাশি এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা ক্যামেরায় ধারণ করে 'নিউজরিল' আকারে থিয়েটারে বা প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হতো। দেখা গেছে, এই সময়কালেই অধিক মুনাফার আশায় যুদ্ধের ঘটনাকেন্দ্রিক বিশ্লেষণধর্মী এবং প্রোপাগান্ডামূলক চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

যুদ্ধ 'কাভার' করার ক্ষেত্রে 'রিয়েল টাইম লাইভ রিপোর্টিং' বলতে যা বোঝায়, তার শুরু কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেতারের মাধ্যমে। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। এভাবেই যুদ্ধে বাস্তবতা, দৃশ্য-শব্দ, মৃত্যু, ধ্বংস, আহাজারি মানুষের বসার ঘরে ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড চিত্র ও বিদেশি টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের কল্যাণে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত এ দেশে মোট তেইশটি (২৩) দৈনিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ছিল বেতার এবং পরবর্তীকালে টেলিভিশনও। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় চব্বিশ (২৪) বছর, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সংবাদমাধ্যম বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সফল

পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। কিন্তু পঁচিশে মার্চ হানাদার বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর আওতায় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পর এসব পত্রিকা সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। কয়েকটি পত্রিকা অফিস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। শুধু সংবাদপত্রই নয়, বেতার-টিভিসহ পুরো যোগাযোগব্যবস্থারই নিয়ন্ত্রণ নেয় দখলদার পাকবাহিনী। দেশের বাস্তব অবস্থা দেশি-বিদেশি জনগণ যাতে জানতে না পারে, সে জন্য সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করেছিল। আরোপিত হয়েছিল সেন্সরশিপ। তাদের নৃশংস তৎপরতাকে ধামাচাপা দিতে যতই কলাকৌশলের আশ্রয় নিক না কেন তাতে কামিয়াব হয়নি। দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, বাঙালি যে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, সেসব প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা ছিল শক্তাশক্তি। মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী, ভারতের চর, ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের দুশমন অভিধা দেওয়া হতো সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমে। দখলদার পাকিস্তানিরা সারা দেশে গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি নিধনে মত্ত থাকলেও সেসব খবরাখবর তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, বেতার-টিভিতে প্রচার হতো না। অবরুদ্ধ দেশে বাঙালি এসব খবরাখবর মোটেই বিশ্বাস করেনি। বরং স্বাধীনতাকামী বাঙালিই বাঙালির কাছে খবর পৌঁছে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিশেষ করে বেতার এ সময় হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাঙালির তথ্য চাহিদাপূরণের নির্ভরযোগ্য উপায়। ভারতসহ বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবরও বেতার থেকে উদ্ধৃত করা হতো। সেসব সংবাদপত্র এ দেশে না এলেও বিদেশি বেতারের কল্যাণে তা জানা হয়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রণাঙ্গন তখন হয়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। পঁচিশে মার্চ গণহত্যা শুরুর পরদিনই ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের পর সারা দেশের মানুষ জনযুদ্ধে নেমেছিল। সে সময় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে পারেনি বেশ কিছুকাল। যুদ্ধকালে দেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সে সময় পালন করেছিল ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এসব মাধ্যমে কর্মরত শব্দসৈনিকরা মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতাবোধ ও চেতনাকে সংহত ও শাণিত করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দেশকে হানাদারমুক্ত করার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। দখলদার বাহিনীর প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যাচার প্রচারযন্ত্রের বিপরীতে স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বিবিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গণহত্যা, জনগণের ঘোরতর দুর্দশা, মুক্তির জন্য লড়াই, আর প্রতিরোধের খবর বা তথ্য সম্পর্কে কোনো পত্রিকা বা জার্নাল কিংবা সাময়িকী বাংলাদেশের দখলীকৃত অঞ্চলের মধ্যে রাখাটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায় অসম্ভবই ছিল বলা যায়। তথাপি কেউ কেউ গোপনে সাইক্লোস্টাইলে বুলেটিন বের করেছে, তা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থাকা বিশ্বস্ত স্বজনদের কাছে বিতরণ করেছে। তবে কেউ তা সংগ্রহ করে রাখত না। হানাদারের দৃষ্টি এড়াতে ছিঁড়ে বা পুড়ে ফেলেছে।

মুক্তাঞ্চল থেকে বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, সিপিবি সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করত নিয়মিত। বাংলার বাণীও সে সময় প্রকাশ হতে থাকে। কলকাতায় বাংলা-ইংরেজি পত্রিকাতেও মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর থাকত। সেসব পত্রপত্রিকা যাতে

দেশের ভেতরে না আসতে পারে, সে জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল দলখদার হানাদার বাহিনী। যেকোনো আকারে এসব খবর প্রচারও ছিল নিষিদ্ধ। খবরের ছিটেফোঁটাও বিদেশে প্রচার করার বিষয়ে বিদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলোর ওপর রাখা হয়েছিল কড়া নজর। সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপরে ছিল কঠোর কড়াকড়ি ও নজরদারি। বেতার শুনতে হতো গোপনে লুকিয়ে, নিম্ন ভলিউমে। এত কড়াকড়ির মধ্যেও লুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করত।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ১১০ নং সামরিক বিধি জারি করে। এই সামরিক বিধিতে বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।' উল্লেখ করার বিষয় এখানে যে, এসব বিধিনিষেধ, কালাকানুন–সবই এক পর্যায়ে এসে এ দেশের সাংবাদিকরা ভঙ্গ করেছেন। এর আগে ১৯৫৮ সালের সামরিক অধ্যাদেশে সংবাদপত্রের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, 'এই আইন অমান্য করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সে জন্য সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।' আরেক ধারায় বলা হয়, 'কোনো লেখনীর সাহায্যে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে তা সামরিক আইনে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।' এর পরও বিভিন্ন সময় অধ্যাদেশ জারি করে সংবাদপত্রের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সাংবাদিকরা এসব আইনের বিরুদ্ধে নানা সময়ে প্রতিবাদীও হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাস, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। জাতীয় চেতনাকে শাণিত করার এই অস্ত্রটিকে দখলে আনার জন্য পাকিস্তানি জান্তা শাসকদের চেষ্টার অবধি ছিল না।

সংবাদপত্র কেবল মানুষকে তথ্য দেয় না, জনগণকে শিক্ষিত করে, জনচৈতন্য এবং জনমতকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই পূর্ববঙ্গে স্বাধীন সংবাদপত্র যাতে বিকশিত না হয়, সে জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই। পাকিস্তানি উপনিবেশ আমলে ২৪ বছরে এ দেশে সাংবাদিকতা বিকাশের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কাল পর্যন্ত প্রথম পর্ব। সামরিক শাসনের কাল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দ্বিতীয় পর্ব এবং ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। প্রত্যেক পর্বেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধিকারের জন্য সাংবাদিকদের সাহসী ভূমিকার ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে পাকিস্তানি শাসকদের সাথে আপস ও আঁতাতের কলঙ্ক। পূর্ব বাংলা গণআন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণোন্মুখ পরিবেশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রত্যেকবার নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। জনমত সৃষ্টি, জনমতের বিশ্বস্ত বাহন হিসেবে সংবাদপত্রকে জনতার

সামনে উপস্থাপিত করার কাজে সাংবাদিকরা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তাই পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিকরা বারবার কারাবরণ করেছেন ও স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্রশিল্পের বিকাশের পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্রত্যক্ষ ছিল। তবে দু-একটি পত্রিকা সামরিক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষণার পর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী ছিল না ইত্তেফাক ছাড়া প্রধান ধারার অন্য কোনো পত্রিকা। তবে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বিপুল সমর্থন জুগিয়ে গেছে। শেখ মুজিবের স্বদেশ ও তার মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সমান্তরালে এগিয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলন। আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে, সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের দলকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে–সর্বোপরি তাঁকে এ দেশের মুক্তিকামী জনগণের নামে অবিসংবাদিত জননেতা হিসেবে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র অমূল্য ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করেছে। দেখা গেছে, পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে যখনই গণ-আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা তাঁদের ওপর আরোপিত সব নিয়ন্ত্রণ, হুমকি, জেলের ভয় অতিক্রম করে ছাত্র, জনতা এবং রাজনীতিবিদদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এটা স্বীকার করতেই হবে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত এ দেশে সাহসী সাংবাদিকতার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, সাংবাদিকরা সংগ্রামী যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন, পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর প্রথম আঘাতেই তা ভেঙে যায়। হানাদারদের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল সংবাদপত্র অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মী ও সাংবাদিক। হানাদারদের গোলার আঘাতে একের পর এক আক্রান্ত হয় স্বাধীনতার সপক্ষের পত্রিকা অফিস ও কর্মরত সাংবাদিকরা।

২৫ মার্চ রাতেই কামানের গোলায় ধ্বংস করা হয় দ্য পিপল ও গণবাংলা পত্রিকার অফিস। গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন দ্য পিপল অফিসে কর্মরত ছয়জন সাংবাদিক। ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের অফিসটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ২৮ মার্চ দৈনিক সংবাদের অফিস পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অফিসে কর্মরত সাংবাদিক শহিদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মারা যান। ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস–২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সংবাদপত্র ছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সেই যাত্রা খুবই করুণ, মর্মান্তিক।

এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে আসছে যে, যেকোনো যুদ্ধে প্রথম মৃত্যু ঘটে সত্যের। সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণ এবং সাংবাদিকদের হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরবর্তী ৯ মাসের জন্য সংবাদপত্র অফিস 'সত্যের কসাইখানা' হওয়ার পথ খুলে দেয়।

২৬ মার্চ পাকিস্তানি জান্তা শাসক নরঘাতক ইয়াহিয়া সামরিক বিধি জারি করে বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নির্দেশ দেওয়া হয়, সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিষয় সংবাদপত্রে মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই আদেশ লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারিত হয় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সামরিক শাসন প্রয়োগ এবং তা অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বা সংহতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনার চেষ্টা নিষিদ্ধ করা হয়। মোদ্দাকথা হচ্ছে, সংবাদপত্রের সার্বিক কণ্ঠরোধ করা হয়। শুধু এই বিধি নয়, এরপর নাজিল হতে থাকে একের পর এক সামরিক আইনের আদেশ। প্রতিটি বিধি ও আদেশ ছিল দেশের জনগণ, সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদপত্র, বেতার ও টিভির বিবেকী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এক নখরযুক্ত থাবা।

দখলদার বাহিনীর কাছে সংবাদপত্র দুটি কারণে ছিল অপরিহার্য। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, এই তথ্য দেশে-বিদেশে প্রচার এবং যুদ্ধ প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রকে প্রাত্যহিক অনুষঙ্গ করে তোলা। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, এটি প্রমাণ করার জন্য সামরিক জান্তা দিন তিনেকের মধ্যেই পত্রিকা মালিকদের নির্দেশ দেয়, সব পত্রিকা আবার প্রকাশ করতে হবে। ২৯ ও ৩০ মার্চ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে মর্নিং নিউজ, পূর্বদেশ, অবজারভার, দৈনিক পাকিস্তান। ইত্তেফাক প্রকাশিত হয় ২১ মে হতে। সংবাদপত্রের মালিকরা বন্দুকের নলের মুখে নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই দখলদার হানাদারদের গুণকীর্তনে এগিয়ে আসে। অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। হানাদাররা 'সেন্সরশিপ হাউস' চালু করে। সব খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ ছাপানোর আগে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হতো এই সেন্সরশিপ হাউসে। ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ তথা আইএসপিআর নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্রিয় ছিল। সরাসরি এর দায়িত্বে ছিলেন মেজর সিদ্দিক সালিক। একাত্তরের ভয়ংকর সেই দিনগুলোতে মেজর সালিক ছিলেন সংবাদপত্র অফিসের ত্রাস। কোনো স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদন ছাপানো হয়নি কোনো পত্রিকায় মাসখানেকের বেশি। অ্যাসোসিয়েট প্রেস অভ পাকিস্তান বা এপিপির দেওয়া প্রতিবেদনই ছাপা হতো। সাংবাদিকরা দখলদার বাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে সত্য যা কিছু লেখার ছিল, তা লিখতে পারেননি। তারপরও এর মধ্য দিয়েও সাংবাদিকরা সংযমের আড়ালে সত্য প্রকাশে ছিলেন সচেষ্ট। যে কারণে সিরাজুদ্দীন হোসেন, নাজমুল হক, শহীদুল্লা কায়সার, খন্দকার আবু তালেব, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শেখ আবদুল মান্নান লাডু, শিবসাধন চক্রবর্তী, শহিদ সাবের, সেলিনা পারভীনসহ বহু সাংবাদিককে প্রাণ দিতে হয়েছে হানাদার বাহিনীর হাতে।

পঁচিশে মার্চের পর অবরুদ্ধ দেশের সংবাদপত্রকে চরিত্র বিচারে সংবাদপত্র বলা অবশ্যই যাবে না। সেগুলো ছিল দখলদার হানাদার বাহিনীর মুখপত্র। অধিকাংশ পত্রিকায় পাকবাহিনী এবং রাজাকার, আলবদরদের তৎপরতা, যুদ্ধে তাদের

সাহস, জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও সামরিক কর্তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর, শান্তিবাহিনীর কাজ ফলাও করে প্রকাশ করা হতো। পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতীয় চর, দুষ্কৃতকারী, ইসলামের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হতো। বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারে ব্যাপক জায়গা ব্যয় করেছে সংবাদপত্রে। অন্যদিকে দেশে নির্বিচারে খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তকরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ সাফল্য সম্পর্কে নীরব থেকেছে। সেই সময় সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করেছিলেন, নয়তো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকে আবার কর্মরত থেকে দখলদারদের অন্যায় প্রতিরোধ করতে না পারলেও প্রতিবাদ করে জেল, জুলুম সয়েছেন। তৎকালীন পিপিআইয়ের চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে দুবার রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। রাজি হননি বলে পরিণামে ১০ ডিসেম্বর রাতে একজন কর্নেলের নেতৃত্বে হানাদাররা বাসা ঘেরাও করে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি। যুদ্ধের শেষ দিকে কয়েকজন সাংবাদিক আলবদর ও রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি। অবশ্য সাংবাদিকরা যুদ্ধ করেছিলেন ভেতরে-বাইরে।

যাঁরা দেশ ছাড়তে পেরেছিলেন, তাঁরা মুক্তাঞ্চল থেকে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জন্ম নিয়েছিল বেশ কিছু সংবাদপত্র। একাত্তরে দুই ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দেশের ভেতর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে থাকত যুদ্ধ সম্পর্কে অসত্য তথ্য। উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে বিভ্রান্ত করা। অন্যদিকে মুজিবনগর থেকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সাফল্যের সংবাদ পরিবেশন করে মুক্তিকামী বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করা। একই সঙ্গে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাতে গোনা কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া বাকি সব পত্রিকাই ছিল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, সাময়িকী, বুলেটিন অথবা নিউজ লেটারধর্মী। পত্রিকাগুলো সাইক্লোস্টাইল করে, হাতে লিখে কিংবা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ হয়েছে। পত্রপত্রিকাগুলোর স্থান হিসেবে ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নওগাঁ, বরিশাল, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, তেঁতুলিয়া, মুক্তাঞ্চল ও মুজিবনগরের নাম থাকলেও এর অধিকাংশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন : পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, বিহার, এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হতো। এসব পত্রিকা প্রকাশনায় বিপুলসংখ্যক শরণার্থী ও স্থানীয় বাঙালি জনগণের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ছিল। যুদ্ধকালে জন্ম নেওয়া এসব পত্রিকার নাম এবং সংবাদ শিরোনামে স্বদেশপ্রেম এবং যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল। মুক্তাঞ্চলে এবং অবরুদ্ধ দেশে এসব পত্রিকা বাঙালিকে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে। পরিস্থিতি, সময়ের দাবি, স্থানীয় চাহিদা ও যুদ্ধজয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এসব পত্রপত্রিকার বিষয়বস্তু যুদ্ধ, প্রতিরোধ, হানাদান বাহিনী আর রাজাকারদের লাঞ্ছনা, পরাজয়, যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের কষ্ট, স্বপ্ন ইত্যাদি। সে সময়ের পত্রিকাগুলোয় প্রতিবেদন ফিচার,

নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ইত্যাদি বিষয়ের ব্যানারেই মূলত সংবাদগুলো প্রকাশিত হতো। কখনো কখনো কিছু ছবি, কবিতা-গল্প, সাক্ষাৎকার, যুদ্ধ, নেতাদের বিবৃতি, বক্তব্য ছাপা হয়েছে। আবার দু-একটি পত্রিকায় বেশ কিছু বিদ্রুপাত্মক কার্টুনও প্রকাশ হয়েছিল। পত্রিকার পাতায় পাতায় থাকত মুজিবনগর সরকার গঠন; সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিকল্পনা-পরিচালনা, কূটনৈতিক তৎপরতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন-স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং তাঁকে ঘিরে স্বাধীনতাযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলো। যুদ্ধকালীন পত্রিকা বলেই এর সবটুকু জুড়ে থাকত যুদ্ধের খবরাখবর এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্বব্যঞ্জক তৎপরতা। হানাদার বাহিনীর পর্যুদস্ত হওয়ার বর্ণনা প্রাধান্য পেত।

'পত্রিকাগুলোর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা। এসব পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বেশি না থাকায় সেগুলো জনগণের চাহিদা মেটাতে পারত না। এগুলোর একটি কপি সংগ্রহ করা কিংবা এতে এক ঝলক চোখ বোলানোর জন্য এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যেত সবাই। প্রধানত অল্পবয়সি ছেলেরাই এগুলো বিলি করত। যুদ্ধের সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, খবরের কাগজসহ ধরা পড়ার পর পাকিস্তানিরা এসব কিশোরকে ঘটনাস্থলেই বিনা বিচারে হত্যা করেছে।' (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে : মেজর রফিকুল ইসলাম)

মুক্তিকামীদের প্রকাশিত পত্রিকার পাতায় থাকত মুজিবনগর সরকার গঠন, সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিকল্পনা-পরিচালনা, কূটনৈতিক তৎপরতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং তাঁকে ঘিরে স্বাধীনতাযুদ্ধ। বিশ্ব জনমত তৈরি করা, স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধকে ত্বরান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত করে মুক্তিযুদ্ধ ও

জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। বাস্তবতা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সামান্য তথ্য পাওয়ার জন্য বাঙালি হন্যে হয়ে ফিরত। হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা এবাড়ি থেকে ওবাড়ি, ওবাড়ি থেকে অন্য বাড়ি পৌঁছাতে গিয়ে অনেক কিশোর, যুবা ধরা পড়ে নির্যাতন ভোগ করেছে। তাদের উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এ দেশের মাটি।

যুদ্ধের সময় সংবাদপত্র অন্য রণাঙ্গনের যোদ্ধার ভূমিকাই পালন করেছে। একদিকে স্বদেশ ও প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়কে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করা এর প্রধান এবং আদর্শ লক্ষ্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে ৩৬টিরও বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক জয় বাংলা। নওগাঁ হতে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ১১টি সংখ্যা পাওয়া গেছে। শত্রুকবলিত হওয়ায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর এক মাস পর প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (রেজিস্ট্রেশন নং-১) প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশক করে জয় বাংলা। যা মূলত আওয়ামী লীগের মুখপত্র ছিল।

আট পাতার পত্রিকাটিতে বিজ্ঞাপনও ছিল। পত্রিকাটির লেটার হেড এঁকেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামক সাপ্তাহিক। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মুখপত্র সাপ্তাহিক নতুন বাংলা নিয়মিত বেরিয়েছে। পত্রিকার লেটার হেডের নিচে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লেখা হতো পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির পর এরা পূর্ব পাকিস্তানের স্থলে 'বাংলাদেশ' লেখা শুরু করে।

২৫ মার্চ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে ২৬ ও ২৭ তারিখে বিদেশি পত্রপত্রিকাগুলো বাংলাদেশ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করতে পারেনি। শুধু ২৭ তারিখে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় ও বেতারে মুক্তিযুদ্ধ ও হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কথা ফলাও করে প্রচার করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মুদ্রণ মাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস ভারত, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রণমাধ্যম বাংলাদেমের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে গেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে আকাশবাণী, অল ইন্ডিয়া রেডিও, বিবিসি এবং বয়েস অভ আমেরিকার নাম স্মরণীয়। আকাশবাণীর খবর ও কথিকা মুক্তিযোদ্ধা, অবরুদ্ধ দেশের মানুষ আর শরণার্থীদের লড়াই করার আর বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে। বিবিসি যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশ বিষয়ক খবর ছিল সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। বিদেশি রেডিওর পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

বিশ্বের যেসব সাংবাদিক বাংলাদেশের পক্ষে তাঁদের পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও সরকারকে সহানুভূতিশীর করে তোলেন তাঁদের মাঝে অন্যতম ছিলেন সিডবি এইচ স্কেনবার্গ, জন ই উডাফ, এস হ্যারিসন, চেস্টার বাউলেস, জিন ভিনসেন্ট, পিটার আর ক্যান, হেনরি এস রেডসিয়ার, মিলান জে কুবিক, ট্যাড সুজলক, ডাব্লিও ব্রাউন, আদাম ক্লাইমার, এনট্যারো পিটিলা, ডুবিয়াস হেভেন, বেঞ্জামিন ওয়েলস, এলভিন টফলার, সি এস সুলজবারগার বেঞ্জামিন ওয়েলস, জনই ফ্রেজার, জন কেনিথ গলব্রেথ, ক্রসবি এ নায়েস, এনথনি এসটারসন, মেলকম এম ব্রাউন, বার্নার্ড গাটজম্যান, উইলিয়ম ডামন্ড, লি লেসক্যাজ, কায়াস বিচ, প্রান সাহারওয়াল, পিটার সারকান, জেস পিস্টেরাসহ আরো অনেকে–নিজ নিজ দেশে প্রথিতযশা এসব সাংবাদিক একের পর এক সংবাদ ও প্রতিবেদন ছেপে বিশ্ব জনমতকে পক্ষে আনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। অবশ্য তাঁদের সংবাদসমূহ ছিল ঘটনা সম্পর্কে সত্য বিবরণ এবং এসব সত্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ এবং প্রতিবেদনই বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানার সুযোগ করে দেয়। সাংবাদিকদের মাঝে ভারতীয় সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল পুরোপুরি বাংলাদেশের পক্ষে।

যেসব বিশ্বখ্যাত পত্রিকা বাংলাদেশের খবর যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করেছিল তার মাঝে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাসমূহ ছিল– নিউ ইয়র্ক টাইম,

পোস্ট, বল্টিমোর সান, নিউজউইক, টাইম, ইভেনিং স্টার, ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল, সেটারডে রিভিউ, শিকাগো সান টাইম, ওয়াশিংট স্টার, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, সানডে স্টার, নিউজডে, দ্য গার্ডিয়ান, আল-আহরাম, লস এঞ্জেলেস টাইমস, সিডনি মর্নিং হেরাল্ড, দি এজ-ক্যানবেরা, নিউ হেলাল্ড-কাঠমুন্ডু, ওয়াং ওয়া ইট পো-পেনাং, জাকার্তা টাইম, ব্যাংকক ওয়ার্লড, অটোয়া সিটিজেন, পালাভার-আক্রো, ব্যাংকক পোস্ট, দ্য কমনার-কাঠমুন্ডু, সানডে অস্ট্রেলিয়ান বিউনো অ্যায়ারস হ্যারাল্ড, স্টেইটস ইকো-মালয়েশিয়া, স্টেইটস টাইমস-মালয়েশিয়া, ন্যাশনাল জাইটুংও-বার্নি, জাম্বিয়া ডেইলি মেইল, গায়ানা ইভেনিং পোস্ট, সানডে টাইমস-ওয়েলিংটন, দাগেনস নাইহেটার-স্টকহোম, ম্যানিলা ক্রনিলা ক্রনিকল, ভে সার্নজে নভস্তি-যুগোশ্লাভ, পালাভার উইকলি-ঘানা, জা রুবেজম রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার, লা সেলেইল-সেনেগাল, দাগরডেট-নরওয়ে, টরেন্টো টেলিগ্রাম-কানাডা, অটোয়া সিটিজেন, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, ফ্রাংকফুর্টার আলমেইন জাইটুং-প জার্মানি, ওয়েস্টার্ন মেইল (কার্ডিফ) ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ, ইয়াংকি-আংকারা, অ্যাডভান্স, মাইনিটি ডেইলি নিউজ টকিও, লা লিবর বেলজিক-ব্রাসেলস (নিরপেক্ষ), গ্লোব অ্যান্ড মেইল-টরেন্টো, আল সাওরা দামেস্ক (নিরপেক্ষ), সানডে পোস্ট-নাইরোব, হেল সিনজিন সারোমাত-হেলসিংকি, দে ভক্সক্রান্ত-নেদারল্যান্ড, নেপাল টাইমস, সানডে পোস্ট নাইরোবি, হেল সিজিন সারোমাত হেলসিংকি, সানডে টাইমস অভ জাম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া বায়া, মাদারল্যান্ড কাঠমুন্ডু, নিউজ ডেসল্যান্ড-পূর্ব বার্লিন, নানইয়াং সিয়াং পু-মালয়েশিয়া, ইজতে স্তিয়াপ হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, কালান্তর, নিউ এজ, দ্য স্টেটসম্যান, দর্পণ, টাইমস অভ ইন্ডিয়া, পোট্রিয়ট, দ্য হিন্দু ইত্যাদি। এ ছাড়া বিশ্বের নামকরা পত্রিকাসমূহ বাংলাদেশের পক্ষে সোচ্চার ছিল দীর্ঘ ৯ মাস। এ হতে অনুমেয়, বাংলাদেশের আন্দোলন বিশ্বব্যাপী কীভাবে জনমতকে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠলে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিদেশি সাংবাদিকরা ঢাকায় আসতে থাকেন। ২৫ মার্চ রাতে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে গণহত্যা চালানোর সময় বন্দুকের মুখে সকল বিদেশি সাংবাদিককে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আটকে রাখে এবং ধরে নিয়ে ঢাকা থেকে বিমানে করাচি পাঠিয়ে দেয়। দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তল্লাশি অভিযান এড়িয়ে সেখানে রয়ে যেতে সমর্থ হন ২৬ বছর বয়সি লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। তিনি যুদ্ধ উপদ্রুত ঢাকার লড়াইয়ের চাক্ষুষ বিবরণ জানাতে সমর্থ হন। এক পর্যায়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। ব্যাংকক থেকে বাংলাদেশে সশস্ত্র যুদ্ধের ওপর যে প্রতিবেদন পাঠান, তাতে বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার ঘটনা। ৩০ মার্চ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিবরণ ছিল। যার ফলে গণহত্যার বিষয়টি দখলদারদের পক্ষে আর চেপে রাখা সম্ভব হয়নি।

লন্ডনের সাপ্তাহিক 'ইকোনমিস্ট' নামক সাময়িকী ৩০ এপ্রিল লিখেছিল বন্দুকের মুখে ঐক্য শিরোনাম। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গৃহযুদ্ধের পথ বেছে নিলেও যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন না। সাময়িকী পত্রের মধ্যে টাইম, নিউজউইক, ইকোনমিস্ট, নিউজ ভারতম গ্লোব অ্যান্ড মেইল (টরেন্টো), ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অভ ইন্ডিয়ার পাশাপাশি কলকাতার সাপ্তাহিক দেশ, সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকাও পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট নিয়ে অনেক প্রতিবেদন ছেপেছে। কলকাতা থেকে অনেক লিটল ম্যাগাজিনও বেরিয়েছে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক। প্রথম প্রকাশিত হয় একাত্তরের এপ্রিলে আশীষ সান্যাল সম্পাদিত 'ঘোড়সওয়ার'। সেখানে সব কবিতাই ছিল বাংলাদেশকেন্দ্রিক। হানাদারদের বর্বরতার কথা উল্লেখ করতে কলকাতায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের পাশাপাশি সাংবাদিকরাও ছিলেন সক্রিয়। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুদ্ধরত অঞ্চল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন লিখতেন কলকাতার সাংবাদিকরা।

বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অবরুদ্ধ দেশে অনেক সাংবাদিকই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের পক্ষাবলম্বন করেন। বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িত ছিলেন দুই সাংবাদিক। বিচারে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হলেও তাঁরা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ ও অবদান হাতে গোনা। দালাল আইনে অনেক সাংবাদিক গ্রেফতার ও সাজা পেয়েছেন। চীনাপন্থী সাংবাদিকরা পাকিস্তানি জান্তা শাসকের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যর্থ করতে চেয়েছিলেন। দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকার পরও কতিপয় সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখায় সচেষ্ট ছিলেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভাবাদর্শের প্রতিফলন স্বাধীনতা-পরবর্তী সংবাদপত্রেও দেখা যায়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালে যদি ফিরে তাকাই দেখব, একাত্তরে আমাদের সাংবাদিকদের একটা অংশের মনোজগতে পাকিস্তানি চিন্তা-চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থান কোনোভাবেই সংকুচিত হয়নি। বরং দিন দিন তা বেড়েছে। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা কিংবা পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার প্রকল্প এসব সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের তাড়িত করে।

মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরের এই সুবর্ণ সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা সগর্বে বলতে পারি ষাটের দশকে আমাদের সংবাদপত্র স্বাধিকার প্রশ্নে সোচ্চার ছিল। শেখ মুজিবের ৬ দফার সমর্থন না করলেও তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণী না ছেপে পারেনি পাঠকবিমুখতার আতঙ্কে। ৫০ বছর আগে বিদেশি সংবাদ-সাময়িকপত্র এবং সাংবাদিকরা যে ভূমিকা রেখেছেন স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তাঁরা বাঙালির অহংকার ও গৌরবকে মহিমান্বিত করেছেন। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২১)

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

যুদ্ধজয়ের গল্প

গাজী আলী আজগর

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৯৭১। মুক্তিপাগল ১০ লাখ মানুষ একটি উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছে ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ময়দানে। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'আপস না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম', 'জনতার আসবেই চলবেই', 'পিন্ডি না ঢাকা–ঢাকা ঢাকা, 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান–আজিমপুরের গোরস্তান', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'–এমনই হাজারো স্লোগানে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। লাখো জনতার হাতে লাঠি আর গগনবিদারী স্লোগানে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। সেই উত্তাল মানুষের সমুদ্রে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে সভামঞ্চে এসে কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দিলেন এক ঐতিহাসিক ভাষণ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের পর এটাই হলো আনুষ্ঠানিক কোনো জনসভায় তাঁর ভাষণ। ১৯ মিনিটের এই কালজয়ী ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতির ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে দিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখার মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা এবং শেষে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'–বলে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের, অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর যে সমস্ত অসম্মানজনক আচরণ ও বৈষম্য করেছে তা লিখে শেষ করা যাবে না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা, যিনি বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন ছিলেন সেই বঙ্গবন্ধুকে কারণে-অকারণে অসম্মানসহ অধিকাংশ সময়ে জেলে আটকে রেখেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা যেসব বৈষম্য করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব আমরা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিলেট ডিভিশনের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের লেখায় পাই। তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ৭ হাজার ৬৪০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পেয়ে তার ৮৪ শতাংশ ব্যয় করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে আর ৩০ শতাংশের কম ব্যয় করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছিল ২৫ হাজার ৫৫৯ বিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছিল ২১ হাজার ১৩৭ মিলিয়ন টাকা। সে সময় সোনালি আঁশখ্যাত আমাদের দেশে উৎপন্ন পাটই ছিল প্রধান রপ্তানি পণ্য। আমদানি খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ২৯ হাজার ৬২৯ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের

জন্য একই সময়ে আমদানি করা হয়েছিল ১৭ হাজার ৬৭ বিলিয়ন টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এসব তথ্য ১৯৭০ সালে করাচি থেকে প্রকাশিত মাহুলি ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিসটিক্স থেকে পাওয়া গেছে।' বিডিনিউজ, ২৮ জানুয়ারি, ২০২১-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা অর্থের পরিমাণ ছিল ২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

দেশের মুক্তিকামী মানুষের কাছে দ্রুতই পৌঁছে গেল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা। এদিকে হানাদার পাকিস্তানিরা বসে নেই। রাজনৈতিক কূটচালের পাশাপাশি এ ভূখণ্ডে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর। তারা ঢাকায় অসংখ্য সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ ও ইপিআর সদস্যকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসা থেকে গ্রেফতারের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি দেশের সর্বস্তরে জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেন। প্রথম দিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মুক্তিকামী মানুষের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা হয়। এরপর সবাই সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের সরকার গঠনের ঘোষণা আসে। এতে করে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের সাধারণ মানুষের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। এর পরই পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধের শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে তৎকালীন বন্ধুপ্রতিম ভারত সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি সুবিধাজনক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে। বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের সীমান্তের ওপারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল দেশের প্রতি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে জনমত সৃষ্টিসহ নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। দেশের মধ্যে তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার এ দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াই করে যাচ্ছে আমাদের সূর্যসন্তানরা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলীর নেতৃত্বে হাইকমিশনের সব বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী একযোগে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁরা 'পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন' নামফলক নামিয়ে সেখানে 'বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন' নামফলক লাগিয়ে দেন, যা ছিল সেই সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মিশনের ছাদে

ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে শুরু করে। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের মধ্যে ১৯টি মিশনের ১১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে অবশেষে এলো আমাদের বহু প্রতীক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের স্বাধীনতা। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে কতিপয় রাজাকার, আলশামস, আলবদর ছাড়া ক্ষতি হয়নি, এমন কোনো পরিবার এ দেশে ছিল না। কত রকম অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হয়েছিল তখনকার মানুষগুলো, যা এ প্রজন্ম কল্পনাও করতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধে মা হারিয়েছে তার সন্তানকে, বোন হারিয়েছে ভাইকে, পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে আদরের ছোটো বোনটিকে, যাওয়ার সময় জ্বালিয়ে দিয়েছে ঘরবাড়ি, ফসলের মাঠ, ধ্বংস করছে ব্রিজ-কালভার্ট। কী করেনি তারা এ কথা ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে।

জীবনের শেষ প্রান্তে আজ আমি। প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো সহযোদ্ধাকে বিদায় দিতে হয়। মন ভারী হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করি কী স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম। আমাদের সেই স্বপ্নের কতটুকু বাস্তবায়িত হলো। আমি আশাবাদী মানুষ। আমার স্বপ্ন অনেক। চেয়ে ছিলাম ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ। দুর্নীতিমুক্ত দেশ দেখে যেতে হয়তো পারব না। এটা আমার কষ্ট। তবে দেশে এখন খাবার কষ্ট নেই, সবাই তিন বেলা খাবার পাচ্ছে–এটা ভাবতে খুব ভালো লাগে। ৭০-৮০ দশক এমনকি ৯০-এর দশকেও খাবারের কষ্ট ছিল, মঙ্গা ছিল। দেশের মানুষ এখন শতভাগ বিদ্যুৎ পাচ্ছে, রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পদ্মার ওপর সেতু হবে, এটা ছিল আমাদের কল্পনারও বাইরে। দেখে এসেছি পদ্মা সেতু। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। এসবই আমাদের উন্নতির লক্ষণ। মুক্তিযোদ্ধারা সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন, গৃহহীনরা বিনামূল্যে ঘরবাড়ি পাচ্ছেন। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় কয়েক কোটি মানুষ সুবিধা পাচ্ছে। এসব দেখে আমি খুশি হই। এক জীবনে আর কী চাইতে পারি। ফজরের নামাজের পর হাঁটাহাঁটি করা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। হাঁটা শেষে যখন বাসায় ফিরি তখন দেখি মায়েরা তাঁদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্কুলে ছুটছেন। আমার দেখতে খুব ভালো লাগে। আমি দেখতে পাই আমার স্বপ্ন ওই ছোট্ট দাদু ভাইয়ের মাঝে। যে স্বপ্ন আমাদের জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হলো না, সেটা আমাদের নতুন প্রজন্ম নিশ্চয়ই বাস্তবায়ন করবে–এ বিশ্বাস আমার আছে।

জীবনের শেষ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, শেষ গাড়ির অপেক্ষায়। আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমার কোনো অপূর্ণতা নেই। নতুন প্রজন্মকে আমার আশীর্বাদ, তোমাদের হাতেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। সবার কাছে একটাই চাওয়া–জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত থাকবে, মানুষকে ভালোবাসবে। বিজয়ের এই মাসে দেশবাসীকে বিজয়ী সালাম ও শুভকামনা। ❐

(প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২)

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা, ৯ নম্বর সেক্টর।